যুক্তবেণী

শ্রীমতিলাল রায়

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস
৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ
প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস
৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
রথযাত্রা—১৩৪২

মুদ্রাকর—শ্রীফণিভূষণ রায়
প্রকাশ প্রেস
৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১।০ দেড় টাকা

প্রকাশকের নিবেদন

সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে আত্মতৃপ্তিই নয়, একটা গভীরতর বেদনার ডাকে যাঁহারা আস্থাবান্ তাঁহাদেরই অন্যতম এই গ্রন্থখানির গ্রন্থকার। জাতির গঠন-যুগে, সৃষ্টি শুধু সুন্দর হইবে, এইটুকুই যথেষ্ট নয়, তার প্রতি বর্ণ-রেখা সত্যে ও কল্যাণে পূর্ণাপ্লুত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই দিক্ দিয়া লেখকের স্বপ্ন ও আশা কতটুকু সফল হইয়াছে, তাহা সুধীগণেরই বিচারের যোগ্য।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে "মুক্তি-মন্ত্রের" পর "যুক্তবেণী" গ্রন্থকারের কথা-সাহিত্যে নূতন অবদান—এখানি রসগ্রাহী সাহিত্য সমাজের হাতে তুলিয়া দেওয়াই আমাদের কাজ। মিলনের পুণ্য-বেদীতলে নারী-পুরুষের প্রেম-শিখা পবিত্র ঘৃত-প্রদীপের ন্যায় উজ্জ্বল ও অনাবিল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করুক—এই আমাদের প্রার্থনা।

যুক্তবেণী

এক

বজ্র পড়্‌ল না প্রিয়রঞ্জনের মাথায়। তার মা-ই সকল বিপদ্ বরণ করে' নিয়ে ছেলেকে ভরসা দিয়ে বল্‌লেন, "শোক করো না, আমি তোমার আজ থেকে মা-বাপ দুই-ই।"

প্রিয়রঞ্জন দেখ্‌ল—তার মায়ের করুণ বৈধব্য-মূর্ত্তি; কিন্তু জগদ্ধাত্রী-শক্তি যেন সে মূর্ত্তিকে অভিষিক্ত করেছে। পিতৃ-বিয়োগের ব্যথার চেয়ে সাংসারিক বিষয়-ব্যবস্থার দিক্ রক্ষা করাই ছিল সব চেয়ে বিপদের বিষয়; কেন না, সঞ্চিত কোম্পানীর কাগজ বেচে' পুত্রের ভবিষ্যৎ দেখ্‌তে গিয়ে প্রিয়রঞ্জনের পিতা কিনেছিলেন বিপুল জমিদারী। কিন্তু তা' খরিদ করার পর বিষয়প্রাপ্তির পথে গোলযোগ ঘনিয়ে উঠ্‌ল অভাবনীয়ভাবে সেই মকদ্দমা নিয়ে; পিতার বিন্দুমাত্র অবকাশ ছিল না, মাতার হাতে যে টাকাকড়ি ও অলঙ্কারাদি ছিল, টান পড়েছিল সবেতেই।

হঠাৎ পিতার মৃত্যু হওয়ায় প্রিয়রঞ্জন এই জটিল সমস্যা নিয়ে কেমন করে' মাথা তুলে দাঁড়াবে, সেই ভাবনায় সে কাতর হয়ে পড়েছিল; কিন্তু মায়ের ভরসায় সে নিশ্চিন্ত মনেই বই বগলে কলেজে আগের মতই যাওয়া-আসা সুরু করল। সত্যই এখন থেকে মাকেই সে দেখ্‌তে লাগ্‌ল তার পরিপূর্ণ অভিভাবক-রূপে। যথাসময়ে মকদ্দমায় জিত হ'লে, প্রিয়রঞ্জনের জননী তাকে জানালেন, সরকার-গোমস্তা নিয়ে বিষয়-

সম্পত্তি অধিকার করতে যেতে হবে তাকে পিতারই জয় দিতে। সে মায়ের মুখ চেয়েই বল্‌ল—কলেজে যাওয়া আর খেলা-ধূলায় কৃতিত্ব দেখান ছাড়া অন্য শক্তি তার নেই। মায়ের উপরই সকল ভার ছেড়ে' নির্ভাবনায় সে যেমন পড়াশুনা করছে, তাতে তার বাধা পড়া সঙ্গত নয়।

প্রিয়রঞ্জনের জননী স্বামীর কাছে কাছে থেকে শিখেছিলেন শুধু মুন্‌সীয়ানা নহে, বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করার কৌশল ও ফিকির। প্রিয়রঞ্জনকে কিছুই ভাব্‌তে হ'ল না। পিতার বর্ত্তমানে সে যেমন হেসে'-খেলে' দিনযাপন কর্‌ত, মায়ের আশ্রয়ে তার একবিন্দু ত্রুটি হ'ল না।

সে-বার বি-এ পরীক্ষার সময়ে প্রিয়রঞ্জন কেতাব নিয়ে খুব ব্যস্ত, হঠাৎ মা এসে' জানালেন, "এই দেখ্‌ আর এক ফ্যাসাদ—ঝঞ্ঝাটের পর ঝঞ্ঝাট, চিঠিখানা পড়ে' দেখ্‌!"

প্রিয়রঞ্জন বাঁকা অক্ষরে খামের উপরের ঠিকানাটা পড়ে' চিঠিখানা খুলে' দেখ্‌ল ফ্যাসাদই বটে! বাণীবন থেকে তাঁর কে এক বাল্য-সখী অন্তিম প্রার্থনা জানিয়েছেন তাঁকে একবার দেখে' যেতে। চিঠি পড়ে' সে যে এর কি উত্তর দেবে, খুঁজেই পেল না; মায়ের মুখপানে চেয়েই উত্তর প্রতীক্ষা কর্‌ল।

মা বল্‌লেন, "একদিন কেতাব বন্ধ থাক, চল্‌ আমার সঙ্গে। আহা, ছেলেবেলায় এক সঙ্গে কত খেলা করেছি, 'পুণ্যি-পুকুর' 'কুলকুলুতি'—কত ব্রত করেছি! দু'টীতে ছিলুম এক মন, এক প্রাণ—খুব বিপদ্‌ না হ'লে এমন চিঠি দেয় না—চল্‌, গিয়ে দেখে' আসি।"

ছেলে বল্‌ল, "রক্ষে কর মা, পড়ার যে-রকম রোক এসেছে, যদি তা' ব্রেক্‌ হয়, বকুনি তখন তুমিই দেবে—বল্‌বে, ফেল্‌ কর্‌লি কেন? সরকার মশায় আর কাদু ঝিকে নিয়ে তুমি দেখে এস, আমায় রেহাই দাও।"

মা মুখ ঘুরিয়ে বল্‌লেন, "পড়ার দোহাই'এর চেয়ে বল্ না, ও-বেলা তোর টেনিস্ খেলার ম্যাচ্ আছে, না হয় তো কোথায় টি-পার্টিতে যোগ দিতে হবে!"

প্রিয়রঞ্জন কাঁচু-মাচু মুখে বল্‌ল, "রাগ করো না মা—ঠিক ধরেছ। আজ টেনিস্ খেলারই একটা ম্যাচে প্রফেসার আমায় নমিনেট্ করেছেন, না গেলে সত্যিই চল্‌বে না।"

মা বল্‌লেন, "মাথার উপর এমন করে' দাঁড়িয়েছি তাই, তা' না হ'লে আজ যে তোর ঘাড়েই সব পড়্‌ত!"

প্রিয়রঞ্জন তাড়াতাড়ি মায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে বল্‌ল, "আমার মা তো যেমন তেমন নন, স্বয়ং জগদ্ধাত্রী!"

গর্ব্বে মায়ের মুখখানা লাল হয়ে উঠ্‌ল, ছেলের দিকে স্নেহ-কটাক্ষ করে' তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

প্রিয়রঞ্জন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছিল সিগারেট মুখে দিয়ে, মায়ের গলা পেয়ে সে চম্‌কে' উঠ্‌ল; চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌ল, আওয়াজটা এসেছে ঘরের ভিতর থেকে—সে তাড়াতাড়ি হাত থেকে সিগারেটটা ফেলে' মায়ের সাম্‌নে এসে' দাঁড়াল।

মা বল্‌লেন, "ঘরে এক দণ্ড বস্‌তে নেই! হঠাৎ যদি আমি মরি, তখন তোর হবে কি? বাণীবন থেকে ফিরে' তোর টিকিই দেখি না—বাইরে-বাইরে সারা ক্ষণ কি করিস্ বল্ দেখি?"

মাথা চুলকাতে চুলকাতে প্রিয়রঞ্জন কি যে উত্তর দেবে, খুঁজে পেল না। তার মনে পড়ে' গেল, মা গিয়েছিলেন বাণীবনে তাঁর বাল্য-সখীকে দেখ্‌তে, খবরটা নেওয়া ছাড়া আর কোন কথা তার মুখে বেরুল না।

মা বল্‌লেন, "স্থির হয়ে বোস্‌, কথা আছে—বড় জরুরী কথা।"

প্রিয়রঞ্জন ঘড়ির পানে চাইতেই মা দাব্‌ড়ী দিয়ে বল্‌লেন, "যতই তোর আজ কাজ থাক্‌, একটু ঠাণ্ডা হয়ে বোস্‌। তোর মুখের কথা না পেলে আর এগোতে পারি না। আহা, কি দুঃখেই যে মাগী ম'লো, তা' চক্ষে না দেখে' তুই বুঝ্‌বি না!"

স্বভাব-বশে প্রিয়রঞ্জনের চক্ষু ঘড়ির দিকেই গিয়ে পড়ে। আবার মায়ের গালি খাওয়ার ভয়ে সন্ত্রস্ত চক্ষু ফিরিয়ে মাকে বল্‌ল, "তোমার সই মারা গেল বুঝি!"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে' মা বল্‌লেন, "তার দুঃখের কথা আগে যদি জানাত, তবে তার অসময়ে হয়তো মরণ হ'ত না। ছেলেটা তোর মতই হাঁদা, একটা আস্ত গাধা; মেয়েটী যেন পদ্মফুল। মা মরায় দু'জনেই পড়েছে অকূল পাথারে। আশ্রয় বল্‌তে মানুষের একখানা কুঁড়ে ঘর, আবাগীর তাও ছিল না।"

ঘড়ির কাঁটা তখন পাঁচ মিনিট গেছে সরে'; প্রতি সেকেণ্ডে তার চিত্ত হচ্ছিল অস্থির, চঞ্চল, সে একটা কৃত্রিম দুঃখ-সূচক শব্দ করে' বল্‌ল, "আচ্ছা, তবে আসি মা'!"

মা ভ্রূকুঞ্চিত করে' বল্‌লেন, "আসল কথা এখনও বলি নি। বোস্‌, স্থির হয়ে শোন্‌। সব কথা যেমন হেসে' উড়িয়ে দিস্‌, এ তেমন কথা নয়।"

প্রিয়রঞ্জন একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও, মায়ের মুখের পানে চেয়ে মেঝের উপর এসে' বস্‌ল।

মা বল্‌লেন, "সে কাতর মিনতি আমি এড়াতে পারি নি। দেরী করারও যো নেই। মেয়েটীর বয়সও হয়েছে, তাকে আমি ঘরে তুলে' আন্‌ব।"

"ওঃ, তার জন্যে খুব লোকের সঙ্গেই পরামর্শ কর্‌ছ! তোমার ঘর-দোরের তো অভাব নেই, মা-বাপ-মরা অনেক মেয়ে ছেলেকেই আশ্রয় দিতে পার। এইবার তবে আসি, মা"—

ছেলে এই বলে' উঠে' দাঁড়াতেই মাও তার সঙ্গে উঠে' দাঁড়ালেন, এবং তার হাত ধরে' বল্‌লেন, "যেমন তেমন করে' ঘরে আনা নয় রে, ঘরের লক্ষ্মী বধূ-বরণ করে'ই তাকে ঘরে তুল্‌ব।"

প্রিয়রঞ্জন 'হাঁ' করে' মায়ের মুখের পানে চেয়ে রইল।

মা বল্‌লেন, "জানি, তোর অমত হবে না। মাগী খাবি খায় আর বলে, 'সই, মেয়েটাকে তুমি বউ ক'রো, তোমার ঘরে সে একান্ত অযোগ্যা হবে না।' বাপের কাছে সেদিন পর্য্যন্ত সংস্কৃত শিখেছে; দু' একটা পরীক্ষায় নাকি পাশও করেছে, আর মেয়েটিও যেন স্বর্গের পরী!"

প্রিয়রঞ্জন অবাক্ হয়ে বল্‌ল, "বল কি মা, আমার সঙ্গে তার বিয়ে দেবে!" হো-হো করে' হেসে' বল্‌ল, "দোহাই তোমার, সে বয়স আমার হয় নি। তা' ছাড়া সংস্কৃত জানা একটা পণ্ডিতকে বিয়ে করে' ফ্যাসাদ বাধাতে পার্‌ব না, আমায় রক্ষা কর।"

মা হেসে' বল্‌লেন, "তুইও কি একটা গণ্ড মুখ্যু! বি-এ'র পর এম-এ-টা পাস্ কর্‌লেই তো তোরও পাণ্ডিত্য কম হবে না! হাসি-ঠাট্টার কথা নয়। পরের বাড়ী সোমত্ত মেয়েকে রেখে' এসেছি দশ-দিনের জন্যে। শ্রাদ্ধ মিট্‌লেই অরক্ষণীয়া কন্যা হিসাবে বিয়ে দিয়ে তাকে ঘরে তুল্‌ব। মরণকালের প্রতিশ্রুতি—এর আর নড়চড় হবে না।"

"তার চেয়ে গলায় ফাঁসী লট্‌কে' দাও না! কি যে তুমি ব'ল মা, ডাল ভাত খাওয়ার মত এ যেন মুখে তুলে' দেওয়ার ব্যাপার করে'

তুল্‌লে! এমন প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ভরসাও তো তোমার হ'ল! যদি মায়ায় পড়ে' থাক, বিষয়-সম্পত্তির অংশ তারে দাও, আমার আপত্তি নেই; কিন্তু হঠাৎ একটা জগদ্দল পাথর বুকে তুলে' দেবে, তাতে আমি রাজী নই।"

খুব ভরসার সঙ্গেই একথা বলে' প্রিয়রঞ্জন বাহির হয়ে গেল। মায়ের মনে প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর হ'ল। তিনিও মনে মনে বল্‌লেন—'তোর একদিন কি আমারই একদিন! হয় এই বিয়ে, নয় সংসার ছেড়ে' যাওয়া—বড় মুখ করে' যে কথা বলে' এসেছি তা' বজায় করবই করব।'

মায়ের মুখে কথা নেই। ছেলে আব্দার করে' বলে, "আজ কলেজ-ফী না দিলে জরিমানা"; মা মুখ ভার করে' গৃহান্তরে চলে যান। পড়ার ঘরে রাশীকৃত জঞ্জাল। দেউকি বেটা খৈনী টেপে, আর বাজে বকে; মা উদাসী, তাকে ধমক দেন না। উড়ে বামুন সেদিন মাংসে দিয়েছে একরাশ বেগুন ছেড়ে', পাঁচ জন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে খেতে বসে' অপ্রস্তুতের সীমা রইল না। সকালে উঠে' 'চা' 'চা' 'করে' চেঁচিয়ে গলা ফেড়ে' যায়, বুধু বেটা নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়, মা তাকে কিছুই বলেন না। ছাড়া কাপড় রাশীকৃত জমে' যায়; যদিও গালি খাওয়ার ভয়ে তা' কাচা হয়, দু'দিন ধরে'ই ছাতে শুখোয়, তুলে' তেমন করে' পাট করে' কেউ ঘরে রাখে না। প্রিয়রঞ্জন অস্থির হয়ে মাকে বল্‌ল, "এমন হ'লে পড়া-শুনা আর চলে কেমন করে'! গিয়ে না হয়, কিছুদিন হোষ্টেলে থেকে' আসি।" মায়ের সেই বিশ্বস্তর মূর্ত্তি দেখে আর কিছু বল্‌তেও ভরসা হয় না।

প্রিয়রঞ্জন দেখ্‌ল, সত্যই সে তিনটে পাশ করেছে বটে, কিন্তু তার মত নাবালক আর নেই। একটা পাঁচ বছরের শিশুরও যে স্বাধীনতা আছে, তার তা'ও নেই। সে ভেবে' উঠ্‌তে পারে না, মায়ের এ কেমন

অধিকার—যে অধিকারের বলে তিনি ছেলের গলায় একটা মেয়েকে অনায়াসে ঝুলিয়ে দিতে পারেন, যাকে নিয়ে তাকে জীবন-মরণ সংগ্রাম করতে হবে—না, তাকে সে এমন ভাবে সম্পূর্ণ অপরিচিত অবস্থায় গ্রহণ করতে কোনমতেই পারে না!

বিয়ের কথাটা তার মনেই হয় নি এতদিন। হঠাৎ এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়ায়, যেখানে যতগুলি সে অনূঢ়া যুবতীর সঙ্গ করেছে তাদের কথাই তার মনে উদিত হ'ল। সুকুমারের বোন টুনু—তার যেমন চ'খের চাহনী, হাসির রেখাটীও তেমন মিষ্টি। বিয়ের যদি আজ প্রয়োজন হয়, টুনুর সঙ্গে হ'লেও বা কথা থাক্‌ত। মিষ্টার চক্রবর্ত্তীর মেয়েটীও দিব্যি সুন্দরী, তার সঙ্গে এক কোর্টে কয়েক বার টেনিসও সে খেলেছে। মেয়েটী যেমন ক্ষিপ্র, তেমনি তার শ্লীলতারও সীমা নেই। ব্যাটে ব্যাটে ঠোকাঠুকি হ'লে সেদিন সে কেমন করুণ দৃষ্টিতে ক্ষমা চাইল। চক্ষের দৃষ্টি স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মত। মাথার চুল যেন দু'কূল উপ্‌ছে-পড়া নদীর কাল জল। নামটীও মধুর ন্যায় মিষ্টি—সুষমা। বিয়ে যদি করতে হয়, তাকে পেলেও চলে। কোথা থেকে একটা গেঁয়ো ধেড়ে মেয়ে জোর করে' গছিয়ে দেওয়ার অত্যাচার মা বলে'ই যে সয়ে নিতে হবে, কর্ত্তব্য-বুদ্ধি তাতে সায় দেয় না। ছেলে যত বিমনা হয়ে ঘুরে বেড়ায়, মা তত স্থির অটল পাথরের মত সঙ্কল্প নিয়ে বসে' থাকেন।

শেষে প্রিয়রঞ্জন অতিষ্ঠ হয়ে বল্‌ল, "মা, দয়া কর, আমি হাঁপিয়ে মরে' যাব। তোমার কোন কথায় কোনদিন আপত্তি করি নি, আজ এই কথাটা আমার রাখ। টাকা দিলে মেয়ে পার হয়, আমার ঘাড়ে ওটাকে চাপিও না।"

মা বল্‌লেন, "কোন্ কথাটা তুই আমার শুনিস্ বল্ ত? বিষয়-রক্ষার ভার ওটা তো দায় বলে'ই এড়িয়ে আছিস্! কলেজের পড়া—ওতো

তোরই যশ, তোরই গৌরব! আমার কথা ব্রহ্মা-বিষ্ণু রদ্ করবে না। আমি তোর মা, কথা দিয়ে এসেছি—এ মেয়ে যদি ঘরে না আনি, আমার মর্য্যাদা যাবে। আর বিয়ে তোকে করতেই হবে। চিরদিন মা বাপই ছেলের বউ পছন্দ করে,—হাল্‌ফ্যাসানে যদিও অন্য রকম হয়, তাতে যে ছেলে-মেয়ের সুখ বেড়েছে তা'ও নয়। ভেবে দেখ্ রঞ্জন, তুই এখন বড় হয়েছিস্, তোর বুদ্ধি বেড়েছে, মায়ের কথা না শুনতেও পারিস্। আমার কথার ঠিক নেই বলে' লোকের কাছে যে অপমান, তা' আমিই সইব, তোকে আর আমি এই নিয়ে জ্বালাতন করব না।"

প্রিয়রঞ্জন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে' বাঁচ্‌ল। তার মনে হ'ল, মায়ের সুমতি হয়েছে ; সে করুণ বচনে উত্তর দিল, "এ বিয়ে থেকে আমায় রেহাই দাও। যদি বউ চাও, আমি ঢের ভাল মেয়ে এনে দেব।"

মা বললেন, "যাও, আর তোমায় এই নিয়ে বিরক্ত করব না।" প্রিয়রঞ্জন যেন হঠাৎ টুঁটি টিপে ধরা থেকে মুক্তি পেয়ে' খোলসা করে' নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচ্‌ল।

তারপর দিন কলেজ থেকে এসে প্রিয়রঞ্জন দেখ্‌ল, বৈঠকখানায় এটর্ণি বসে'। বুধু বল্‌ল, "পরদার আড়ালে মা আছেন—আপনাকে ডাকছেন।"

প্রিয়রঞ্জন তাড়াতাড়ি মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই মুখ না তুলে'ই তিনি বললেন, "তুই মনে করবি, তোর সম্পত্তি দখলে রেখে' তোর উপর আমি শাসন করার সুবিধা পেয়েছি। যখন তোর এমন পৌরুষ হয়েছে, নিজের ভাল মন্দ বুঝ্‌তে শিখেছিস্, মায়ের মান অপমানের চেয়ে, মায়ের কল্যাণ-চিন্তার চেয়ে, নিজের হিত-চিন্তা যখন তোর জন্মেছে, তখন সব থেকে মুক্তি আমি শ্রেয়ঃ মনে করি। আজ থেকে

সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি তোর হাতে ছেড়ে' দিয়ে যাচ্ছি, আমি তোর এক নিয়ে যাব না—ট্রাষ্ট্‌টা পর্য্যন্ত ছেড়ে দিচ্ছি—আজ থেকে তুই রে কারুও অধীন নস্‌, সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীন!"

চিরদিনের খাঁচায় বদ্ধ পাখী মুক্তি পেলে, সে যেমন খাঁচার মধ্যেই প্রবেশ করে, রঞ্জন তেমনি মায়ের পায়ের কাছে অবশের মত বসে' পড়্‌ল। কথাটা যেন তার মাথায় তলাচ্ছিল না। গলাটা ঝেড়ে' নিয়ে সে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "এ সব কি কথা, মা?"

মা ভারী মুখে মাথা নীচু করে'ই উত্তর দিলেন, "কথা বাঁকা-চোরা কিছু নয়। আমি তোর মা, আমার দ্বারা তোর যে কোন অকল্যাণ হ'তে পারে, তা' আমার ধারণায় ছিল না। যে-মা সন্তানকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে রেখে', নিজের শোণিত দিয়ে পুষ্ট করে' তোলে, সে মায়ের মনে সন্তান সম্বন্ধে যে ভাব ও কাজের প্রেরণা জাগে তা' কোথাও অমঙ্গল সৃষ্টি করে না—রঞ্জন, এই বিশ্বাসই আমার ছিল। তাই দুঃখিনী এক অভাগিনীর অন্তিম প্রার্থনায় আমার হৃদয় অসম্মতি দেয় নি; বরং তোর মঙ্গল-কামনাই অন্তর পুলকিত করেছিল। তুই যখন তা' আশীর্ব্বাদ বলে' না নিয়ে অভিসম্পাত মনে করেছিস্‌, তখন মায়ের অধিকার আর আমার নেইই বল্‌তে হবে। আজ তাই তোর পিতৃসম্পদ্‌ তোর হাতে দিয়ে কাশীবাসই স্থির করেছি।"

প্রিয়রঞ্জন আকাশ থেকে পড়্‌ল। ইহার উত্তর যে কিছু আছে, তা' সে হাত্‌ড়ে' খুঁজে পেল না। সে নিতান্ত অসহায়ের মত মায়ের পা দু'টো জড়িয়ে ধরে' কাঁদতে কাঁদ্‌তে জানাল, "অপরাধী হয়েছি, ক্ষমা কর। তোমার দান আশীর্ব্বাদ বলে'ই মাথা পেতে নেব।"

ঘটনা যে এমনভাবেই দাঁড়াবে, তা' এটর্ণি থেকে তার মুহুরী, বাড়ীর সরকার, গমস্তা, ভৃত্য, দাসী সকলেই বুঝেছিল। মায়ের চরণে

প্রিয়রঞ্জনের এই আত্মনিবেদনে বাড়ীর গভীর গুমোট যেন ছেড়ে' গেল, দম্‌কা-বাতাসে সব দিক্ ভরে' উঠ্‌ল।

মা প্রসন্নমুখে ছেলের মাথাটা বুকে নিয়ে স্নেহচুম্বন দিলেন—প্রিয়রঞ্জনের কাণে মায়ের হৃদয়-স্পন্দনের সঙ্গে তার নিজের হৃৎপিণ্ডটাও যেন সমান তালে নাচ্‌ছে বলে' মনে হ'ল।

বৈশাখ মাসের জ্যোৎস্নায় গ্রীষ্মের গুমোট কাটিয়ে দক্ষিণে বাতাস হু-হু করে' বইছিল। কলিকাতার কলরবের উপর সানাই'এর মধুর রাগিণী উদ্‌ব্যস্ত নাগরিক জীবনেও এক ফোঁটা মধুর আস্বাদ দিল। পুরাঙ্গনাদের শুভ শঙ্খনিনাদের সহিত নববধূ বরণ করে' জননী প্রিয়রঞ্জনের ললাটে একটী পবিত্র নিঃশব্দ চুম্বন আশীর্ব্বাদ-রূপেই প্রদান কর্‌লেন।

প্রিয়রঞ্জন দেখ্‌ল—মায়ের কথাই ঠিক; কল্যাণ-শ্রী-মণ্ডিতা এক অপরূপ লাবণ্যময়ী নারী তার পাশে এসে' দাঁড়িয়েছে।

দুই

উৎসবপুরী অকস্মাৎ বিষাদময়ী হয়ে প'ড়ল। প্রিয়রঞ্জনের জর এল কেঁপে'। মাথার যন্ত্রণায় সে অস্থির হয়ে, মায়ের কোলে মাথা রেখে, চোখের জলে বাড়ীশুদ্ধ লোকের হৃদয় ভাসিয়ে দিল। প্রিয়রঞ্জনের চেহারা ছিল শাল-মুগুরের মত শক্ত। এতখানি বয়স হয়েছে, একদিনও তার মাথা ধরে নি। হঠাৎ এই জ্বরে তার বুকেও যেমন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল, মায়ের মনেও তেমনি দুর্ভাবনার সীমা ছিল না। এক দিন গেল, দুই দিন, তিন দিন কেটে' গেল; জ্বরের বিরাম নেই। আত্মীয় স্বজন, প্রতিবাসী, এমন কি বাড়ীর ভৃত্য-দাসী পর্য্যন্ত কাণা-ঘুষা কর্‌তে কর্‌তে কথাটা মায়ের কাণে এসেও পৌঁছিল, যে মেয়েটা বাপ-মা-খেগো, অলপ্পেয়ে অলক্ষণা। বিয়ে হ'তে না হ'তেই প্রমাদ নিয়ে এল।

মা ভারী মুখে কপাল কুঁচ্‌কে' জানিয়ে দিলেন, "এমন কথা কেউ মুখে এনো না। রঞ্জনের ভালমন্দের ভার আমা ছাড়া আর কারু নেই। আমার বুক যখন খুঁটী আছে, তখন রঞ্জন আমার ভাল হয়ে উঠ্‌বেই।"

তার পর নব বধূকে ডেকে' তিনি বল্‌লেন, "যাও বৌমা, লজ্জা করো না। আমি পূজা আহ্নিক নিয়ে ব্যস্ত, তার উপর আছে বিষয়-সম্পত্তি দেখার ঝামেলা; চাকর-বাকর দিয়ে রোগ দেখা হয় না। তোমার মতন দরদ দিয়ে কেউ দেখ্‌বে না। ভয় নেই, আমি আশীর্ব্বাদ করি,—তোমার হাতের নোয়া, মাথার সিঁদুর অক্ষয় হোক।"

মা গেলেন ঘর থেকে বেরিয়ে। তিন দিন অসহ্য যন্ত্রণার পর রঞ্জন পড়েছিল কিছু অবসন্ন হয়ে। মায়ের কথা তার কাণে গিয়েছিল, কাতর দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল নবপরিণীতা বধূর দিকে।

নব বধুর নাম জ্যোৎস্না। নামের সঙ্গে রূপের মিল ছিল খুবই। এমন অমল শুভ্রকান্তি সর্ব্বদা বড় চোখে পড়ে না। সে লজ্জাবতী লতার মত জড়সড় হয়ে রঞ্জনের মাথার কাছে গিয়ে বস্ল। কম্পিত কুসুম-পেলব হাতখানি ললাটে রেখে' সে শিউরে' উঠ্ল গায়ের উত্তাপ দেখে'। চোখের পাতা ভারী হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে জল আর বারণ মান্ল না, টস্-টস্ করে' গণ্ড বয়ে' পড়্তে লাগল বিছানার উপর।

রঞ্জন সোয়াস্তির নিশ্বাস ছেড়ে' তার হাতখানা ললাটের উপর চেপে' ধরে' বল্ল, "ভেবো না, ভয় নেই—তোমার ছোঁওয়া পেলে দু'দিনেই সেরে' উঠ্ব।"

জ্যোৎস্না স্বামীর মুখে এই কথাটী শুনে' ভরসায় বুক বেঁধে' অক্লান্ত সেবায় প্রাণ ঢেলে' দিল। আহার নিদ্রার সময় রইল না। কাদু ঝি এসে' ডাকাডাকি করে'ও তাকে রোগীর শয্যা ছেড়ে তুল্তে পারে না!

শেষে মা এসে' বল্লেন, "যাও মা, দু'টী না খেলে তুমিও বিছানা নেবে, তখন আমার বিপদের সীমা থাক্বে না।"

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও, জ্যোৎস্না দু'ঘটী জল মাথায় ঢেলে' রান্না-ঘরে গিয়ে আসনে বসে। পাতের ভাত পাতেই থাকে, তার পেট যেন ভরে' গেছে কিসে, তা' সে নিজেই জানে না। রোগীর কাছ থেকে এইটুকু ছাড়ান পাওয়ার মধ্যে আরও ব্যথাই তাকে ঘিরে' ধরে। বাহিরে এলেই সে শোনে দাস-দাসীর মুখে, তার ভাইটী করেছে অনেক অপকর্ম্ম। গিন্নীমা খুব ব্যস্ত, এসব কথা তাঁকে জানান হয় না। কিন্তু সরকার মহাশয় বলেছেন, এবার তিনি কারও কথা শুন্বেন না, নিধুবাবুকে দেবেন বাড়ী থেকে তাড়িয়ে।

জ্যোৎস্নার চক্ষে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। বিবাহের পর একান্ত নিরাশ্রয় এই ভাই-বোন দু'টীকে এই বাড়ীতেই আশ্রয় দিয়েছেন যিনি,

তাঁর ভালমন্দ যদি হয়, কি হবে তাদের ভবিষ্যতে! আর এই দুর্দ্দান্ত বয়সে ছ'বছরের বড় হ'লেও, তার ছেলেমানুষীর জ্বালায় পাড়ার হয়েছিল অস্থির। এ বাড়ীতেও তার দৌরাত্ম্য খুবই স্বাভাবিক। নব বধূ সে, এখানে তার কিই বা করবার আছে! সে বিশীর্ণ মুখে কেবলই খবর শোনে, আজ এটা ভেঙ্গেছে, কাল ওটা চুরি করে' নিয়ে পালিয়েছে। জবাব সে দিতে পারে না। তার কেবলই মনে পড়ে, ঐ দক্ষিণদিকের প্রশস্ত খাটের উপর পড়ে' আছেন যিনি তাঁকে; তিনি যেদিন উঠে' বসবেন সুস্থ হয়ে, এই সকলের প্রতিকার সেইদিনই হবে।

নাকে-মুখে দুটী ভাত গুঁজে' বিষন্নমূর্ত্তি জ্যোৎস্না স্বামীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হওয়ার জন্যে যেমনি ঢুকবে বারান্দায়, নিধুবাবু দৌড়ে' এসে কাপড়ের ভিতর থেকে হাত বা'র করে' দেখালে একটা হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত বিচিত্র নস্যের ডিবা। আশে-পাশে বহুমূল্য পাথর খচিত। জ্যোৎস্না সহসা তার হাতখানা ধরে' সেটা কেড়ে' নিতেই, নিধুবাবু এক প্রচণ্ড চপেটাঘাতে সঙ্গে সঙ্গেই নিল প্রতিশোধ।

আঘাতটা হয়েছিল খুবই গুরুতর। চাপা গলায় "মাগো" বলে চেঁচিয়ে উঠতেই, কাদু ঝি গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠল, "মেরে ফেললে গো" বলে'; যে যেখানে ছিল দৌড়ে এসে হাজির হ'ল ঘটনাক্ষেত্রে। মায়ের কাণেও এ রব পৌঁছেছিল। তিনি দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন, সত্যই একটা কাণ্ড বেধেছে।

জ্যোৎস্না সামলে' নিয়ে উঠে' দাঁড়িয়ে কাদুকে বলল, "এই নস্যের ডিবেটা কোত্থেকে নিয়ে এসেছে, কেড়ে নিয়েছি বলে' এত রাগ!"

নিধুবাবু দিল চোঁচা দৌড়।

কাদুর সঙ্গে আর সকলেই সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে বলে' উঠল, "ওমা,

চোর চোর! বাবুর নস্যের ডিবে, মা সেদিন এক্‌জিবিশন দেখ্‌তে গিয়ে পঁচাশি টাকায় কিনে' এনেছিলেন।"

জ্যোৎস্না কাদু-ঝির হাতে হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত [illegible] অবনত মুখে ঘরে প্রবেশ কর্‌ল

মা বুঝে নিয়েছিলেন ঘটনা। বল্‌লেন, "ছেলে-মানুষ, কখন কি করে' বসে, তার কি ঠিক আছে? তুমি মা, এর জন্য কিছু ভেবো না। পাড়া-গাঁ থেকে নূতন এসেছে, এত জিনিষপত্র দেখে' লোভ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আমি একটু চোখ রাখ্‌ব, শুধ্‌রে' যাবে।"

জ্যোৎস্নার যেন মাথা কাটা গেল; তবুও সান্ত্বনা, অশেষ তৃপ্তি, স্নেহ-শীতল মিষ্ট কথায়।

সে এসে' দেখেছিল, তার স্বামীর স্বাস্থ্য ও রূপ রাজার ন্যায়, তার অট্টালিকা, বিষয়-সম্পদের প্রাচুর্য্য, সাক্ষাৎ ভগবতীর ন্যায় শ্বাশুড়ী— এইটুকু বোঝার মত তার বয়স হয়েছে, যে এই সম্পদের সে বিবাহের দিন থেকেই হয়েছে কর্ত্রী; কিন্তু আজন্ম দুঃখ-দুর্দ্দশার ভিতর দিয়ে তার মনের দৈন্য হঠাৎ স্বামীর এই কঠিন ব্যামো দেখে' অসংখ্য বিকৃত আকারে তাকে বিষণ্ণ করে' তুল্‌ল।

দিনের পর দিন যায়, আরোগ্য-লক্ষণের চেয়ে দুশ্চিন্তার কারণই বাড়ে। বাড়ীর লোকে আড়ালে দাঁড়িয়ে তারই দোষ দেয়। তাকেই অলক্ষণা বলে। সে নিজেকেও ধিক্কার দেয়, 'বুঝি এদের কথাই সত্য— আমার মত হতভাগীকে বাড়ী নিয়ে এসে' হ'ল এই মহাবিপদ্।' কিন্তু ভরসা তার বুকে জড় হয় মায়ের কথায়; সে সান্ত্বনা পায়, আশা পায় শ্বাশুরীর মুখ চেয়ে। তিনি বলেন, "ভয় নেই মা; সাক্ষাৎ লক্ষ্মী তুমি, রঞ্জন আমার ভাল হয়ে উঠ্‌বে।"

দশ দিন পরে আশা ক্ষীণ হয়ে এল। রোগী আর প্রকৃতিস্থ নয়।

বিছানা ছেড়ে' তেড়ে' উঠে' বসে। জ্যোস্নার দিকে ক্রূর দৃষ্টিতে চায়।

প্রসারিত করে' কখনও তাকে স্নেহ করে, জড়িয়ে ধরে; কখনও বা নিষ্ঠুর নি[illegible] সর্ব্ব শরীর গুঁড়িয়ে দেয়। জ্যোৎস্না অশ্রু-নত নয়নে স্বামীর রোগক্লিষ্ট বিশীর্ণ মুখের দিকে চেয়ে' থাকে। তার উদাস দৃষ্টির সম্মুখে নিজের প্রফুল্ল-কমল মুখখানি রেখে' স্বামীকে বোঝাতে চায়, 'ওগো তুমি ভাল হও, একবার তেমন করে' চাও, যে চাওয়ায় আমায় চিরদিনের জন্য কিনে' নিয়েছ, আমার পরাণটুকু নিয়ে তুমি সবল সুস্থ হয়ে দাঁড়াও, আমি তোমার চরণতলে উৎসর্গের ফুল হয়ে লুটিয়ে পড়ি।'

আজ মায়ের মুখে আলো নাই। উৎসাহের দীপ তাঁর চোখেও দীপ্তি দেয় না। জ্যোৎস্না চাপা গলায় মায়ের গলা জড়িয়ে বলে' উঠ্‌ল, "মা, আমায় বিদায় দাও; সত্যই আমি অলক্ষণা।"

মা বধূকে বুকে নিয়ে, জড়-করা বুকের আশা চেষ্টা করে' চোখের কোণে এনে' উৎসাহ-কণ্ঠে বল্‌লেন, "ছিঃ মা, বিপদের দিনে বুকভাঙ্গা হ'তে নেই। সতীলক্ষ্মী তুমি, ভগবান তোমায় পতিহারা কর্‌বেন না। রঞ্জন যদি বাঁচে, সে তোমার সীঁথের সিঁদুরের জোরেই বাঁচ্‌বে, সে যে একান্ত তোমারই!"

মায়ের এই সান্ত্বনায়, এই আশার কথায় চিন্তার দাবানল থেকে মুক্ত হয়ে হৃদয় বিন্দু-বিন্দু শীতল অমৃতে অভিষিক্ত হয় বটে; কিন্তু কি এক গুরুদায়িত্বে তার সবখানি আচ্ছন্ন হয়ে' পড়ে। সে যে একটা চৈতন্যময় পদার্থ, এই জ্ঞান থাকে না। জড় পদার্থের ন্যায় যেন কে তাকে চালায়, স্বামীর সেবা করায়; সে যেন হয়ে গেছে একটা যন্ত্রপুত্তলিকা।

ঘর ভরে' গেছে বড় বড় ডাক্তারে। সোঁ-সোঁ করে ফানেলের মুখ দিয়ে অক্সিজেন গ্যাস। মা দাঁড়িয়ে আছেন পুত্রের শিয়রে, যেন সাক্ষাৎ

দেবীমূর্ত্তি। বিছানার একপ্রান্তে জ্যোৎস্না বসে' মায়ের মুখ পানেই চেয়ে' ছিল। মা চেয়ে' আছেন পুত্রের দিকে অনিমেষ নয়নে। রঞ্জন হাঁপাচ্ছে, কে যেন তার গলা বুক চেপে' ধরেছে। দমকে দমকে সে আর নিশ্বাস নিতে পারে না। চক্ষের আর সেই রক্তাভ ঘোরাল বর্ণ নেই। মার্ব্বেল পাথরের ন্যায় সাদা চোখে মিশ্-কালো দুটী তারা একবার উর্দ্ধে, একবার চতুর্দ্দিকে ঘুরে' বেড়াচ্ছে। মায়ের দিকে চোখ পড়্‌তেই তার দৃষ্টি হয়ে' পড়্‌ল ঝাপ্‌সা, গড়-গড়িয়ে গণ্ড বয়ে' জলধারা ঝর্‌ল।

মায়ের ওষ্ঠপুট দৃঢ়, নয়নে প্রশান্ত দৃষ্টি, অকুঞ্চিত প্রশস্ত ললাট, স্নেহশীতল বাহু দুটী রঞ্জনের চিবুক স্পর্শ করে' মধুর স্নিগ্ধ কণ্ঠে তিনি বল্‌লেন, "কি কষ্ট হচ্ছে, রঞ্জন?"

রঞ্জন হাঁপাচ্ছে, দম্‌কে একটা নিশ্বাস ফেলে' বলে' উঠ্‌ল, "মা, মা!"

জ্যোৎস্না চেয়ে' আছে মায়েরই দিকে, বুঝি তাঁর চক্ষু বিদীর্ণ হয়, অশ্রু-উৎস উথ্‌লে' ওঠে। জ্যোৎস্নার সমস্ত হৃদয় মুচ্‌ড়ে' উঠ্‌ল। তার কণ্ঠে যেন কে আর্ত্তনাদ তুল্‌তে ব্যগ্র হয়েছে, তাকে যেন চেঁচিয়ে কেঁদে' উঠ্‌তেই হবে।

কিন্তু মায়ের কণ্ঠে অপার্থিব সুগভীর স্নেহ-মূর্চ্ছনা ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল, "রঞ্জন, আমি তোর মা—আমার বুকে তোর আছে নিরাপদ্ স্থান, ভয় কি বাবা—দুঃখ কি বাবা!"

যেন জীবনের কি এক অপূর্ব্ব প্রভাব ঘরে স্পষ্ট আলোর মত বিছিয়ে গেল, দমকে দমকে নিঃশ্বাস যেন স্থির লঘু হয়ে' পড়ল। ডাক্তারের হাতে মধু দিয়ে মকরধ্বজ ও মৃগনাভি মাড়া খলটী থর-থর করে' কাঁপ্‌ছিল; তিনি এই অবস্থায় উহা অমৃতের মত ঢেলে' দিলেন রঞ্জনের মুখে। রঞ্জন লেহন কর্‌তে কর্‌তে মায়ের দিকে চেয়ে' হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলে' উঠ্‌ল, "না মা, মরা আমার হ'ল না—।"

সেইদিন সন্ধ্যার সময়ে, প্রশান্ত কক্ষে চাঁদের আলো এসে' পড়েছে রঞ্জনের বিছানার উপর। রঞ্জন যেন দীর্ঘ সংগ্রামের পর বিশ্রাম কর্‌ছে নিরাপদে। নিঃশ্বাসের তালে তালে তার বক্ষ দুলে' উঠ্‌ছে স্বচ্ছন্দে। ধীর পদে মা ঘরে এসে দাঁড়ালেন।

জ্যোৎস্না নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে' উঠে' এসে মায়ের চরণে পড়্‌ল লুটিয়ে। কৃতজ্ঞতায় তার বুক ভরে' উঠেছিল। কি যেন আর বল্‌তে গিয়ে বলা হ'ল না। মা তাকে তাড়াতাড়ি তুলে' নিয়ে, বুকের মধ্যে টেনে' নিলেন। সীঁথির উপর সুগভীর নিঃশব্দ চুম্বনে জ্যোৎস্নার হৃদয় পুলকিত হয়ে উঠ্‌ল।

এক বৎসর পরের কথা। প্রিয়রঞ্জনকে পূর্ব্বস্বাস্থ্য ফিরে' পেতে মায়ের আদেশে মাঝে ছয় মাস পুরীতে আস্‌তে হয়েছিল। নিধুবাবু নস্যের ডিবা চুরি করার দিন থেকেই উধাও। জ্যোৎস্না অনেক খোঁজ খবর করে'ও তার সন্ধান পায় নি। তার পরিপূর্ণ আনন্দ-মাখান মুখখানিতে এই জন্য মাঝে মাঝে বিষণ্ণতার একটী ঘন ছায়া এসে' পড়ে। প্রিয়রঞ্জন সান্ত্বনা দিয়ে বলে, "ভাবনা নেই, যাবে কোথায়! এবার পূজায় সে বাড়ী ফির্‌বেই।"

পিঠোপিঠি দুটী ভাই বোন সুখে দুঃখে একত্র খেলাধূলায় মানুষ হয়েছে; আজ তাকে ছেড়ে' থাকায় দুঃখের স্মৃতি বুকে অধিক করে' জেগে' ওঠে। এক দিকে যেমন মনে পড়ে অন্তিম শয্যায় মায়ের নিঃসহায় কাতরতা, অন্য দিকে তেমনি এই উদার আশ্রয়—তার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়ে তোলে।

মায়ের মৃত্যুস্মৃতি, শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎকার, তাঁর স্নেহশীতল নয়নের সেই প্রথম দৃষ্টি, বিবাহ, স্বামীর কঠিন ব্যারামের

কথা, বিশেষ করে' সব কিছুকে ঢাকা দিয়ে জেগে' ওঠে গত ছয় মাস পুরীতে প্রিয়রঞ্জনের কাছে কাছে থাকার সুখস্মৃতি। সেই তটপ্রান্তে নীল ফেণিল তরঙ্গোচ্ছ্বাস, বিস্তৃত বালুভূমির সীমান্তে তাদের সেই ক্ষুদ্র একতলা বাসাটীর কথা, সম্মুখে সমুচ্চ প্রাচীন ঝাউ-বৃক্ষটী অপরাহ্নের ঝড়ো বাতাসে পাতায় পাতায় শিষ্ দিয়ে চিত্ত আকুল করে' তুল্‌ত, দমকা হাওয়ায় বালুবর্ষণ হ'ত, চোখে মুখে ঝাপ্‌টা খেয়ে' কখনও প্রিয়-রঞ্জন, কখনও বা সে চোখ বুজে' পরস্পরকে বল্‌ত চোখের যন্ত্রণার কথা। প্রিয়রঞ্জন মুছিয়ে দিত রুমাল দিয়ে জ্যোৎস্নার চক্ষু-দুটী, আবার কখনও বা জ্যোৎস্না তার কোমল অঞ্চল দিয়ে প্রিয়রঞ্জনের রক্তাভ চক্ষে জলধারা মুছে' দিত পরিপাটী যত্নের সহিত; আর প্রিয়রঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়ে দিত তার রক্ত অধরে ক্ষুদ্র একটী চুম্বন। উপকারের প্রতিদান —লজ্জায় তার মুখ রাঙ্গা হয়ে উঠ্‌ত!

সন্ধ্যায় দু'-জনে বেড়াত, সিক্ত বালুভূমির উপর নেচে' নেচে' ঢেউ এসে' তাদের চরণ চুম্বন কর্‌ত। আকাশে উঠ্‌ত পরিপূর্ণ মূর্ত্তি নিয়ে চন্দ্রদেব। রূপার ধারায় জল-স্থল উদ্ভাসিত হ'ত। কে অধিক সুন্দর, এই নিয়ে দু'জনের মধ্যে তর্কাতর্কির সঙ্গে ঝগড়া বেধে' যেত। তারপর লোকবিরল সেই সমুদ্র-সৈকতে জ্যোৎস্না ঢলে' পড়্‌ত নীরব নিস্তব্ধ হয়ে' প্রিয়রঞ্জনের বুকে। সেই সুখের স্পর্শ ও স্মৃতি তাকে এমন-ভাবে আচ্ছন্ন করে' রাখে, যে অতীতের দুঃখ মনেই আসে না। কিন্তু এত ঘনীভূত সুখের লালিমা ভেদ করে'ও দাদার করুণ স্মৃতিটী জেগে' উঠ্‌ত; তাই তার প্রফুল্ল-কমল-সদৃশ মুখখানিতে বিষাদের ছায়া দেখা দিত। রঞ্জনের চক্ষে তা' এড়িয়ে যেত না। তার মুখের একটী সান্ত্বনা-বাক্যে জ্যোৎস্না পুলকে আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ত। এমন করে'ই এই দম্পতির দিন কেটেছিল।

পূজা এসে' পড়্ল। পঞ্চমীর চাঁদ সন্ধ্যার পরেই পূর্ব্বদিকের আকাশে ভেসে' উঠেছে। জ্যোৎস্না ছাদের উপর মাদুরে বসে' সারা বিকাল ধরে' কার্পেটের উপর যে নিখুঁৎ পদ্মফুলটী তুলেছে, তাই একদৃষ্টিতে দেখ্ছিল; এমন সময়ে, প্রিয়রঞ্জন এসে' হেসে' বল্ল, "আমার কথা সত্যি হ'ল কি না দেখ, তোমার ভাই এসে' হাজির হয়েছে।"

উৎসাহে, আনন্দে জ্যোৎস্নার মুখে কথা ফুট্ল না, উদ্গ্রীব দৃষ্টিতেই সে প্রশ্ন তুল্ল, "কোথায় সে ?"

প্রিয়রঞ্জন হেসে' বল্ল, "তোমার প্রকৃতি একেবারেই উল্টা রকমের—এই জীবটি কি কাণ্ড করেছে, শুন্লে তুমি রেগেই যাবে।"

জ্যোৎস্নার মনে যে আনন্দের উচ্ছ্বাস জেগেছিল তা' যেন স্তিমিত হয়ে পড়্ল।

সে বল্ল, "কি কাণ্ড, শুনি ?"

কথার উত্তর প্রিয়রঞ্জনকে দিতে হ'ল না, একটা মলিন ছেঁড়া পাঞ্জাবী গায়ে নিধুবাবু স্বয়ং উপস্থিত হ'ল।

সে বলে' উঠ্ল হঠাৎ ভগ্নীর দিকে চেয়ে করুণস্বরে, "আমার দোষ কি! সেদিন ঝি চাকর মিলে অমন অপমান—সহ্য না কর্তে পেরেই তো বাড়ী ছেড়ে' যেতে হ'ল। দাদা বাবু ভাল থাক্লে এমনটী হ'ত না।"

জ্যোৎস্না ঘটনা শুনে' ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হ'ল এমনই, যে সে আর মুখ তুলে' কারও সঙ্গে কথা কইতে পারল না। এমন-ভাবে তার ফিরে' আসার চেয়ে চিরদিনের জন্য তাকে বিসর্জ্জন দেওয়াও শ্রেয়ঃ মনে হ'ল। বাড়ী ছেড়ে' যাওয়ার পর থেকে সে গাঁট-কাটা জুয়াচোরদের আড্ডায় গিয়ে মিশেছে। বড়বাজারে পকেট কাটার দলে পড়ে' সে পুলিশের কাছে ধরা পড়ার পর, জানিয়েছিল তার আপনার জন প্রিয়রঞ্জনের

কথা। প্রিয়রঞ্জন এ সকল কথা জ্যোৎস্নাকে না জানিয়েই জামিনে তাকে খালাস করে' এনেছে ; কিন্তু ঘটনা যা' দাঁড়িয়েছে তা'তে তার জেল হবে নিশ্চয়ই।

রাত্রে নতমুখে সে স্বামীকে জানাল, "কেন তুমি আমায় না জানিয়ে ওকে খালাস করে' নিয়ে এলে ? ঝি-চাকরের কাছে আমি মুখ তুল্‌তে পারি না; অমন ভায়ের মুখ দেখ্‌তেও আর রুচি নেই—ওকে তুমি বিদায় করে' দাও।"

প্রিয়রঞ্জন বল্‌ল, "জেল ত হবেই ; তবে চেষ্টা কর্‌ব, বদ্‌-সঙ্গে পড়ে' ভদ্রলোকের ছেলে প্রথম অপরাধ করেছে—শাস্তি যদি কম হয়।"

"না, না ওই নিয়ে তুমি পুলিশে যাওয়া-আসা করো না ; নিন্দে হবে। তুমি তার ভগ্নীপোত বলে' তোমার দিকেও কত লোক চেয়ে দেখ্‌বে, আমার যেন মাথা কাটা যাচ্ছে ! মায়ের পেটের ভাই বটে, কিন্তু ওর নাম কর্‌লে আমার ঘৃণা হচ্ছে।"

ঘৃণায়, লজ্জায় জ্যোৎস্নার মুখ বিবর্ণ ; তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে' এল। পরদিন সন্ধ্যায় প্রিয়রঞ্জনের কাছে সে শুন্‌ল, নিধুবাবুর ছয় মাস শ্রীঘর-বাসের বিধান হয়েছে। অনেক চেষ্টা করে'ও হাকিম তাকে ছাড়্‌ল না, রাজদণ্ডই তার অদৃষ্টে ছিল। জ্যোৎস্নার বুকের ভিতর কি এক অব্যক্ত সূচিবিদ্ধ যন্ত্রণা হচ্ছিল ; কিন্তু সে তা' গোপন করে'ই অতি সহজ ভাষায় বল্‌ল, "মরুক গে, এত বড় কালি যে আমার বাপ মায়ের নামে দিতে পারে, সে আমার ভাই নয়, শত্রু।"

প্রিয়রঞ্জন জ্যোৎস্নার মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌ল ন্যায় ও সততার অম্লান উজ্জ্বল মূর্ত্তি, ইহার পার্শ্বে সত্যই তার ভায়ের ঠাঁই নাই !

আজ সপ্তমীর প্রভাত। কোলাহলময়ী রাজনগরী কলিকাতাও শারদ-জননীর আগমনে যেন কি এক অসাধারণ ভাবময়ী মূর্ত্তি ধরেছে !

বিরল রাজপথ। পূজার সময়ে কলিকাতায় কেবল বিদেশীরাই থাকে না তা' নয়, কলিকাতাবাসীও কলিকাতা ছেড়ে' বাহির হয়ে যায়। হাট, বাজার, বিপণি কয় দিন পণ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ হয়েছিল, আজ সব যেন শূন্য ও শ্রীহীন হয়ে' পড়েছে; খরিদ্দারের ভীড় নেই। লোকের মুখে আনন্দের আভা ফুটে' উঠ্‌ছে। পথে, ট্রামে, বাসে নব পরিচ্ছদে নারী-পুরুষ চলেছে। হাসি ও কথায় কোন কালিমা নেই। স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছতার বিমল আলোর ঝরণায় মানুষের সকল মলিনতা যেন মুছে' গেছে। দূরে দূরে পূজাবাড়ী থেকে বাদ্যধ্বনি শোনা যাচ্ছে, সানাইয়ের রাগিণী-আলাপ বাতাসে ভেসে' আস্‌ছে। উৎসবের ধুম লেগেছে যেন ঘরে ঘরে।

মা পুত্রবধুকে ডেকে' গহনার বাক্স খুলে' সাজিয়ে দিলেন সর্ব্বাঙ্গে নূতনের সহিত পুরাতন অলঙ্কার; মাথায় দিলেন সীঁথি, গলায় গিনি-হারের পাশে শতনরের শোভা ঝকমকিয়ে উঠ্‌ল। পাক-দেওয়া অনন্তের পাশে নিরেট হাঙ্গর-মুখো তাগা, আর হাতের কব্জা থেকে কনুই পর্য্যন্ত রতন-চূড়, বরফি ঠাস্ দিয়ে পরিয়ে দিলেন। নিতম্বে দুলিয়ে দিলেন সোণার বিছার সঙ্গে চন্দ্রহার। হেসে' বল্‌লেন, "এ-যুগে বাবু এ-সবের চলন নেই; এসব আমার শাশুড়ীর আমলের। আমার ঐ এক ছেলে, তাই তোমায় দিয়ে আজ আমার সাধ মিট্‌ল। একবার বাড়ীখানি ঘুরে' খুলে' রেখো—এত গহনা একটা ভারী বোঝার মতই মনে হবে। আজ থেকে এসব তোমারই।"

দারিদ্র্যের কোলে অতি দুঃখে মানুষ হয়েছে জ্যোৎস্না, আজ তার সৌভাগ্যের সীমা নেই। ভায়ের জন্যও বুকের মাঝে দরদ রাখার স্থান-টুকুও সে মুছে' দিয়ে পরিপূর্ণ ভাবে আপনার সবখানি ঢেলে' দিয়েছে তার স্বামীর চরণে। আত্মদানের এই তার অশেষ সৌভাগ্য তার মনে

গৌরবের চেয়ে এই দু'টী গুরুজনের প্রতি কৃতজ্ঞতাই বাড়িয়ে তুলে। সে তার হৃদয়টাকেই নুইয়ে মাথাটা লুটিয়ে দিল শাশুড়ীর চরণে। মার মনে হ'ল, গরীবের মেয়ে বটে, কিন্তু ভগবান তাঁর যোগ্য বধূই মিলিয়ে দিয়েছেন।

রাত্রিকালে রঞ্জন ঘরে এসে' দেখ্‌ল, রূপ-যৌবনের মেলা বসে' গেছে তার ঘরখানি জুড়ে'। সে সারাদিন দেখেছে অলিন্দে অলিন্দে সোণার প্রতিমা-রূপে তার পত্নীকে ঘুরে' বেড়াতে নানা কাজে। নব বস্ত্রের সুগন্ধে, কেশমার্জ্জনের সৌরভে, সুবাসিত তৈলের আঘ্রাণে সমস্ত বাড়ীখানি সারাদিন আমোদিত হয়ে' আছে। পূজার উৎসব লক্ষ্মীপ্রতিমা এই বধূটিকেই কেন্দ্র করে' মাতিয়ে তুলেছে।

শয়ন-কক্ষের শোভা আজ তুলনাহীন। আভরণ-রাশির আড়ম্বর আর নেই। বিচিত্র বসনের চাক্‌চিক্য নেই। বনকুসুমের মত সুবিমল সৌরভপূর্ণ সে অতুল্য রূপের অনাবিল শোভায় রঞ্জন মাতাল হয়ে' গেল। সাজ-সজ্জাহীন ভগবানের দেওয়া অকৃত্রিম রূপের অগ্নিশিখাই তার সম্মুখে যেন জ্বলে' উঠেছে। সে রূপ যেন ভোগের নয়, আরাধনার—রঞ্জন চেয়ে' রইল অপলক দৃষ্টিতে।

জ্যোৎস্না সত্যই নিরাভরণা। সারাদিন সে মায়ের অনুরোধে অলঙ্কারের গুরুভারে ক্লান্ত হয়ে' পড়েছিল; সন্ধ্যার পর সংসারের সকল দেখাশুনা শেষ করে', সে একে একে সমস্ত অলঙ্কারগুলি খুলে' রেখে' সন্ধ্যাস্নান সমাপন করে' পরিধান করেছিল রঞ্জনেরই একখানি সরু রেশমী পাড়ের ফিন্‌ফিনে ধুতি। হাতে তার দু'-গাছি সোণার সরু রুলী, পৃষ্ঠে আলুলায়িত মেঘরাশির ন্যায় কুন্তল, ললাটে ঘন ঊষারাগের ন্যায় উজ্জল সিন্দুর-বিন্দু—রঞ্জন বিহ্বল অনিমিষ নয়নে তার পানে চেয়ে' রইল।

রক্তরাগ ওষ্ঠপুট, বিকশিত কুন্দদন্ত ঝক্‌ঝকিয়ে উঠ্‌ল, সঙ্গে সঙ্গে বংশীধ্বনি, "হাঁ করে' দেখ্‌ছ কি? ভাল দেখাচ্ছে না বুঝি! সেজে-গুজে' থাকা কি পাপ বল ত, আমার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে আছে। কি করি, মায়ের সাধ"—

"না জ্যোৎস্না, আড়ষ্ট হয়ে' আর তুমি থেকো না; প্রভাত-পদ্মের মত অমল রূপশ্রী এমনই মনোহর-মূর্ত্তিতে আমার হৃদয়ে তুমি নিত্য কাল ফুটিয়ে রেখো। রূপের পূজা আমি শিখি নি, কোন দিন এ পাঠ আমি পড়ি নি; রূপের স্তুতি কি করে' কর্‌তে হয়, জানি না। আমি তোমার অনুগত পূজারী, আমার পূজা তুমি অকিঞ্চন বলে'ই সহজ-ভাবেই নিও।"

"কি যে বল—লেখাপড়া শিখেছ বলে', বুঝি লজ্জা দিতে হয়!" এই বলে' রঞ্জনের দুটো হাত এক সঙ্গে তুলে' দিয়ে সে তার বুকে এসে প'ড়্‌ল।

রঞ্জন অনুভব কর্‌ল, যেন সে পুরাণবর্ণিত কোন এক অপ্সরালোকে উপনীত হয়েছে; তার মনে হ'ল, বুঝি এমন আচম্বিতে কিছুর ত্রুটি হয়ে যেতে পারে, যার ফলে, তাকে যেন হয় তো একদিন উর্ব্বশী-হারা পুরূরবার মত বিরহ-বিধুর হ'তে হবে।

বিস্ময়ে, আহ্লাদে, আতঙ্কে সে উদাসীন পুরুষমূর্ত্তি অনিন্দ্যসুন্দরী প্রকৃতির কোলে হিন্দোলিত হয়ে উঠ্‌ল। সপ্তমী-পূজার আরতির বাদ্য তখনও শোনা যাচ্ছিল।

তিন

মার কাছে গিয়ে ছেলে আব্দার জানাল, "বন্ধু-বান্ধবেরা আর ছাড়ে না, তাদের একদিন ভোজ না দিলেই নয়।"

মা হেসে' বল্‌লেন, "আমিও চুপ করে' আছি। এতদিন মনে মনে ভাব্‌ছি, রঞ্জন বুঝি ভুলে'ই গেছে তার বন্ধুদের। বিয়ের পর ফুলশয্যেও করা হয় নি; পেটের পিলে চমকে' গেছ্‌ল, নারায়ণ মুখ রেখেছেন। একদিন সবাইকে ডেকে, আমোদ আহ্লাদ কর।"

পূর্ণিমার দিন একটা বড় রকমের পার্টি দেবার আয়োজন করা হয়েছে। তার আগের দিন রঞ্জন বুঝিয়ে দিচ্ছিল জ্যোৎস্নাকে, কি তাকে কর্‌তে হবে।

রঞ্জনের আজগুবি কথা শুনে' সে কপালে চক্ষু তুলে' ব'ল্‌ল, "তুমি বল কি গো, তোমার ধেড়ে ধেড়ে পুরুষ-বন্ধুদের কাছে আমায় দাঁড়াতে হবে? লজ্জায় যে মরে' যাব, ও-সব আমি পার্‌ব না!"

"না পার্‌লে, অপমানের আর শেষ থাক্‌বে না! তাদের বাড়ী গেছি, বন্ধুর চেয়ে বন্ধু-পত্নীরাই আদর আপ্যায়নে তৃপ্তি দিয়েছে বেশী; আমার বাড়ী এসে' তারা তোমায় যদি না দেখ্‌তে পায়, গঞ্জনা দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দেবে।"

"এ্যাঁ, বল কি? হাঁগা, বউ-মানুষ, তোমরা পুরুষ, কি বলে' আদর আপ্যায়ন করে গো, চোখ তুলে' তারা পুরুষের মুখপানে চায় নাকি?"

"হুঁঃ, চোখ তুলে' চাওয়া—দস্তুরমত শেক্‌হ্যাণ্ড করে' চেয়ারে নিয়ে গিয়ে বসায়! খেতে লজ্জা ক'র্‌লে, হাত চেপে' ধরে, মুখে তুলে' দেয়!"

"ওরে বাবাঃ, ওসব আমি পার্‌ব না, আগে থাক্‌তেই বলে' দিচ্ছি! এ কোন দেশী কথা, পরপুরুষকে ছোঁওয়া—তাদের স্বামীরা কিছু বলে না?"

"তোমাকেও তো তাদের মত করতে হবে—আমিও তো তোমার স্বামী, তার জন্যে তোমাকে কি কিছু বল্‌ব ?"

"তা' না বল বাপু, আমার এই চোখ দুটো আর কারু দিকে যদি চায়, সে আমি খোঁচা দিয়ে শেষ করে' ফেল্‌ব।"

প্রিয়রঞ্জন হেসে' বল্‌ল, "এই জন্যই তো বিয়ের আগে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া, সে সব কথা তোমায় বলি নি বুঝি !"

"কি কথা ?"

"তখন কে জানে, তুমি এমন হবে ! মা তোমার কথা উত্থাপন করতে না করতেই আমি বসেছিলাম এমন বেঁকে, যে মায়ের সঙ্গেই বুঝি ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় !"

"কই, এসব কথা তো তুমি বল নি আমাকে !"

"সে কি আর কথা ! আমার ধারণা ছিল, গেঁয়ো মেয়েগুলো আর এক রকমের জীব, একেবারেই আপ-টু-ডেট্ নয়। আমার সঙ্গে পোষাবে না বলে' সে কি আব্দার !"

"তারপর—?"

"মাকে দেখ্‌ছ তো ? উনি যা' জিদ্ ধরবেন, ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু এলেও তা' কেউ ছাড়াতে পারবে না ; শেষে রাজি হলুম।"

"ও বুঝেছি—মায়ের জবরদস্তিতেই তবে তোমার বিয়ে করা—আমি তো সত্যিই পাড়াগেঁয়ে, তোমার মনের মত হই নি—না ?"

প্রিয়রঞ্জন কথাগুলির উত্তর দিল নিতান্ত লঘুভাবেই—সে লক্ষ্য রাখে নি, নারীর কোমল হিয়া তার এই সামান্য কথায় আঘাত পেয়ে কেমন চঞ্চল হয়ে' উঠেছে ! জ্যোৎস্নাও হাস্‌ছিল বটে, কিন্তু সে হাসিতে আর তেমন রং ছিল না ; কষ্ট করে'ই ঠোঁটের কোলে কোলে সে কৃত্রিম হাসির রেখা টেনে' যাচ্ছিল।

রঞ্জন বল্‌ল, "আমি জান্‌তুম, বিয়ে হবে আমার টুনুর মত, সুষমার মত অথবা মিসেস্ চ্যাটার্জ্জির মত একটা মেয়ের সঙ্গে। বেপরোয়া টেনিস্ খেল্‌ব ; সে মটর হাঁকিয়ে ছুট্‌বে, আমি তার পাশে সিগারেটটা ঠোঁটে চেপে' বেশ আমেজ করে' বসে' থাক্‌ব—শুন্‌ছ ?"

জ্যোৎস্না একটু উদাসীন হয়ে পড়েছিল—হঠাৎ সতর্ক হয়ে' বলে' উঠ্‌ল, "বেশ হ'ত, আমি একটা আপদ্ হয়েছি না ? ঐ যে টুনু মুনু সব কি বল্‌লে ? তারা সত্যি সত্যি কোন মানুষ, না তোমার গল্প-কথা ?"

"গল্প কেন ? টুনুকে তোমায় দেখাব, সুকুমারের বোন টুনু। আর ঐ মিস্ চক্রবর্ত্তীর নাম করলুম—যেমন রূপ, তেমনি হাতে যদি ব্যাট্ পড়্‌ল, একেবারেই ফ্লাইং বার্ড, সে তুমি দেখ্‌লে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে !"

"হুঁঃ—"

একটা চাপা নিশ্বাস বেরিয়ে এল, জ্যোৎস্নার বুক ঝল্‌সে'। রঞ্জন নিজের খেয়ালেই ছিল ; সে বল্‌ল, "পার্টিতে সবাই আস্‌বে—দেখো, জড়-ভরতের মত গুটিয়ে থেকো না ; মাথা নীচু হবে !"

জ্যোৎস্নার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ হঠাৎ যেন কে চেপে' ধরেছে—সে অনুচ্চ অস্ফুট স্বরেই বল্‌ল, "আমি একটা আস্ত পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, তোমাদের এই সহরের কেতা রাখ্‌তে পারব না।"

সে ত্বরিৎ-পদে রঞ্জনের কাছ থেকে সরে' পড়্‌ল।

তার পরদিন সন্ধ্যার সময়ে ফটকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে নীল, লাল, সবুজ বাল্‌বে বিদ্যুৎ ঝল্‌সে' উঠেছে। বাহির-বাড়ীর বন্ধ-করা হল-ঘরখানা আজ খোলা হয়েছে। জ্যোৎস্না আড়াল থেকে উঁকি মেরে' ঘরের ঐশ্বর্য্য দেখে' নিজের দৈন্যে যেন আজ ম্লান হয়ে' গেছে ; কেবলই মনে হয়েছে, পত্নী বলে' স্বামী যেন কর্ত্তব্যের দায়েই তাকে ভালবাসে, তাকে সুন্দর দেখে—আসলে স্বামীর সে যোগ্য নয়।

ব্যাঞ্জো হাতে নীল আর সবুজের চওড়া পাড়ে ছাওয়া গোলাপী রং'এর সাড়ী পরে', একজন এসে' ফটকে দাঁড়াল—বারান্দার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না স্পষ্টই দেখ্‌ল, প্রিয়রঞ্জনকে তার হাত ধরে' হাসি-মুখে কি ব'ল্‌তে। কথা শোনা গেল না; কিন্তু মনে হ'ল ভঙ্গী দেখে বহুদিনের পর দু'-জনায় যেন দেখা। রঞ্জনের ভাব মিনতিপূর্ণ; আর মেয়েটী অভিমানে, উপেক্ষায় সম্ভাষণ গ্রহণ করে' তার পাশে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল।

দলে দলে নারী পুরুষের আগমন। মেয়েরা এসেছে যেন নাচ গান করতে, প্রায় প্রত্যেকের হাতে বাদ্য-যন্ত্র। বহির্বাটী আনন্দে উচ্ছ্বাসে মুখরিত হয়ে উঠ্‌ল। জ্যোৎস্না খড়খড়ির ধারে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ রঞ্জনের গলার আওয়াজ পেয়ে ফিরে' চাইতেই সে দেখ্‌ল, তার স্বামীর মুখে বিরক্তির চিহ্ন! কাণে যে কয়টা কথা গেল, তার স্বরও প্রীতিপূর্ণ নয়, "তুমি এখনও দাঁড়িয়ে? একবার যে তোমায় যেতেই হবে নেমে'। শীগ্‌গির যাও, কাপড়-চোপড় ছেড়ে' এস।"

জ্যোৎস্না যেন আজ ভূতাবিষ্টা; কোথা থেকে দুর্জ্জয় গর্ব্ব এসে' তাকে যেন অজেয় করে' তুলেছে। সে আজ ভুলে' গেছে, কত অনুগ্রহ দিয়ে এরা তাকে দৈন্য ও অসহায় অবস্থা থেকে তুলে' এনেছে এই সুখের স্বর্গে।

সে উদ্ধত স্বরে বলে' উঠ্‌ল, "আমি যাব না কোন মতেই নীচে নেমে' ঐসব সহুরে সবচুর মেয়েদের সঙ্গে আলাপ ক'র্‌তে।"

রঞ্জন জ্যোৎস্নার এমন কঠিন মূর্ত্তিও কখন দেখে নি, এমন পরুষ ভাষাও কখন শোনে নি—সে অবাক্ হয়ে চেয়ে' রইল তার পানে।

কিন্তু জ্যোৎস্না সেখানে আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াল না—সে ক্ষিপ্রপদে নিজের গৃহে গিয়ে প্রবেশ করল।

বিছানায় পড়ে' জ্যোৎস্না ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল অনেক। কিন্তু কেন? তার সুখের নীড়ে কে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে? এত দুঃখের সে কোন কারণই খুঁজে' পেল না।

রঞ্জন চোরের মত ঘরে এসে', জ্যোৎস্নাকে এমন-ভাবে পড়ে' থাকৃতে দেখে' অতিশয় আশ্চর্য্য হয়ে' গেল। যে রজনী কিছু পূর্ব্বে জ্যোৎস্না-ধারায় হয়ে' উঠেছিল উদ্ভাসিত, চকোর উড়ে' বেড়াচ্ছিল ডানা মেলে' চাঁদের দিকে চেয়ে, বাতাস বয়ে চলেছিল ধীর মন্থর ছন্দে, সে মধুযামিনী অকস্মাৎ ঝড়ের মুখে কালো মেঘে ছেয়ে' গেল অন্ধকারে। প্রকৃতির কোলে এমন অলৌকিক লীলা-রহস্য সে অনেক দেখেছে; তার মনে হ'ল, নারী-প্রকৃতিও বুঝি এই নৈসর্গিক স্বভাবের ছন্দে সুর-বাঁধা। জ্যোৎস্নার এমন অকস্মাৎ ভাবান্তর তা' না হ'লে কেমন করে' সম্ভব হ'তে পারে?

তার পিঠে হাত দিয়ে রঞ্জন বল্‌ল, "জ্যোৎস্না, লক্ষ্মীটী, সোণাটী, তোমার কি হয়েছে জানি না—এমন জান্‌লে এ সব ব্যাপারে হাত দিতুম না। তুমি যদি আজ এমন বিষাদিনী হয়ে' থাক, বন্ধু-মহলে শুধু যে একটু অপ্রস্তুতই হব তা' নয়, আমার বুকটা সত্যই তোমায় দেখে' এমন অবসন্ন ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ছে, মাথা ঘুর্‌ছে, আমি আর দাঁড়িয়ে থাকৃতেও পার্‌ব না।"

রঞ্জন জ্যোৎস্নার শয্যাপার্শ্বে হতাশ হয়ে বসে' পড়্‌ল।

জ্যোৎস্না রঞ্জনের মুখের দিকে চেয়ে' বল্‌ল "এই সব কাজের মত করে' গড়ে' উঠি নি—এক বৎসর যে ভাবে তুমি আমায় চাও, তার মতন করে' আমায় গড়ে'ও তোল নি, কোন শিক্ষাও দাও নি—বল তো সহরের এই সব আদব-কায়দা-দোরস্ত তোমার বন্ধুদের কাছে আমি কেমন করে' গিয়ে দাঁড়াব?"

রঞ্জন জ্যোৎস্নার গ্রীবাদেশ আকর্ষণ করে' নিজের বুকের কাছে নিয়ে এসে' আদর করে' বল্‌ল, "আমায় অপরাধী করো না, জ্যোৎস্না। এই এক বৎসর পৃথিবীতে যে আর কিছু আছে, তুমি ছাড়া আর কাউকে যে মনে রাখ্‌তে হবে, তা' আমি ভাব্‌তে পারি নি। এই ঘটনা শেষ হোক্—তোমার প্রতিভা আছে, শিক্ষার ব্যবস্থা করব। শুধু রূপে তুমি অতুলনীয়া নও, সর্ব্বগুণে তোমার মত নারী দ্বিতীয় খুঁজে' কেউ পাবে না।"

জ্যোৎস্নার বুকে কেন যে মেঘের সঞ্চার হয়েছিল, সে নিজেই তার কারণ খুঁজে' পেল না। সে সুস্থ হয়ে হেসে' বল্‌ল, "আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌ব। একলা আমায় ছেড়ে' দিও না—যা' করতে হবে ইশারায় আমায় জানিও। আশীর্ব্বাদ কর, এই দায় থেকে যেন ভালয় ভালয় উদ্ধার পাই!"

"ব্র্যাভো, ব্র্যাভো"—কি বিকট চীৎকার! সমস্বরে সরু মোটা গলায় একেবারে জন পঞ্চাশ চেঁচিয়ে উঠ্‌ল। জ্যোৎস্না বেতসপত্রের মতন কাঁপ্‌ছিল—সে তার স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে, এদিক্ ওদিক্ উপবিষ্ট তার বন্ধুদের নমস্কার ঠুকে', ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে একান্ত ক্লান্ত হয়ে এক রমণীর আকর্ষণে তার পাশে এসে' সোফায় বসে' পড়্‌ল। আড়চোখে সে চেয়ে' দেখ্‌ল, এ সেই ব্যাঞ্জো-হাতে সুন্দরী।

জ্যোৎস্নার চক্ষের পাতা পাথরের মত ভারী হয়ে পড়্‌ছিল এতগুলি মানুষের চক্ষের দৃষ্টিতে। আর তার মাথা ঘুরছিল অযাচিত রূপের প্রশংসায়। সেই সুন্দরী তার হাত ধরে' বল্‌ল, "মিষ্টার মুখার্জ্জির বিবাহ উপলক্ষে আমি এক পার্টি দেব, আপনাকে কিন্তু যেতে হবে।"

জ্যোৎস্না ঘাড় নেড়ে' সম্মতি জানিয়ে আড়ষ্ট হয়ে' সেইখানেই রইল বসে'।

একটা গোলটেবিল ঘিরে' মেয়েরা "কুরুং কুরুং" করে' তারের যন্ত্রগুলো নিচ্ছিল বেঁধে', এখুনি তাদের আরম্ভ হবে ঐক্যতান বাদন। ব্যাঞ্জো হাতে সেই সুন্দরীরও ডাক পড়্‌ল সেইখানে। জ্যোৎস্না ফাঁক পেয়ে' হল-ঘর থেকে বেরিয়ে এসে' হাঁপ ছেড়ে' বাঁচ্‌ল। হলঘরে আমোদ-প্রমোদের কোলাহল অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত শোনা যাচ্ছিল।

আহারান্তে একে একে বিদায় নিয়ে সবাই প্রায় চলে' গেছে; মিস্ চক্রবর্ত্তী রঞ্জনের হাত ধরে' বল্‌ল, "মিষ্টার মুখার্জ্জি, আমি এসেছিলুম ট্রামে; রাত হয়েছে অনেক, আমায় একখানা ট্যাক্সি ডেকে' দিন।"

রঞ্জন বল্‌ল, "ভাগ্যিস্ বল্‌লেন, চলুন, আমি আপনাকে রেখে' আসি!"

সোফারকে বলা ছিল না—সে কোথাও আড্ডা দিচ্ছিল বসে'। রঞ্জন মিস্ চক্রবর্ত্তীকে নিয়ে নিজেই মটর হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল।

রাত অনেক হয়েছে; সাড়া পাওয়া যায় না আর কারও কণ্ঠের। হল-ঘর খোলা আছে; বিদ্যুতের আলোয় তার সাম্‌নের বারান্দা । কিন্তু রঞ্জন কোথায়?

অনেকক্ষণ প্রতীক্ষার পর জ্যোৎস্না পা টিপে' টিপে' নীচে এল নেমে'—বন্ধ সার্সির কাচ দিয়ে তার চক্ষে পড়্‌ল, সোফায় বসে' আছে সেই অনিন্দ্যসুন্দরী, যে তাকে আদর করে' কাছে বসিয়েছিল, আর তার কোলে শুয়ে' আছে এক তরুণ। মাথাটা আছে উল্টা দিকে, দেখা যায় না তার মুখ। কিন্তু কাপড়ের পাড়, কামিজের রং—ঐ যে রঞ্জনেরই। জ্যোৎস্নার বুকটা ধড়াস্ করে' উঠ্‌ল। তার মনে হ'ল—বোধ হয়, সহরের নারী-পুরুষের মাঝে এমন আচরণ দোষের নয়। তা' না হ'লে এমন প্রকাশ্য-ভাবে একজন যুবতীর কোলে তার স্বামী এমন নির্ভরসায় শুয়ে' থাক্‌তে পারে! তার চক্ষুকে সে বিশ্বাস ক'র্‌তে পারল না।

সে ঘুরে' আরও কাছে একটা খড়খড়ির ধারে গিয়ে দাঁড়াল। মাথাটা তার ডুবে' ছিল সুন্দরীর কোলের মধ্যে। কিন্তু অস্ফুট যে কথা তার কাণে গেল, তাতে তার মনে হ'ল, পায়ের তলা থেকে যেন পৃথিবী সরে' যাচ্ছে। পুরুষের কণ্ঠ বিকৃত, সঙ্কোচ-জড়িত; মনে হ'ল, এ যেন রঞ্জনের গলা নয়, কিন্তু কথাগুলি যে তারই!

সে বল্‌ছে, "টুনু, তুমি যে তবুও আমায় ভালবাস, এ তোমার মহত্ত্ব।"

গলা খুব জড়িয়ে এল, মাঝে আর কোন কথা শোনা গেল না; টুনু হেসে' বল্‌ল, "আমি কোনদিন মনে করি নি—তুমি আমায় বিয়ে করবে। বাড়ীর জিদ সত্যই উপেক্ষা কর্‌তে পার না—আমিও তাই জান্‌তুম। তবে নিশ্চয়ই জেনো, তোমরা পুরুষ, নারীকে চেনো না—সে যেখানে আপনাকে হারিয়েছে, চিরজীবন তার স্মৃতি আর মুছ্‌বে না। তবে"—

আবার কথা গেল জড়িয়ে—অনেক কষ্টে সে অস্পষ্ট কথাগুলিকে একত্র করে' শব্দের অর্থ একরূপ অনুভব করে' নিল।

তারপর আবার পুরুষের জড়ানো গলায় কথা আরম্ভ হ'ল—একেবারেই দুর্ব্বোধ্য। জ্যোৎস্না অতিশয় আগ্রহের সহিত উৎকর্ণ হয়ে কথাগুলি শোন্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিল; এমন সময়ে ফটকের সাম্‌নে হর্ণ শুনে' স আঁৎকে' উঠ্‌ল এবং ঊর্দ্ধশ্বাসে একেবারে নিজের ঘরে গিয়ে পাগলের মত ছুটাছুটী আরম্ভ করে' দিল—মাথার মধ্যে তখন তার বিপ্লবের ঝড় উঠেছে।

ইহার পর তিনমাস কেটে' গেছে। রঞ্জন জ্যোৎস্নার কাছে যে সুখের ও তৃপ্তির আস্বাদ পেয়েছিল, তা' আর খুঁজে' পায় না। জ্যোৎস্না যন্ত্রের মত ঘুরে' বেড়ায়, যন্ত্রের মত স্বামীর ডাকে সাড়া দেয়, যন্ত্রের মতই

কর্ত্তব্য পালন করে। কণ্ঠের উচ্ছ্বাস রুদ্ধ, ওষ্ঠপুটে হাসির রেখা শুষ্ক। লাবণ্যময়ী প্রতিমা দিন দিন মলিন হয়ে' যাচ্ছে। রঞ্জন কত বার জিজ্ঞাসা করেছে, "তোমার কি হয়েছে, বল? দাদার জন্যে মন কেমন কর্‌ছে? কোন অসুখ হয়েছে?"

জ্যোৎস্না সব কথারই উত্তর দেয়, "না, না, না, আমার কিছুই হয় নি।"

জ্যোৎস্না কিছু সংস্কৃত জানে; তাই একদিন কালিদাসের শকুন্তলা এনে' রঞ্জন কাছে ডেকে' বল্‌ল, "একটু পড়, শুনি।"

জ্যোৎস্না ম্লান মুখে উত্তর দিল, "ভুলে গেছি। তুমি পড়, আমি শুনি।"

জ্যোৎস্না রঞ্জনের মুখের দিকে চেয়ে' থাকে, রঞ্জন পড়ে' যায়; যখন সে আবার মুখ তুলে' চায়, জ্যোৎস্না মাটীর দিকে দৃষ্টি নত করে। ভাবে, কই কোথাও তো এক ফোঁটা কালিমা ঐ মুখশ্রীতে খুঁজে' পাই না— কে তবে সুন্দরীর কোলে শুয়ে' ছিল? জিজ্ঞাসা কর্‌তেও ভরসা হয় না।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে কেবল রঞ্জন বলেছিল, "টুনু ব্যাঞ্জো বাজায় বড় চমৎকার! সুকুমারের বোন খুব ভাল মেয়ে; সে বিয়ে কর্‌বে না, প্রতিজ্ঞা করেছে।"

জ্যোৎস্না বলেছিল, "কেন করবে না, শুনি!"

রঞ্জন তার সদুত্তর দিতে পারে নি—"কি জানি, কেন। অমন সুন্দর মেয়ে—অমন সুন্দর! তুমি তো তারে দেখেছ!"

জ্যোৎস্না আর কথা কইতে পারে না।

সংস্কৃত পড়া বন্ধ হ'ল। জ্যোৎস্না বল্‌ল, "তোমার মত স্বামীর যোগ্য হ'তে হ'লে, টুনুর মত গান, বাজনা, আদব-কায়দা, কিছু ইংরাজি শেখার দরকার; আমায় এই সব শেখাবে?"

রঞ্জন উৎসাহ-সহকারে জ্যোৎস্নার জন্য সকল ব্যবস্থাই করে' দিতে হ'ল রাজী ; কিন্তু শেষে জ্যোৎস্নাই পেছিয়ে গেল এই বলে', "আমার ও সবের আর দরকার কি ! বেশীদিন বোধ হয় বাঁচ্‌ব না !"

কথায়, আচরণে দু'জনের মধ্যে যে সুর পাওয়া যেত আগে, তা' আর খুঁজে' না পেয়ে', রঞ্জন ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়ে। ক্রমেই সে বাড়ী-ছাড়া হয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল ক্ষোভে ও অভিমানে। বাহিরে বাহিরে ঘুরে' সে কেমন লঘু ও তরল হয়ে' পড়্‌ছিল।

জ্যোৎস্নার বুক যেন ভেঙ্গে' গেছে ; অনেক বার মনে মনে করেছে—'কথাটা খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করে' ফেলি। যদি অস্বীকার করে! অপরাধী হয়ে' থাক্‌তে হবে। আমি যে তাকে অবিশ্বাস করি, এই ক্ষত যে শুকাবে না—তার চেয়ে একা জ্বলে' মরাই ভাল। স্বামী যাই হোক—গুরু, দেবতা ; তাকে কোনদিন ব্যথা দেবো না।'

কিন্তু সংশয়ের বৃশ্চিক-জ্বালায় সে একান্ত অধীর হয়ে' একদিন স্থির করে' নিল—'কপালে যাই থাক, একবার জিজ্ঞাসা করব, সেদিন সে টুনুর কোলে মাথা দিয়ে শুয়েছিল কি না—বিয়ের কথা নিয়ে দু'জনের মধ্যে আলাপ হয়েছিল কি না !' কিন্তু অনেক বার চেষ্টা করে'ও এমন ভরসা তার হ'ল না, যে কথাটা সে জিজ্ঞাসা করে। ঐ এক ভয়, যদি রঞ্জন অস্বীকার করে, তারপরও যদি সে এ-কথায় বিশ্বাস না রাখে, তবে তাকে উভয় দিক্ থেকেই জ্বলে' মর্‌তে হবে। কালে শোক দূর হয়, এই মনের ব্যথাও একদিন দূর হবে।

কিন্তু দিন দিন সংশয়ের রেখা বিস্তৃত হয়ে দু'জনকেই যে বহু দূরে নিক্ষেপ করে, এ দূরত্বের ব্যবধান ক্রমেই যে বেড়ে যায় ; নিরুপায় সে, বুক তার হাহাকার করে' ওঠে।

দশটা, এগারটা, বারটা বেজে' গেল ; রঞ্জন এখনও বাড়ী ফেরে নি।

আজকাল কোনদিনই অধিক রাত্রি না হ'লে, সে আর বাড়ী ফেরে না। কিন্তু এত রাতও কোনদিন হয় নি। আজ জ্যোৎস্না মনকে ঠিক করে' নিল এই বলে' যে, নিজের মনের কালি নিজেই ধুয়ে' ফেলে', আবার সে আগেকার মত অনাবিল প্রেমের টানে রঞ্জনের সহিত ভেসে' যাবে; এমন করে' ডাঙ্গার উপর জীবনতরী বেঁধে' রাখ্‌বে না। শুষ্ক মরুভূমির মাঝে নিঃশ্বাস নিতেও বুকে বাজে। স্বামীর উপর তার যে স্বাভাবিক অধিকার, কেন সে তা' থেকে বঞ্চিত হবে তুচ্ছ সংশয়ের আঘাত বুকে নিয়ে!

ঘড়িতে ঢং করে' এক ঘা বেজে' উঠ্‌তেই জ্যোৎস্না উঠে' দাঁড়াল বিছানা ছেড়ে' মেঝের উপর। সাম্‌নেই রঞ্জন—চক্ষের দৃষ্টি তার অস্বাভাবিক; যেন সেও অতৃপ্তির মাঝে হাঁপিয়ে উঠেছে; অস্বাভাবিক সুখের অন্বেষণেই ফির্‌ছে। জ্যোৎস্না ধিক্কার দিল নিজেকে—কোমল করুণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "কোথায় ছিলে এতক্ষণ—এত রাত?"

"কই, কোনদিনও তো জিজ্ঞাসা কর না—সারা দিন, সারা রাত তোমার সঙ্গ ছাড়ি'নি—সারাদিন দূরে থেকে সন্ধ্যায় কাছে এসেছি—সাড়া দাও নি, মুখ ভার করে' থেকেছ—ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিলম্ব করে' ঘরে এসেছি, কিছু তো তোমার এসে' যায় নি তাতে! আজ এসেছি অর্দ্ধরাত্র শেষ করে'; কাল আস্‌ব রাত শেষ করে' ভোরের বেলা চোরের মত—মা না জান্‌তে পারেন, ছেলে তাঁর রাত কাটিয়ে আসে বাইরে। ব্যথা তাঁর প্রাণে যদি বাজে, কুসন্তান হব। সে অভিশাপের জ্বালা কিছুতেই জুড়োবে না।"

জ্যোৎস্না হাত ধরে' বল্‌ল, "অপরাধ করেছি, ক্ষমা কর—মানুষের ব্যাধি হয়, তার তো প্রতিকার আছে; মনে কর, আমি আজ ব্যাধিগ্রস্তা—তুমি কি তার চিকিৎসা কর্‌বে না?"

"অনেক দিন পরে জ্যোৎস্না, তোমার বুকের অকৃত্রিম কথার স্পর্শে আমার বুকের তন্ত্রীগুলো সব যেন এক সুরে বেজে' উঠ্‌ল। কি হয়েছে তোমার, জ্যোৎস্না?"

"ভূতে পেয়েছে! পাপ করেছি অনেক, প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ছি—বল, কাল থেকে তুমি আর আমার কাছ-ছাড়া হবে না? বল, তুমি আর আমায় কাছ-ছাড়া কর্‌বে না?"

জ্যোৎস্নার চোখের জল গড়িয়ে পড়্‌ল, সাম্‌লে' নিয়ে বল্‌ল, "কোথায় থাক তুমি এত রাত্রি পর্য্যন্ত?"

"মিথ্যা তোমায় বল্‌ব না—বসন্তের ফুলবাতাস যদি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, যৌবনোচ্ছ্বাস যার বুকের কাণায় কাণায় উপ্‌ছে' ওঠে, তার যে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে যায়, জ্যোৎস্না! আমার আছে কি—মায়ের কোলে নির্ভাবনায় জীবনের দিন গুনে' যাই—পরিপূর্ণ অবকাশময় চিত্তখানি দিয়েছিলে তোমার প্রেমে ভরিয়ে, হঠাৎ হ'লে অন্তর্দ্ধান! বল দেখি জ্যোৎস্না, এই লঘু শূন্য মন নিয়ে, এই শক্ত পাথরের মত পৃথিবীতে কি সুখে, কি নিয়ে আমি বেঁচে' থাকি? তাই এমনিই উদাস, বাঁধনহীন, লক্ষ্যশূন্য প্রাণের সন্ধান যেখানে পাই, সেইখানেই সহানুভূতির সাড়ায় প্রাণটা নেচে' ওঠে, তৃপ্ত হয়, অলস জীবনভার সেইখানেই নামিয়ে একটু নিঃশ্বাস ছেড়ে' বাঁচি!"

জ্যোৎস্নার বুক মোচড় দিয়ে উঠ্‌ছিল, এই আপন-ভোলা সরল মানুষটীর বাইরের রূপটী যত বড়, যত দৃঢ়, অন্তরটী কিন্তু তরল কর্দ্দমের মত তেমনি কোমল ও নমনীয়। তাকে কাছ-ছাড়া করা যেন তার উপর ভীষণ অত্যাচার। সে আজ নিজের হাতেই তার গায়ের চাদরখানি খুলে' নিয়ে, গলার বোতামে হাত দিয়ে মুখের পানে চেয়ে' হেসে' বল্‌ল, "আমার না হয় দু'দিন মুখের হাসিই শুকিয়েছে নিদাঘের নিষ্ঠুর

উত্তাপে, তুমি কি তাই বলে' আমায় ছেড়ে' ব্যথার উপর ব্যথা দেবে কাল থেকে কোথাও আর বেরুতে পাবে না, তা' আমি বলে' দিচ্ছি।"

"আচ্ছা, কোথাও যাব না। যেতে তুমি না দিলে, যাওয়া তে কোথাও হবে না। যেতে দিয়েছ, ছাড়া পেয়েছি, ঘুরে' বেড়াই— এ কথাও তুমি ভুলে' গেলে চল্‌বে না।"

কথায় কথায় জ্যোৎস্নার যেন কি জানার ইচ্ছা হয়েছিল, তা' রুদ্ধ হয়ে গেছে। সে তাড়াতাড়ি বলে' উঠ্‌ল; কণ্ঠে সংশয়ের বিষ যেন সঞ্চিত ছিল, তারই মিশ্রণে যে কয়টী শব্দ উচ্চারিত হ'ল, তা' হৃদয়গ্রাহ নহে, তিক্ত এবং কর্কশ—"চাপা দিলে সে কথা! চালাকি না কোথায় যাও, সে কথার উত্তর দিলে কই?"

জ্যোৎস্নাও বোঝে নি কথার সঙ্গে তার ভ্রূ-ভঙ্গী বিকট আকৃতি ধরেছে, কটাক্ষে কুটিলতা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। রঞ্জন জ্যোৎস্নার মুখের দিকে চেয়েই, শক্ত দাঁতে চিবিয়ে চিবিয়ে যেন আঘাত দিতেই বলে উঠ্‌ল, "সে একজন আমারই মত কি এক অজানা ব্যথায় ব্যথিত তারই সাহচর্য্যে ক্ষণিকের তৃপ্তি পেতেই দিবারাত্রি বাড়ী-ছাড়া—সে সুকুমারের বোন টুনু; টুনুই হয়েছে আজ আমার আশ্রয়, সান্ত্বনা!"

ঠিক মাথার উপর বজ্র এসে' ভেঙ্গে' পড়্‌ল। 'জবাব আছে— স্বচক্ষে যা' দেখেছি, যে ব্যথা পেয়েছি—তিলে তিলে যে গরল বুকে জমে উঠেছে, উদ্যত দংশনে এই নিষ্ঠুর প্রগল্‌ভ পুরুষ-মূর্ত্তিকে বিষ-জর্জ্জরিত করা যায়—কিন্তু না—দহনের উপর আজ ঘৃতাহুতিই পড়ুক। শত্রু সাম্‌নেই আছে দাঁড়িয়ে, কিন্তু উত্তর আর দেব না। ব্যথার আগুন বুকে চেপে'ই দেখি, আরও কত দূর চলা যায়!'

জ্যোৎস্না হো-হো করে' হেসে' উঠ্‌ল। রঞ্জনও ছিল না প্রকৃতিস্থ তা' না হ'লে সে দেখ্‌ত, তার সাম্‌নে সেই প্রেমবিহ্বলা, একনিষ্ঠা

পতিপরায়ণা, সোহাগিনী জ্যোৎস্নাময়ী রমণী আর নেই—এক অসহায়া, নৈরাশ্যপীড়িতা, উন্মাদিনী নারী-মূর্ত্তিই তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে।

জ্যোৎস্না হো-হো করে' শুষ্ককণ্ঠে খুব হেসে' নিল। তারপর রঞ্জনের গা থেকে জামাটী খুলে', ঢাকা উল্টে' খাবারেব থালা সাম্‌নে নিয়ে, লুচির টুক্‌রা মুখে গুঁজে' দিতে দিতে বল্‌ল, "এত রাত হয়, টুনু তোমায় খাওয়ায় না?"

চার

অনেক চেষ্টা করে'ও প্রিয়রঞ্জন আর জ্যোৎস্নাকে তেমন ক'রে' ফিরে' পেল না। কথায় কথায় জ্যোৎস্না এমন আঘাত দিয়ে বসে, প্রিয়রঞ্জন তা' সহ্য করতে পারে না। সে দূরে দূরেই থাক্‌তে চায়, আবার জ্যোৎস্নাই তাকে নিয়ে আসে নিকটে টেনে'; কিন্তু সেটা আরও বড় আঘাত দিতে। জ্যোৎস্নাও নিরুপায়। ভাঙ্গা মনকে জোড়া দেওয়ার চেষ্টার তার কসুর নাই। কিন্তু রঞ্জনের ভাবে ভঙ্গীতে, কারণে অকারণে এমন সংশয়-সৃষ্টি হয়, যে সে আর স্থির থাক্‌তে পারে না, একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আঘাত দিয়ে বসে। একদিন রঞ্জন বসেছিল ভাতের থালা সাম্‌নে নিয়ে; জ্যোৎস্না আগের মতই স্নেহ-ভরা বুকে তার সাম্‌নে পাখা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, এমন সময়ে কানু এসে' একখানা মোড়া খাম তার হাতে দিয়ে বল্‌ল, "দাদাবাবুর চিঠি,—বেয়ারা দাঁড়িয়ে আছে বাইরে, জবাব নিয়ে যাবে।"

প্রিয়রঞ্জন ভাতে হাত না দিয়েই চিঠিখানা চাইল জ্যোৎস্নার কাছ থেকে। জ্যোৎস্না ভ্রূ-ভঙ্গী করে' বল্‌ল "থাক এখন চিঠি। আগে খাও।"

রঞ্জন বলে' উঠ্‌ল একটু কড়া সুরেই, "শাসনের সময় আছে, জ্যোৎস্না। যদি জরুরী চিঠি হয়, জবাবটা আগে দিই।"

জ্যোৎস্না উত্তর দিল, "তোমায় শাসন করি আমি কোথায়! যা' তা' বলে' আমায় জ্বালিয়ে মার কেন! কি তোমার অধিকার আছে?"

প্রিয়রঞ্জন একটু অপ্রস্তুত হয়েই বল্‌ল, "শাসনের কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে হঠাৎ।"

জ্যোৎস্না রুক্ষ কণ্ঠেই জবাব দিল, "হঠাৎ বেরোয় নি; এ কয়দিন সন্ধ্যার পর বাড়ী ছেড়ে' বেরোতে পার নি, সেইটেই হয়েছে তোমার আসল রাগ। আমায় যদি তোমার বাঁধন বলে'ই মনে হয়—ইচ্ছা কর্‌লেই ছুটী নিতে পার অনায়াসে। মন গুম্‌রে' থাকার চেয়ে, খোলা-খুলি তোমার যা' ভাল লাগে সেই ভাল।"

রঞ্জনের কণ্ঠ কিছু বিকৃত হয়ে' উঠ্‌ল; সে বল্‌ল, "থাক তোমার ফিলজফি—কি হয়েছ তুমি! কথায় কথায় ঝাঁজ দেখাও, মন যেন বিষিয়ে উঠেছে - কেন বল দেখি?"

"অবশ্য কারণ আছে"—এই বলে' চিঠিখানা রঞ্জনের দিকে ছুঁড়ে' দিয়ে জ্যোৎস্না বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

চিঠি খুলে' রঞ্জন দেখ্‌ল, টুনু লিখেছে—তার দাদা সুকুমারের চাকরী হয়েছে পাটনায়, আজ রাত্রে ভোজের নিমন্ত্রণ। অনেকদিন তার দেখা পাওয়া যায় নি; যদি আসার বাধা থাকে, পত্র-বাহককে দিয়ে যেন জানিয়ে দেওয়া হয়।

জ্যোৎস্না বাহিরে গিয়েও স্থির থাকৃতে পার্‌ল না। তার মনে হ'ল—স্বামীর উপর সে অত্যাচারই কর্‌ছে। রঞ্জন চিরদিনই উদাসীন; বসিয়ে যদি তাকে খাওয়ান না যায়, আধ-খাওয়া করে'ই সে উঠে' যাবে। কি পাপ-মন তার! সে ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে' আবার পাখা নিয়ে বস্‌ল রঞ্জনের সাম্‌নে। বল্‌ল, "চিঠি পড়া হয়েছে তো—এখন খাও। রাগি তোমার ভাল'র জন্যে। কিছুদিন ধরে' এমন হয়েছ, যেন সব বিষয়েই উড়ু-উড়ু, খাওয়া-দাওয়া তো একেবারেই গেছে। আর্সী দিয়ে মুখ-খানাও কি দেখ না? চোখের কোল গেছে ঢুকে'—এক হাত কণ্ঠাও বার হয়ে পড়েছে—এ সব আমাকেই জ্বালাতন করা!" রঞ্জন বল্‌ল, "লেখার প্যাড্‌টা আর ঐ অটোমেটিক পেন্‌টা একবার এনে' দাও। জবাবটা দিয়ে দিই। বেয়ারা দাঁড়িয়ে আছে।"

…"থাক্ দাঁড়িয়ে। আমি বল্‌ছি, আগে খেয়ে' নাও।"

"সকল বিষয়েই তোমার জিদ্! এক ছত্র লিখে' দিতে আর কত সময় যাবে?

জ্যোৎস্না টেবিলের উপর থেকে একখানা চিঠির কাগজ আর কলমটা রঞ্জনের হাতে দিয়ে বল্‌ল, "এমন কি জরুরী চিঠি তোমার এল —নাওয়া খাওয়ার সময় থাকে না!"

চিঠিখানা খোলাই পড়েছিল; মেঝের উপর থেকে জ্যোৎস্না তা' কুড়িয়ে নিয়ে শিউরে' উঠ্‌ল, নিঃশব্দে লেখাটুকু পড়ে' নিয়ে, পাথরের মত নিস্তব্ধ হয়ে সেইখানেই সে বসে' পড়্‌ল। মুখ দিয়ে তার কথা বাহির হ'ল না।

প্রিয়রঞ্জন চিঠির উত্তর লিখে' কান্তুকে দিয়ে তা' পাঠিয়ে দিল বেয়ারার কাছে। তারপর আধ-খাওয়ার পর লক্ষ্য পড়্‌ল জ্যোৎস্নার দিকে; সে বসে' আছে অচল স্থির হয়ে। ভাতে মাছি এসে' বস্‌ছে, সে দিকে তার লক্ষ্য নেই—পাখা পড়ে' আছে তার পাশেই; জ্যোৎস্না প্রাণহীন জড়ের ন্যায় নিস্পন্দ!

কয়েক মাস ধরে'ই এই ভাব সে দেখে' আস্‌ছে। জ্যোৎস্নার পরিবর্ত্তন আজ নূতন নয়। সে আর কোন কথা উত্থাপন না করে'ই উঠে' পড়্‌ল আসন ছেড়ে'; জ্যোৎস্না অস্বাভাবিক কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল— "খেলে না যে পেট ভরে'—কে তোমার দাসী-বাঁদী আছে বল তো, সোহাগ করে' বসিয়ে বসিয়ে রোজ খাওয়াবে?"

রঞ্জন এ কথার আর কোন্ উত্তর দিল না—সে নীরবেই ঘড় ছেড়ে', বেরিয়ে গেল।

দিন রাত কেটে' গেছে। রঞ্জন বাড়ী ফেরে' নি। জ্যোৎস্না সেই যে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়েছে রঞ্জন চলে' যাওয়ার পর, সেই ভূমি

ছেড়ে' ওঠে নি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে কিছু গোলযোগ বেধেছে, একথা ঝি-চাকরেরও বুঝ্‌তে বাকী নেই। বেলা হ'ল, জ্যোৎস্না ঘর ছেড়ে' বাহির হয় নি—মায়ের কাণে গিয়েও এ কথা পৌছল।

কাদু এসে' বল্‌ল, "বৌদি, মা-ঠাকুরুণ ডাক্‌ছেন—শীঘ্র উঠে' আসুন।"

জ্যোৎস্না শূন্য গৃহের চতুর্দ্দিকে একবার চেয়ে' ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে খানিক কেঁদে' নিল। তার শূন্য হৃদয় হাহাকার কর্‌ছিল; মনে হচ্ছিল, উর্দ্ধশ্বাসে সে কোথাও পালিয়ে যায়। কিন্তু শ্বশ্রূঠাকুরাণীর অসম্মান করার মত মন তার ছিল না। যদি কোথাও কিছু সান্ত্বনা পাওয়া যায়, এই স্নেহময়ী জননীর বুক থেকেই পাওয়া যাবে—এই ধারণা তাহার ছিল। সে সাশ্রু-নয়নে নতমুখে শ্বাশুড়ীর চরণপ্রান্তে গিয়ে বসে' পড়্‌ল।

তিনি বল্‌লেন, "কি হয়েছে তোমাদের, বল ত? রঞ্জন নাকি কাল বাড়ী আসে নি! সে তো এমন ছিল না, ঝগড়া করেছ বুঝি?"

জ্যোৎস্না ইহার কি উত্তর দেবে! সে নীরব হয়েই রইল।

মা আবার বললেন, "দেখ, রঞ্জনকে আমার বুকের ক্ষীর দিয়ে এতখানি করে' তোমার হাতে তুলে' দিয়েছি—তার ভাল-মন্দের দায়িত্ব এখন আর আমার উপর নির্ভর করে না। তোমার বিশ্বাস-ভক্তি, তোমার সেবা-সান্ত্বনা তার এখন স্বাস্থ্য, আয়ুঃ, সৌন্দর্য্য। এই ধর্ম্ম যদি না রাখ, রঞ্জনের সর্ব্বনাশ হবে। তোমার সে যে কত বড় বিপদ্, ছেলে-মানুষ এখন হয় তো বুঝ্‌তে পার্‌বে না। আমি রঞ্জনের কোন দোষ দেব না। আগে তুমি খুঁজে' দেখ—হয় তো কোথাও সেবা তোমার ক্ষুণ্ণ হয়েছে, কোথাও ভক্তির ত্রুটি করেছ, কোথাও সান্ত্বনা না দিয়ে কটু কথা বলেছ! বিশ্বাস যেখানে স্বামীকে দুর্জ্জয় করে, সংশয়ে

হয় তো তাকে সেখানে অবনত করেছ! স্ত্রীর পাপে স্বামীর অধঃপতন —রঞ্জনের জন্য তোমাকেই আমি দায়ী কর্‌ব, বৌমা।”

এই কথাগুলির নির্ঘাত উত্তর দেওয়ার জন্য জ্যোৎস্নার অধর স্ফূরিত হয়ে উঠ্‌ছিল। তার মনে হচ্ছিল, যেখানে স্বামী অবলার অকপট বিশ্বাসের বুকে ছুরি দেয়, সেখানে বিশ্বাসের প্রস্তর-বেদীও যে ভেসে' যায়। সেবা-ভক্তি দিয়ে স্বামীর মন যখন খুঁজে' পাওয়া যায় না, তখন অন্তঃকরণ যে মরুভূমি হয়ে যায়; কিন্তু পূজনীয়া শ্বাশুড়ী-ঠাকুরাণীকে কেমন করে' সে উত্তর দিবে? কাজেই সে চুপ করে' রইল।

মা কানুকে ডেকে' বল্‌লেন, “মাথার চুলটা আঁচড়ে' দিয়ে, সকাল সকাল তেল-মাখিয়ে নাইয়ে দে। কাল থেকেই যে খায় নি, মুখ দেখে' বুঝ্‌ছি। রঞ্জন যেখানেই যাক্, সে মায়ের গণ্ডী ছাড়্‌তে পার্‌বে না—কাজ শেষ হ'লেই সে ফিরে' আস্‌বে মায়ের দুয়ারে। তুমি বৌমা, আমার কথা ঠেল না। খেয়ে' দেয়ে' হাসিমুখে থেকো। মনে রেখো—পুরুষের মন নারীর বিষণ্ণতায় যত বিরক্ত হয়, এমন আর কিছুতে নয়। হাজার দুঃখ পাও, হাসি-মুখ ঢাকা দিও না অন্ধকারে। তা' হ'লেই আকাশে যত মেঘই ঘনিয়ে থাক্, সব কেটে' যাবে এক নিমিষে।”

শ্বাশুড়ী-ঠাকুরাণী এই বলে' ঢুকে' গেলেন ঠাকুর-ঘরে। এক প্রহর রাত্রির পর মায়ের ঘরের দিকে রঞ্জনের গলা পাওয়া গেল। রঞ্জন চাপা গলায় কথা বল্‌ছে, স্পষ্ট শোনা যায় না; মার কথাগুলি খুব ধারাল এবং স্পষ্ট। জ্যোৎস্না কাণ পেতে' মায়ের কথাগুলি শুনে' বুঝে' নিল, রঞ্জন চাইছে—মায়ের ঘরেই বিছানা পেতে' শুতে, মায়ের আশ্রয় সে যেন ছাড়্‌তে চায় না; মা ছেলেকে শাসিয়ে তার নিজের শয়ন-গৃহে ফিরে' যেতে হুকুম দিচ্ছেন।

জ্যোৎস্না সারাদিনই চোখের জল ফেলেছে। টেবিলের ওট্টা টুনুর

চিঠিখানা এখনও পড়ে' আছে ; সে অন্ততঃ দশ বার সেখানা পড়েছে। প্রত্যেক অক্ষরটী বিষাক্ত কীটের মত তার বুকে জ্বালা সৃষ্টি করেছে। কেঁদে' কেঁদে' সন্ধ্যা বেলায় বুকের উপর যে জগদ্দল পাথরটা চেপে' বসেছিল, সেটা একেবারে না সরে' গেলেও, যেন মনে হচ্ছিল, হাল্কা হয়ে গেছে। সন্ধ্যার সময়ে উঠে' সে মায়ের কথামত পরিপাটী বেশে স্বামীর প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় ঘরের মধ্যে ছট্‌ফট্ করছিল বন্দিনীর মত। সংশয়, ঘৃণা, সব কিছু চেপে' রেখে' আজ সে স্থির করেছিল, রঞ্জনের পায়ে লুটিয়ে পড়্‌বে ; কেন না, অবলা নারীর স্বামী-ভিন্ন কি আর গতি আছে ! কিন্তু মায়ের কাছে রঞ্জনের যে অনুযোগ শোনা গেল, তাতে স্পষ্টই মনে হ'ল—রঞ্জন চাইছে, তার সংসর্গ থেকে দূরে থাক্‌তে। অভিমানে তার বুকের এক একখানা হাড় যেন খসে' পড়ার উপক্রম করল। রুদ্ধ নিঃশ্বাস তাকে বিদীর্ণ করে' দিতে চায়, ব্যথার বৃশ্চিক-দংশনে সর্ব্ব-শরীর জ্বলে' উঠে। এ প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়াই শ্রেয়ঃ।

নারী যে আত্মহত্যা করে কত দুঃখে, নারী ভিন্ন আর কেউ তো বুঝে না ! তার স্বামী তার মুখ যদি না চায়, নিরাশ্রয়া নারীকে তবুও স্বামীর মুখ চেয়ে' থাক্‌তে হবে ! টুনুও নারী, নিশ্চয়ই সে একদিন আশা করেছিল—রঞ্জন তাকে বুকে তুলে' নেবে, সেই আশার সুরই সে এখনও ধরে' আছে, নারীর স্বভাবেই ইহা সম্ভব হয়। পুরুষ মনে করে —তার মনের টুক্‌রো টুক্‌রো দিয়ে অনেক নারীকে বেঁধে' রাখ্‌বে ; নারী শিখে নাই এমন জুয়াচুরী—তার মন যদি ভাঙ্গে, শুধু ভাঙ্গা মন নিয়ে বেঁচে' থাকাই তার দায় নয়, সে যে তার কি সর্ব্বনাশ, নারী ভিন্ন অপরে তা' বুঝ্‌বে না। এই দিক্ দিয়ে টুনু তো অপরাধিনী নয়।

পুং এই উগ্র বাহাদুরী নারীর আর সহ্য করা উচিত নয় ! কিন্তু কি করবে সে ! অসহায়া অবলা লতার মত কোমল নমনীয় ; গর্ব্বে যদি

তাকে উন্নত হ'তে হয়, তবে যে তাকে আশ্রয় কর্‌তেই হবে একটা কঠিন ঋজুমূর্ত্তি পুরুষকে। সে পুরুষ একটী মাত্র লতার আশ্রয় যদি না'ই হয়, নারীর সে বিচারের অধিকার নাই—তার চাই আশ্রয়!

মা বলেছেন—স্ত্রীর ভক্তি, বিশ্বাস, হাসি-মুখ পুরুষের আয়ুঃ, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য। গুরুজন তিনি; মন যাহাই বলুক না—তাঁর কথা সত্য বলে' মেনে' নিতে হবে। ভাব্‌তে ভাব্‌তে জ্যোৎস্নার অমল মুখশ্রী রক্তের রেখায় বিচিত্র হয়ে উঠ্‌ল। ললাটের শিরা স্ফীত, অধরোষ্ঠ স্থির, নীলাভ, স্নায়ু-নিচয় ঘন ঘন কম্পিত হ'তে লাগ্‌ল। রঞ্জন গৃহমধ্যে প্রবেশ কর্‌ল, সে যে মায়ের তাড়নায়—জ্যোৎস্না তা' জেনেই ঠিক অভিনয়েব ভাবে উচ্ছ্বাসে তার হাত ধরে' কাছে নিয়ে বল্‌ল, "আমি শুনেছি তোমার সব কথা—আমি সাপের মত ভয়ের কারণ হয়েছি তোমার; অপরাধিনী আমায় ক্ষমা কর।"

রঞ্জন অপরাধীর মত জ্যোৎস্নার মুখের দিকে চেয়ে' শুষ্ক কণ্ঠে বল্‌ল, "বড্ড ভয় কর্‌ছিল, জ্যোৎস্না। হঠাৎ চলে' গেলুম, তোমার উপর রাগ্ করে'। ইচ্ছা করে'ই অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত কাটিয়ে দিলুম বাজে কথায়। তারপর কত ব্যথা নিয়ে রাত কাটালুম সুকুমারের বাড়ীতে, তা' তোমায় বল্‌তে পারি না—সারাদিন বুকের মধ্যে কত যে যন্ত্রণা তুমি সে বুঝবে না, জ্যোৎস্না। এ ব্যথা তোমার রূঢ় কথায় যদি হ'ত, তোমার কাছ থেকে দূরে থাকাই তো তার প্রতিকার—কিন্তু না, সারাদিন তোমারই বিষণ্ণ মূর্ত্তি আমার হৃদয় আঁধার করে' রেখেছে। সে অন্ধকার ক্রমেই দুর্ভেদ্য হয়ে উঠ্‌ছে, বুঝি আলো আর ফুট্‌বে না! তাই ভয়ে ভয়ে বাড়ী ফেরা। এই অন্ধকারের ভয়েই মায়ের কাছে আশ্রয় চাওয়া। অতিশয় ভয়ে তোমার কাছে এসেছি। আমি নিরুপায়, জ্যোৎস্না। তুমি আপনি হেসে' কথা কয়েছ, কাছে এসে' দাঁড়িয়েছ; তাই কিছু

নির্ভয় হয়েছি—তা' না হ'লে আবার বুক-ভরা অন্ধকার নিয়ে আমায় ফিরে' যেতে হ'ত।"

জ্যোৎস্নার মনে হ'ল, 'মায়ের কথাই সত্য। পুরুষগুলো সত্যই নারীর হাতের যন্ত্র। নারী যদি হাসে, পুরুষের বুকের অন্ধকার ঘুচে' যায়; নারীর সোহাগে পুরুষ হয় আপনহারা। কিন্তু—তবুও একটা 'কিন্তু' বুকের মাঝে সংশয়ের লক্ষণ জাগায়। এ কি চায় আমারই মুখের হাসি, আর আমারই বেদনার আঘাতে হৃদয়-বীণা কি এর নীরব হয়ে যায়! তা' যদি হয়, নারীর এর চেয়ে মহিমা এ পৃথিবীতে আর কি আছে! নারীর সকল সার্থকতা পুরুষের এই একনিষ্ঠ প্রেমেই তো সম্ভব।'

ব্যথার আঘাতে জ্ঞানের ঝরণা বুঝি ঝরে; তাই জ্যোৎস্নার চিন্তাধারায় ফুটে' উঠ্‌ল—নারীত্বের বিচিত্র সমস্যা। যে নারী পতি-হারা, যে-নারী আশ্রয়হীনা, পুরুষের সকল সংসর্গে বঞ্চিতা, তার মুখের হাসি কার প্রাণে মাধুরী লালিমা ঢেলে' দেবে? তার অভিমানের অশ্রু কার প্রাণে তুল্‌বে বিপ্লবের ঝড়—নারীর লাস্য সেখানে কি কেবলই ব্যর্থতাময় নয়! নারী তবে অসহায়া, তার সকল জীবনের ছন্দোভঙ্গী একান্ত তার জন্যেই নয়; তার সবখানি গড়ে' উঠেছে, পুরুষের পূজার অর্ঘ্যরূপে, সে আত্মনিবেদনের পবিত্র নির্ম্মাল্য—পুরুষের চরণে ঢেলে' দিয়েই তার তৃপ্তি।

কিন্তু টুনুর কে আছে! সেও যদি আত্মদানের অর্ঘ্য নিয়ে', এই চরণেই ডালি দিতে চায় আপনাকে—নারী সে, সে ব্যথা যে নারীকেই বুঝ্‌তে হবে, অনুভব কর্‌তে হবে, সয়ে' নিতে হবে! না-না-না—বিদ্রোহের প্রবল ঝড়ে স্নিগ্ধ ভাব-নির্ঝর উল্টে'-পাল্টে' গেল এক মুহূর্ত্তে। নীরেট নিষ্ঠুর-মূর্ত্তি জ্যোৎস্নার মুখ দিয়ে' কর্কশবাণী বাহির হয়-হ'ল—"যাও তুমি আমার কাছ থেকে—যার আর কিছু আছে, তার

আমি কিছু নই, কেহ নই—আমি একলা—এই পৃথিবীতে আমি ভয়ঙ্করী হয়ে' থাকব।" কিন্তু সে নিজেকে এক নিমিষে সাম্‌লে' নিয়ে হেসে' বল্‌ল, "পুরুষেরা দেখ্‌তেই একটা কড়া লোহার মত নীরেট শক্ত—এত কোমল, এত নমনীয় তোমরা! আচ্ছা, সত্যি বল্‌ছ—সারাদিনে যত কেঁদেছি, যত ব্যথা পেয়েছি, এই সব ভেবে'ই কি তুমি ব্যথিত হয়ে' উঠেছিলে? আমার কথা কি তোমার মনে ছিল?"

"সত্যি বল্‌ছি, জ্যোৎস্না—তোমার একটা কটু কথা কতক্ষণ মনকে ব্যথিয়ে রাখ্‌তে পারে? তোমার ব্যথার মূর্ত্তিই তো আমার সবখানিকে মোচড় দেয় রাত্রিদিন। বল না, জ্যোৎস্না—কেন তুমি এমন হ'লে?"

আশ্চর্য্য—জ্যোৎস্নার হৃদয়-তন্ত্রীর মীড়ে মীড়ে তা' ধ্বনি তুল্‌ল—আশ্চর্য্য! টেবিলের দিকে একবার বক্র দৃষ্টিপাত করে' মনে হ'ল, নাকের ডগায় সেটা ধরে' বলে—'রাত্রিদিন কার সোহাগে কাটিয়ে এলে? কি প্রবঞ্চনা, কি শঠতা! শাস্ত্র বলে—পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতির বৈচিত্র্য; কিন্তু মিথ্যা কথা! নারীর নৈকট্যে পুরুষের অনেক বিকৃতি দেখা দেয়। দৃষ্টি সে সীমাবদ্ধ, তা' না হ'লে—উঃ, সারারাত্রি এমনই মিষ্টি-মিষ্টি কথায় টুনুরও মন ভুলিয়ে এসেছে এই পুরুষ!' জ্যোৎস্নার গা জ্বলে' যেতে লাগ্‌ল রঞ্জনের কথায়; কিন্তু তার বুকে কে যেন এসে' দাঁড়িয়েছে—বিপরীত কথা বলার শক্তি নিয়ে'। সে বল্‌ল, "কাল সারা রাত, আজ সারা দিন খাওয়া হয় নি; ভাল করে' ঘুমোও নি নিশ্চয় কাল রাতে। টুনু একা পেয়ে' গান শুনিয়েছে, হেসেছে, বাধ্য হয়ে, কষ্ট করে'ই সব সয়ে' নিয়েছ—কাদুকে ডাকি, ঠাকুরকে বলুক, গরম গরম কয়েকখানা লুচি ভেজে' দিতে। আজ কিন্তু মাথার দিব্যি দিয়ে বল্‌ছি, আর রাঙা মুখ দেখ্‌লে ভুল্‌ব না। টুনু মুনু যেই হোক, চিঠি পেলেই যে দৌড়বে, সেটী আর হচ্ছে না!"

"না, কিছুতেই না। সুকুমার পাটনায় চলে' যাচ্ছে, প্রফেসারী পেয়েছে। টুনুও গেল। তাদের গাড়ীতে চড়িয়ে দিয়ে এলুম। সত্যি বল্‌ছি—সেই পুরীর সমুদ্রতটে যেমন করে' তোমায় পেয়েছিলাম, তেমন করে' যদি ভরিয়ে রাখ, জ্যোৎস্না, তোমায় আর চোখের আড় করব না।"

জ্যোৎস্নার সকল দুঃখের অবসান বুঝি হ'ল এই কথায়। কুটিল চক্ষু স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে'ই নত প্রসন্ন হয়ে উঠ্‌ল। না, না, মিথ্যা সংশয়—এ যে তাহারই!

কয়েক মাস বেশ নির্ব্বিবাদেই কেটে' গেল জ্যোৎস্নার। প্রিয়রঞ্জন তাকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য উঠে' পড়ে' লেগেছিল। জ্যোৎস্নার প্রতিভা ছিল, সে মাস ছয়েকের মধ্যেই খান-তিনেক ইংরাজী বই শেষ করে' ফেল্‌ল। উভয়েরই উৎসাহের সীমা নেই।

রঞ্জন বলে, "আর বছরখানেক পরেই তোমায় ম্যাট্রিক দিয়ে দেব।"

জ্যোৎস্নাও বলে, "ধ্যুৎ, তাও নাকি হয়? দশ বছরের পড়া দেড় বছরে হবে, কোন দেশী কথা তোমার?"

প্রিয়রঞ্জন পণ্ডিতের মতই ভারী গলায় উত্তর দেয়, "যে একটা ভাষা ভাল করে' শেখে, তার কোন ভাষাই আয়ত্ত কর্‌তে বেশী দেরী লাগে না। তা' ছাড়া তোমার এমন পরিষ্কার মাথা—বছর কাট্‌বে না; তুমি নিজেই দেখ্‌বে, কোন ম্যাট্রিক ক্লাসের ছাত্রীর চেয়ে তোমার কম বিদ্যে হয় নি।"

জ্যোৎস্নার হৃদয়খানি ভরে' ওঠে কৃতজ্ঞতায়; গৌরবে মুখখানি লাল হয়ে' যায়। প্রিয়রঞ্জনের মনে রূপের তুফান খেলে; দু'জনের দিন আবার কেটে' যায় সুখে, আনন্দে, এক নিমেষের মত।

হঠাৎ মায়ের হ'ল এক কঠিন ব্যারাম। রঞ্জন একটু ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়্‌ল মাকে নিয়ে'; লেখাপড়ার পথে এই বাধা জ্যোৎস্না আমলে আন্‌ল না। তার ঝোঁক হয়েছিল, ম্যাট্রিক তাকে দিতেই হবে। একটু ইংরাজী না জান্‌লে এযুগে মাথা তুলে' দাঁড়ান যায় না—স্বামীর সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে' চলাও সম্ভব নয়। যেটুকু সুযোগ তার হাতে ছিল, পড়াশুনায় সবখানি নিয়োগ করে' সে অতি দ্রুত ছুটে' চলেছিল পাশ করার সঙ্কল্প নিয়ে। মা'ও উৎসাহ দেখিয়ে বল্‌লেন, "বুড়ো হয়েছি, অসুখ হবেই। তোমরা ব্যস্ত হয়ো না। এই আমার মরণের ডাক। আমি যতক্ষণ বেঁচে' আছি, রঞ্জন আছে পাহাড়ের আড়ালে। মরে' গেলে ওর আর ফুরসৎ থাক্‌বে না। এই বেলা কাজ সেরে' নাও, লেখাপড়া শিখ্‌লে রঞ্জনের কাজেও সাহায্য কর্‌তে পারবে প্রাণ দিয়ে।"

জ্যোৎস্নার ধ্যান, জ্ঞান—অধ্যয়ন। রঞ্জন একদিকে মায়ের জন্য যেমন ব্যস্ত, কবিরাজ ডেকে' নিয়ে আসা, ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি রাখা, মায়ের কাছে গিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া; আর অন্য দিকে তেমনই সময়ে অসময়ে জ্যোৎস্নাকে পড়া বলে' দেওয়া—এই দুই কাজে তার আর সময় নেই অন্য কিছু ভাব্‌বার। প্রিয়রঞ্জন সময়ের সদ্ব্যবহার এমন ভাবে কোন দিন করে নি। মায়ের ব্যারামে তার দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না বটে; কিন্তু পৃথিবীতে মায়ের মত বস্তু, তাঁর সেবায় যেমন করে' সে বুঝ্‌তে পেরেছে, তাতে যেন সে ধন্যই হয়েছে। আর পত্নীর প্রতি ইহাপেক্ষা বড় কর্ত্তব্য কি থাক্‌তে পারে, তা' সে ভেবেও' ঠিক কর্‌তে পারে না। এ ক্ষেত্রে সে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। সাফল্যের অনুভূতি জীবনে নূতন আশা, নূতন আলো দেয়। প্রিয়রঞ্জনের সেই শুভ মুহূর্ত্তই যেন জীবনে আজ ফুটে' উঠেছে।

কয়েক মাস পরে প্রিয়রঞ্জনের সেবায় ও যত্নে মা উঠ্‌লেন কিছু সুস্থ হয়ে। কিন্তু কবিরাজ বল্‌লেন—পূর্ব্বের মত তাঁর আর বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে মাথা ঘামালে চল্‌বে না। বয়েস বাড়্‌ছে, অসুখ তো কিছু নয়—ভগবানের ডাক। রঞ্জন যখন যোগ্য হয়ে' উঠেছে, তখন বিষয়-রক্ষার ভার তাকেই বুঝে' নিতে হবে।

মায়ের ইচ্ছাও ছিল তাই। কর্ত্তার পরলোক-গমনের পর থেকে তিনি বিষয়-রক্ষার ভার সর্ব্বতোভাবে বহন করে' এসেছেন। ব্যাধির আক্রমণে তিনিও ভেবে' দেখ্‌লেন, সময় থাক্‌তে থাক্‌তে রঞ্জনকে সব বুঝিয়ে না দিয়ে গেলে ভবিষ্যতে সে পদে-পদেই ঠক্‌বে।

মা অসুস্থ হয়ে না পড়্‌লে, এ কাজে প্রিয়রঞ্জন মাথা দিতে চাইত না। এখন মায়ের পাণ্ডুর শীর্ণ মুখখানি দেখে' তার কেবলই মনে হয়—মা থাকুন বসে' শান্তি ও আনন্দে, তাঁকে আর কোন কাজে হাত দিতে দিবে না। সে মায়ের সাম্‌নে বসে' সরকার গোমস্তার সাহায্যে নিয়মিত ভাবে কাগজপত্র হাঁট্‌কাতে সুরু করে' দিল।

জ্যোৎস্না বাঙালা থেকে দশ পাতা ইংরাজী অনুবাদ করে' বারান্দায় এসে' দাঁড়ায়; কখনও বা মায়ের ঘরের দোরে উঁকি মেরে' দেখে। রঞ্জনের হুঁস নেই, খাতাটা একবার দেখে' দিয়ে গেলে সে নিশ্চিন্ত হয়। ঠিক হ'ল কি না, না জান্‌তে পার্‌লে, অঙ্ক কয্‌তেও প্রবৃত্তি যায় না। হঠাৎ যদি দোরের ফাঁক দিয়ে রঞ্জনের দৃষ্টি পড়্‌ল জ্যোৎস্নার দিকে, সে উঠে' এসে' বল্‌ল একান্ত উদাসীন-ভাবেই, "খাতাখানা আমায় দাও, দেখে' রাখ্‌ব। তুমি থিয়োরেম কটা কষে' ফেলগে।"

কথাটা জ্যোৎস্নার তেমন ভাল লাগে না। কাছে বসে' ভুলগুলো ধরে' ধরে' দশের মধ্যে ছয় নম্বর দিলেও, সে হাত চেপে' অভিমান করে' বল্‌বে, "কটা ভুল হয়েছে যে চার নম্বর কাট্‌ছ?" প্রিয়রঞ্জন দু'-চার বার

জিদ্ করে' ছয়ের গায়ে 'হাফ' বসিয়ে নিস্তার পাবে ; তবেই তো পড়া
উৎসাহ থাকে ! জ্যোৎস্না মুখ ভার করে' ঘরে গিয়ে বসে। থিয়োরেম
গুলো আর কষা হয় না।

প্রিয়রঞ্জন যখন সেগুলো চেয়ে' বসে, তখন ঠোঁট ফুলিয়ে সে বলে
"এমন করে' আবার পড়া হয় নাকি ? যেন মাষ্টার মশায় হয়েছে ! কাছে
বসে' পড়াও তো পড়ি। না হয়, ও ছাই লেখাপড়ায় আমার দরকার নেই

রঞ্জন বলে, "আমি সাধ করে' কি তোমার কাছে থাকি না ? মাকে
আর খাটতে দেওয়া উচিত নয়। তুমি কি বল !"

জ্যোৎস্না অপ্রস্তুত হয়ে' বলে, "পড়ার ঝোঁকে তোমায় কি না বলি
আর পড়ায় কাজ নেই—আমাকেও তো সংসার গুছিয়ে নিতে হবে
মায়ের মাথায় শুধু তো বিষয়-সম্পত্তি-রক্ষার ভার চেপে' নেই—সংসারের
দুর্ভাবনাও আছে।"

রঞ্জন তাড়াতাড়ি বলে' ওঠে, "না, না, সংসারের দুর্ভাবনায় তোমার
মাথা দিতে হবে না। অনেকটা এগিয়েছ—আমার ফুরসৎ না হয়,
একটা ভাল মাষ্টার রেখে' দি।"

"তা' হ'লেই হয়েছে ! তুমি কি মনে কর, পড়ার ঝোঁকে আমার
মাথা খারাপ হয়েছে ? একজন পুরুষ-মানুষ এসে' আমায় পড়াবে,
আমার মুখপানে চেয়ে' থাকবে, চোখ তুলে' তার পানে চেয়ে' পড়া
জিজ্ঞাসা করব—ওমা কি ঘেন্না ! সত্যি বলছি, পথ চলি মাটীর দিকে
চোখ রেখে'—চোখ তুলে' চাই, তোমার সাড়া যদি পাই, অন্য পুরুষের
পানে চাইলে আমার গা যেন কেমন করে' উঠে—তুমি বল কি না
মাষ্টারের কাছে পড়তে !"

"তুমি একেবারে পাড়াগেঁয়ে"—কথাটা বলে'ই রঞ্জন সামলে' নিল;
কেননা, এই কয় বৎসরে সে জ্যোৎস্নাকে বুঝে' নিয়েছিল, যে যা ...

অভিমানিনী দু'টী নাই—যে কথা তার অপ্রিয় তা' কাণে পৌছান মাত্র তার মুখ রাগে রাঙ্গা হয়ে' উঠ্‌ত।

জ্যোৎস্না এই এক ছত্র কথা শুনে'ই রঞ্জনের দিকে কঠোর কটাক্ষ-পাতে ক্রটি করে নি; রঞ্জন যতই কথা উল্টে' নিক এই বলে', যে এখনকার মেয়েরা শুধু আর বেথুন কলেজে পড়ে না, পুরুষ অধ্যাপকের সাম্‌নে বেমালুম বসে—শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা মেয়েদের মধ্যে খুবই জেগে' উঠেছে, আমার সময় নেই বলে' মাষ্টারের কথা বলেছি—তোমার আপত্তি থাকে, একটী ভাল টিউট্রেসের সন্ধান কর্‌ব।"

"ছাই পড়্‌বে," এই বলে' জ্যোৎস্না ঘরে গিয়ে প্রবেশ কর্‌ল।

সন্ধ্যা হয়-হয়—মা ডেকে' পাঠালেন জ্যোৎস্নাকে। ঘরে গিয়ে জ্যোৎস্না দেখ্‌ল, মায়ের কাছে বসে' আছে এক আগন্তুক। জ্যোৎস্নাকে দেখে'ই মা বল্‌লেন, "তুই আসিস্‌ নে অনেকদিন, বৌমাকে এই নূতন দেখ্‌লি, নয়?"

জ্যোৎস্না ঘোমটা টেনে' জড়-সড় হয়ে ঘরের এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। পুরুষটী উঠে' জ্যোৎস্নার পায়ের কাছে মাথা নামিয়ে বল্‌ল, "নমস্কার, বৌদিদি। আমায় লজ্জা করা চল্‌বে না—রামের পাশে আজ লক্ষ্মণ এসে' হাজির!"

মা বল্‌লেন, "এ আমার বোন-পো, নাম তিনকড়ি। রঞ্জনের সঙ্গে অনেক দিন এ বাড়ীতেই মানুষ হয়েছে। বি-এ পাশ করে' চাকরী কর্‌তে গেছল হাজারীবাগে; বি, টি, পড়্‌তে কলকাতায় এসেছে। তিনুকে পর মনে করো না—ও তোমার দেবর হয়।"

তিনুও হেসে' বল্‌ল, "হাঁ বৌদি, আমি একটু দুরন্ত গোছের আছি। …া উপদ্রব তো কর্‌বই; তারপর কি হয়, ভগবান জানেন।"

জ্যোৎস্না শ্বাশুড়ীর পানে চাইতেই তিনি বল্‌লেন, "তোমার কাজ থাকে, যাও। তিনু তোমায় দেখে নি, তাই ডাকলুম তাড়াতাড়ি।" তারপর তিনুকে লক্ষ্য করে' বল্‌লেন, "আর শুনেছিস্‌, তিনু—রঞ্জন এই বছরেই বৌমাকে ম্যাট্রিক দেওয়াবে।"

"তাই নাকি? দাদার চেয়ে ইংরেজী জ্ঞান আমার অনেক বেশী, বৌদি; আর যদি এডিশেনেল সংস্কৃত থাকে, তাতেও তোমায় সাহায্য করতে পারি প্রচুর।"

মা হেসে' বল্‌লেন, "বৌমা যা' সংস্কৃত জানে, তাতে তোকে শেখাতে পারে জানিস্‌? বৌমা টোলে দু'-একটা পাস্‌ দিয়ে এসেছে।"

"টুলো পণ্ডিতের বিদ্যে তো? ইউনিভার্সিটিতে ও-বিদ্যে চল্‌ছে না।"

মায়ের সঙ্গে তিনকড়ির কথা হ'তে লাগ্‌ল—জ্যোৎস্নার সর্ব্বাঙ্গ ঘেমে' উঠেছিল, সে ছুটে' নিজের ঘরে এসে' পাখা খুলে' দিল।

তার পরদিনই তিনকড়িকে সঙ্গে নিয়ে প্রিয়রঞ্জন ঘরে এসে' হাজির। জ্যোৎস্না লজ্জায় সরে' গিয়ে দাঁড়াল এক পাশে। রঞ্জনের মুখ দিয়ে পাড়াগেঁয়ে কথাটা আবার বেরিয়ে পড়্‌ত, যদি তিনকড়ি না আগে কথা কইত। সে বলে' উঠ্‌ল, "দোহাই বৌদিদি, আমিই হাঁফিয়ে উঠ্‌ছি, তুমি ঘোমটা খোল। এ বাড়ীতে এসে' তোমার মুখে কথা যদি না শুনি, দু'দিনও টিকতে পারব না!"

প্রিয়রঞ্জনের কাজ ক্রমেই বেড়ে' উঠ্‌ছে। জ্যোৎস্নার পড়া-শুনায় ঝোঁক সে আর সামাল দিতে পারে না। কাজে-কাজেই তিনকড়িকে দিয়ে তাকে পড়াবার ব্যবস্থার কথা সে প্রতিদিনই উত্থাপন করে। জ্যোৎস্নার ঘোরতর আপত্তি; সে বলে, "যদি পড়া নাও হয়, সেও ভাল; আমি কারও কাছে পড়্‌তে বস্‌ব না।"

তিনকড়ি কিন্তু ছাড়্‌বার পাত্র নয়; সে সময়ে অসময়ে জ্যোৎস্নার ঘরে ঢুকে', অঙ্কের খাতা উল্টে' পাল্টে' দেখে—ইংরাজী অনুবাদ দেখে' বলে, "দাদা ইডিয়মেটিক ইংরাজীর ধার দিয়েও যায় না। যদি ফার্ষ্ট ডিভিশনে পাস্ কর্‌তে চাও, বৌদি—আমার কাছে এক ঘণ্টা করে' পড়।"

জ্যোৎস্না ঘোমটা দিয়ে নীরবেই বসে' থাকে।

পড়ার আব্দার যত বাড়ে, রঞ্জন তিনকড়ির নাম ততই করে। জ্যোৎস্না রেগে' কথা কয় না। কিন্তু পাস্ করার সময়ও যত আসন্ন হয়ে আসে, মুখে পড়ার আপত্তি যতই থাক্, অন্তরের জিদ ক্রমেই বেড়ে' উঠে। সে একদিন রঞ্জনকে ধরে' বস্‌ল, যে বাকী এই ক'টা মাস তাকে পড়াতেই হবে, অন্ততঃ পক্ষে তিন চারটী ঘণ্টা; তা' না হ'লে একটা অনর্থ বাধ্‌বে।

"তিনকড়ির কাছে পড়ার আপত্তি নেই; কেন না, সে আপনার জন, নিজের ভায়ের চেয়েও আপন। কয় বৎসর সে বাড়ী-ছাড়া—তাকে পরের মত দেখাই তার মনে দুঃখ দেওয়া"—রঞ্জনী এই কথাই বলে।

"দেবর ভাসুরের সঙ্গে কেমন ব্যবহার কর্‌তে হয়, হিন্দুর ঘরে সে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে—কিন্তু আমি তোমার স্ত্রী হয়ে এই সংসারে যে গৌরব ও সম্মানবোধ জন্মেছে, তাতে তুমি ছাড়া আর কারও কাছে মাথা নীচু করে' সে ভুল ত্রুটি দেখাবে, আমি মেনে নেব, তা' পারব না। তোমার কাছে আমার হাজার গলদ প্রকাশ পায়, লজ্জা নেই। অন্য যে কেউ হোক, তার কাছে আমার একবিন্দু মূর্খতা-প্রকাশ হ'লে মাথা কাটা যায়—তা' কি বোঝ না? আপনার লোক, তার মত ব্যবহার আমি করব। কিন্তু আমায় শিক্ষা দেবে তুমি ছাড়া আর কেউ—এ অধীনতা কারও কাছে স্বীকার করে' নেব না।" এই উত্তরের সঙ্গে জ্যোৎস্নার মুখে একটা গরিমার দীপ্তি খেলে যায়।

প্রিয়রঞ্জন আশ্চর্য্য হয়ে দেখ্‌ল—এ নারীর আত্মসম্মান-বোধ এক অসাধারণ চরিত্রের উপর ভিত্তি নিয়েছে। এ গর্ব্ব, এ অভিমান তার একার নয়, তার স্বামীকেই অতি বড় করে' দেখার পরিণাম। মুগ্ধচিত্তে সে পত্নীর দিকে চেয়ে' সস্নেহে বল্‌ল, আজ থেকে তিন চার ঘণ্টা নয় জ্যোৎস্না, যতখানি সময় দিলে তুমি ভাল করে' পাস্ কর্‌তে পার, আমি তার ক্রটি কর্‌ব না।"

তিনকড়ি বৌদিদির সঙ্গে কোনমতেই আসর জমাতে পার্‌ল না। আগে প্রিয়রঞ্জন খেতে বস্‌ত জ্যোৎস্নাকে সাম্‌নে রেখে'; তিনকড়ি আসার পর, দুই ভায়ে খেতে বসে এক সঙ্গে। জ্যোৎস্নাকে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হয় দূরে। তিনকড়ি যত আব্দার ধরে—'এটা দাও, সেটা দাও' বলে', রাগে জ্যোৎস্নার সর্ব্বশরীর জলে' যায়। সে দাঁড়িয়ে দেখে, স্বামীর পাতে মাছি উড়ে' বস্‌ছে, পাখা কর্‌তে পারে না—পাতে ভাত পড়ে' থাকে, উঠে' যায়, হাত ধরে' তাকে বসিয়ে খাওয়াতে পারে না—তার এই অধিকারে বাদ সাধ্‌তে কে এল আপনার জন হয়ে?

তিনকড়ি যত আত্মীয়তা দেখায়, জ্যোৎস্না ততই বিরক্ত হয়। তিনকড়িরও জিদ ততই বাড়ে। সে যে কোন অছিলায় জ্যোৎস্নার সঙ্গে একটা না একটা প্রয়োজন রাখ্‌বেই, কথা কইবেই; ক্রমেই বিরক্তির ভিতর দিয়েই তিনকড়ি অতি কৌশলে পরিচয় করে' নিল জ্যোৎস্নার সঙ্গে। অবাধ কথোপকথনে আর বাধে না। দুই ভাইয়ে যখন ভাত খেতে বসে, জ্যোৎস্না পাখা করে জোরে, দু'জনেরই পাতে মাছি না বসে; আর রঞ্জনকে পেট ভরে' খাওয়াবার তাগিদে তিনকড়িকেও বল্‌তে হয়, 'এটা খাও, সেটা খাও।' তিনকড়ির ইচ্ছে, বৌদির সঙ্গে সম্পর্কটা আরও একটু ঘনিষ্ঠ করে' তুলে, পড়াবার সুযোগ

পেলে, তা' অনায়াস সিদ্ধ হয়। কিন্তু সে বুঝে নিয়েছিল, বৌদি বড় লাজুক, এ লজ্জা ভাঙ্গ্‌তে তার কিছু দেরী আছে।

ডিসেম্বর মাস প্রায় শেষ হয়—বড়দিনের ধুম লেগেছে কলিকাতার রাজপথে, ময়দানে-মার্কেটে। তিনকড়ি পাঁচরঙা কাগজ নিয়ে সার্কাসের কৃতিত্বের কথা জানায় আর বলে, "বৌদি, চল না, একদিন সার্কাস দেখে' আসি। দাদার সময় নেই; আমি আছি তোমার ভৃত্য—আমায় লজ্জা কি তোমার, বৌদি?"

জ্যোৎস্না হেসে' বলে, "সার্কেস দেখার সময় কই, ভাই; মাথা আমার ঘুর্‌ছে পড়ার তাগিদে। আর কটা মাসই বা সাম্‌নে আছে!"

তিনকড়ি উত্তর দেয়, "তাও তো পড় না, বৌদি আমার কাছে! পরের মতই দেখ, তা' না হ'লে এই তিন মাসেই দেখিয়ে দিতে পারি, কেমন করে' পাস্ কর্‌তে হয়।" কথার সঙ্গে তিনকড়ির করুণ চাহনী যেন অর্থপূর্ণ; জ্যোৎস্না তাকে আরও এইজন্য দূরে রাখ্‌তে চায়।

হঠাৎ বাজ পড়্‌লে মানুষ এমন করে' চম্‌কে' উঠে না—জ্যোৎস্না হতভম্ব হয়ে বসে' পড়্‌ল বিছানার উপর। এতদিন পরে টুনুর এক জরুরী 'তার' নিয়ে রঞ্জন এসে' উপস্থিত তার সাম্‌নে। টুনু লিখেছে, "সুকুমারের ভারী ব্যারাম; অসহায় আমি শীঘ্র এস।"

জ্যোৎস্না এক মুহূর্ত্তে প্রকৃতিস্থ হয়ে বলে' উঠ্‌ল, "আমি নিশ্চয়ই বল্‌ছি, তোমায় যেতে দেব না। কিছুতেই না—কে তুমি তার, এত দাবী করে?"

"সে কি কথা? কেউ না হোক, এক অপরিচিত বিপন্ন জনও যদি হ'ত—এ যে মানুষের কাজ, জ্যোৎস্না! আমায় মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতে বল?"

"ওগো, বিশ্বাস কর—আমি তোমায় ছোট হ'তে দেব না। তুমি

বড় হও, সে যে আমার গৌরব। কিন্তু এই টেলিগ্রামের কথা বিশ্বাস করো না—এ আর কিছু নয়, চাতুরী, ছলনা!"

"তুমি জান না, জ্যোৎস্না—টুনুর প্রকৃতি এমন নয়। সে নারী-জগতে একটী দুর্লভ রত্ন। অতি বিপদ্ না হ'লে আমায় সে লিখ্ত না। আমি আজই যাই—গিয়েই 'তার' করব। ভাল দেখি, কালই চ'লে' আস্ব।"

"তুমি যাবে?"

"হাঁ, যেতে হবে। এখানে কারও কথা শুন্ব না। সুকুমার আমার বন্ধু। টুনু আমার আপন বোনের চেয়েও বড়। যদি তা'ও না হ'ত, আর কেউ যদি আমায় ডাক্ত, আমি এমনি করে'ই ছুট্‌তুম।"

"আচ্ছা, যাও। কিন্তু মনে রেখো, জ্যোৎস্নাকে আর ফিরে' পাবে না। টুনুই তোমার সর্ব্বস্ব!"

জ্যোৎস্না ছুটে' ঘর থেকে বাহির হয়ে গেল।

তার এই আচরণ রঞ্জনের কাছে একেবারেই দুর্বোধ্য। ইহার পর কি যে কর্‌বার আছে, তার ভাব্‌বারও সময় ছিল না। সে একটা ভৃত্য নিয়ে, মাকে প্রণাম করে' বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়্‌ল পাটনার অভিমুখে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্না কাঁদ্‌ছিল। যেন আজ তার প্রাণ-পাখী সত্যই উড়ে' গেল। কাণে মরণ-শিঙা বেজে' উঠল—ভোঁ, ভোঁ, ভোঁ!

রঞ্জনের মোটর ছুট্‌ল যেন বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে। সে কত ক্ষণ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেখানে, কে জানে! রাত্রি কিন্তু অনেকখানি হয়েছে। বাড়ী নিস্তব্ধ। নিশুত রাত্রি। হঠাৎ তিনকড়ি এসে' বল্‌ল, "বৌদি, ঘুমোও নি?"

মাথার অবগুণ্ঠন অর্দ্ধেকখানি খসে' পড়েছিল। বিস্ফারিত নেত্র তার মুখের দিকে নিক্ষেপ করে' জ্যোৎস্না কপট অনুনয়ের সুরে বলে' উঠল, "ঠাকুর-পো, তুমি আমায় পড়াবে?"

পাঁচ

সারা রাত্রি অনিদ্রায় কেটে' গেল। ঘুম চোখের পাতায় নেমে' আস্‌তেই তিনকড়ি স্বপ্ন দেখে' চম্‌কে' ওঠে, যেন জ্যোৎস্না তার কাছে দাঁড়িয়ে বল্‌ছে, "বেলা হ'ল, ওঠ, পড়াবে না?" কিন্তু নিছক স্বপ্নই, সে আবার পাশ ফিরে' চোখ বোজে।

আকাশের কোলে অন্ধকার থাক্‌তেই সে আজ শয্যা ছেড়ে' উঠে' পড়্‌ল লাফিয়ে। যেন জীবনের আজ বড় জয় সম্মুখে এসে' উপস্থিত। তখনও সাতটা বাজে নি, তাড়াতাড়ি চা খেয়ে' প্রিয়রঞ্জনের ঘরের দুয়ারে এসে' সে দেখ্‌ল, ভিতর থেকে দুয়ার বন্ধ। ফিরে' গেল আবার নিজের ঘরে। বার কয়েক পায়চারি করে' আবার এসে' দাঁড়াল, জ্যোৎস্না তার জন্য পড়ার টেবিলে বসে' হয়তো অপেক্ষা করছে মনে করে'। কিন্তু বৃথা আশা—তিন চার বার আনাগোনা করে'ও বন্ধ দুয়ার খুল্‌ল না!

কাদু ঝির চোখে তিনকড়ির এই টানা-পোড়েন যাওয়া-আসা লক্ষ্য পড়েছিল, সে একবার বলে'ই ফেল্‌ল, "দাদাবাবু যে তাঁত বোনাবুনি কর্‌ছেন!"

তিনকড়ি হেসে'ই জবাব দিল, "কি বুঝ্‌বি কাদু, বৌদি ম্যাট্রিক দেবে, দাদা পড়ান'র ভার ঘাড়ে চাপিয়ে গেছে!"

তিনকড়ির আর ধৈর্য্য রইল না। রুদ্ধ দুয়ারে আঘাত দিয়ে ডাক দিল, "বৌদি বৌদি!"

সাড়া নেই।

তখন আটটা বেজে' গেছে। এত বেলা পর্য্যন্ত কোন দিন তো

জ্যোৎস্না বিছানায় পড়ে' থাকে না, নিশ্চয় কোন অসুখ করেছে। সে একটু ব্যাকুল হয়েই দরজায় ঘা দিতে দিতে বল্‌ল, "বৌদি, এখনও কি ঘুমোচ্ছ! পড়ার কথা মনে নেই বুঝি, পড়্‌বে না?"

ভিতর থেকে গম্ভীর-স্বরে উত্তর এল, "না।"

"সে কি? আমি কোন ভোর থেকে ঘুরে' মর্‌ছি; কাল যে পড়ার তাগিদ দিয়ে রেখেছ, বৌদি!"

হঠাৎ দরজা খুলে' জ্যোৎস্না এসে' সাম্‌নে দাঁড়াল, এমন বিষণ্ণমূর্ত্তি তার সে আর কোন দিন দেখে নি! সে এসে' নত নয়নেই বল্‌ল "মাপ কর, ঠাকুর-পো; কষ্ট দিয়েছি অনেক, আমি আর পড়ব না।"

এই বলে' সে মন্থর গমনে বাথ-রুমের দিকে চলে' গেল। তিনকড়ির স্পষ্টই মনে হ'ল, তার নত দৃষ্টি ভারী ভিজা, যেন অশ্রুধারায় অভিষিক্ত। ঘুমন্ত চক্ষের এ মূর্ত্তি নয়; কাল রাত্রেও সে যে বিদ্যুদ্দৃষ্টি সন্দর্শন করেছে, তার চিহ্নমাত্র আজ আর খুঁজে' পাওয়া যায় না। কাল তবে সে কি দেখেছিল—সে আকুতি, জ্যোৎস্নার সে নতি স্বপ্নের মতই মিথ্যা! তিনকড়ি বিষণ্ণ মনে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুক্‌ল।

মধ্যাহ্নে কাহু এসে' জ্যোৎস্নার ঘরে আসন বিছিয়ে দিচ্ছিল। জ্যোৎস্না জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "কি হচ্ছে ও আবার?"

কাহু বিরক্ত হয়েই বল্‌ল, "ঐ তোমার দেয়র! ঠাকুর জিজ্ঞাসা কর্‌ল—বাবু নেই, আপনার ঘরে কি ভাত দিয়ে আস্‌ব? একেবারে রেগে' কাঁই—ধমক্‌ দিয়ে বল্‌ল, বাবু নেই ত কি হয়েছে—রোজ যেখানে খাই, আজও সেখানে খাব!"

জ্যোৎস্না গম্ভীর ভাবে ধীরে ধীরে বল্‌ল, "আসন তুলে' নিয়ে যা! ঠাকুর-পোকে গিয়ে বল্—আমার শরীর ভাল না, আমি বিশ্রাম কর্‌ছি।"

কাহু জয়-গর্ব্বে আসন নিয়ে বাহির হয়ে গেল।

সন্ধ্যার পর সারা দিন ধরে' বুকের মধ্যে তিলে তিলে যে অন্ধকার জমে' উঠেছিল, আকাশের কোলে আলোর রেখা মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে তার মনের সে আঁধার ঘনিয়ে এল এমন দুর্ভেদ্য হ'য়ে, যে তার চক্ষের দৃষ্টি যেন আর চলে না। মাথা যেন ঘুরে' পড়ে, পায়ের তলা থেকে পৃথিবী সরে' যায়—সে যেন এখনই দম আটকে' ঘরের মেঝের উপর পড়ে' যাবে। বিছানায় সারা দিন সে কাতরেছে—অসহ্য যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। অন্ধকারময় ঘরে পায়চারি করে' সে এমনই ক্লান্ত হ'য়ে' পড়েছে, যে দাঁড়িয়ে থাক্‌বারও সাধ্য নাই; আরাম-কেদারায় শুয়ে' একটু বিশ্রাম কর্‌বে বলে' হেলান দিয়ে' বস্‌ল—কিন্তু সোয়াস্তি কিছুতে নেই! শেষে সুইচ খুলে' টেবিলের কাছে চেয়ার টেনে' একখানা ইংরেজী বই নিয়ে সে পড়ার চেষ্টা কর্‌ছিল; হঠাৎ তিনকড়ি এসে' বল্‌ল, "বৌদি, সারাদিন ভেবে' সারা হচ্ছ—এই নাও দাদার খবর এসেছে।"

জ্যোৎস্না অতি আগ্রহে হাত বাড়িয়ে টেলিগ্রামটা নিয়ে এক মুহূর্ত্তে আবার ফিরে' দিল তিনকড়ির হাতে। সে মন্তব্য কর্‌ল, "খুব চট্‌ করে' পড়্‌লে তো, বৌদি!"

জ্যোৎস্না কথার সাড়া দিল না।

টেলিগ্রামে লেখা আছে—রঞ্জনের নিরাপদে পৌঁছিবার কথা, এক সপ্তাহ দেরী হবে ফির্‌তে, চিঠিতে বিশেষ বিবরণ পাওয়া যাবে।

'এক সপ্তাহ—কেন? সাংঘাতিক ব্যারাম যদি, তবে এক সপ্তাহ ধরে' তার কাজ সেখানে কি আছে? যদি ভালই থাকে, তবে সে আজই চলে' আস্‌বে না কেন? এই কথাই তো রঞ্জন যাওয়ার সময়ে তাকে বলে' গেল। ব্যথায়, অভিমানে যা' তা' মুখ দিয়ে বা'র হ'লেও, তার কথাগুলি স্পষ্টই কাণে গিয়ে পৌঁছেছিল—সে কথা কি সে বলে নি? "ভাল যদি দেখি, কালই ফির্‌ব"—ভাল নিশ্চয়ই আছে, তা' না

হ'লে, এক সপ্তাহ সেখানে কিসের কাজ! ছল, টুনু ছল ক'রে'ই তাকে টেনে নিয়ে গেল—আমি স্ত্রী, আমার এমন শক্তি নেই, তাকে ধরে' রাখি! ধিক্ আমাকে!' এমন চিন্তার সঙ্গে রাগে-দুঃখে জ্যোৎস্নার চোখ মুখ দিয়ে যেন আগুন বেরুতে লাগ্‌ল।

তিনকড়ি কথার উত্তর না পেয়ে', সামনের চেয়ারে জমকে' বসে' টেবিলের উপর থেকে বইখানা তুলে' নিয়ে বল্‌ল, "এই তো পড়া সুরু করেছ, বৌদি, এখন তোমার নিশ্চয়ই সময় আছে—এঁ্যা!"

জ্যোৎস্না মাটীর দিকেই দৃষ্টি নত করে' বল্‌ল, "না—ঠাকুর-পো! "তুমি এখন যাও, বড় মাথা ধরেছে—শোব।"

তিনকড়ি অতিশয় নিরাশ হয়ে ঘর ছেড়ে' বেরিয়ে গেল।

এক দিন, দু'দিন, তিন দিন কেটে' গেছে। তিনকড়ি প্রতিদিন ঘরের বারান্দায় এসে' দাঁড়ায়, ক্ষুধিতের মত জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে থাকে, মনে হয়—পড়ার ঝোঁক সামাল দেবে সে কেমন করে', আট্‌কালে তাকে ডাক্‌তেই হ'বে, তা' না হ'লে উপায় নেই তার। আশ্চর্য্য, জ্যোৎস্নাকে মাঝে মাঝে বই খুলে' বস্‌তে সে দেখে বটে; কিন্তু তার সাড়া পেলেই, সে টেবিল ছেড়ে' উঠে' যায়—পূবদিকের জানালায় গিয়ে পেছন ফিরে' দাঁড়িয়ে থাকে। তিনকড়ির মনে হয়—রূপ আছে বটে, কিন্তু মেয়েটা একেবারেই পাড়া-গেঁয়ে।

জ্যোৎস্নার মুখের হাসি শুকিয়ে গেছে, মাথার চুল অবেণীবদ্ধ, পিঠে-বুকে লুটিয়ে জোট পাকিয়ে যাচ্ছে—সেদিকে খেয়াল নাই, যেন সে ভূতাবিষ্টা! শাশুড়ীর ভয়ে খেতে হয়, নাইতে হয়, তা' না হ'লে হয় তো সে উপবাসী থাক্‌ত। রঞ্জন গেছে তার বন্ধুর ভারী ব্যারাম শুনে' পাটনায়, মায়ের পেটের বোনের মত টুনুর অনুরোধে বন্ধুকে দেখ্‌তে—

দু'দিন পরে সে ফিরে' আস্‌বে, আবার হেসে' কথা কইবে, সাম্‌নে বসে' আদর করে' পড়া বলে' দেবে। তার ভালবাসার খুঁৎ কিছুতে খুঁজে' পাওয়া যায় না—তবু কিসের ব্যথা, কেন হৃদয় শূন্য মনে হয়! সংশয় মহাপাপ। কিন্তু চিঠি তো এল না আজও! মন তার চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল, হয় তো বা রোগীর কাছে বসে' বসে' সেও অসুস্থ হয়ে' পড়েছে! অস্থির হয়ে' সে মায়ের ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। যা' বল্‌তে এসেছিল, লজ্জায় তা' মুখ দিয়ে বেরুল না; কিন্তু মা মুখপানে চেয়ে' হেসে' বল্‌লেন, "একেবারে পাগল মা তুমি—সকাল থেকে কাপড়খানাও ছাড় নি দেখ্‌ছি, আর চুলগুলো যে লুটো-লুটী হচ্ছে! রঞ্জনের আজ চিঠি এসেছে—পেয়েছ তো?"

সলজ্জ স্বরে, আনন্দে কেবল এই শব্দটুকু বেরিয়ে এল তার গলা ছেড়ে'—"কৈ না!"

"ওমা, সে কি কথা? কাদু—কাদু—"

কাদু পাশেই ছিল। সে বল্‌ল, "তবে তিনুবাবু চিঠিখানা চেপে' রেখেছেন। দেওর-ভাজের রঙ্গ—আমি কি বল্‌ব, মা!"

জ্যোৎস্না আর চুপ করে' থাক্‌তে পার্‌ল না, রাগে তার সর্ব্বশরীর থর্‌-থর্‌ করে' কাঁপ্‌ছিল—মায়ের সাম্‌নে ধম্‌কে' কথা বলা শোভন হবে না, তাই দৃঢ় কণ্ঠে চাপা গলায় সে ধীরে ধীরেই বল্‌ল, "চিঠিখানা নিয়ে এস এখুনি।"

জ্যোৎস্নার কাছে খবর এল, তিনুবাবু বাড়ী নেই—টকি দেখ্‌তে গেছে—ফির্‌বে ন-টার মধ্যে। জ্যোৎস্না অতিশয় বিরক্ত হয়ে বল্‌ল, "আমার চিঠি তার কাছে থাকে কিসের জন্যে? আর তুই যে তখন বল্‌লি—দেওর-ভাজের রঙ্গ—কি দেখেছিস্‌ বল্‌ তো রঙ্গ কর্‌তে? মুখ সাম্‌লে কথা কইবি, এমন কথা যদি মুখ দিয়ে আর বেরোয়,

পুরান লোক বলে' রেহাই পাবি না—এ বাড়ী ছাড়্‌তে হ'বে বলে' দিচ্ছি।"

কাদু ঝি'র মুখ শুকিয়ে গেল বৌ-ঠাকুরুণের কথা শুনে'। সে মনে মনে তিনকড়িকেই গালাগাল দিতে দিতে ঘর থেকে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল।

রাত্রি ন-টার পর, তিনকড়ি এসে', জ্যোৎস্নার হাতে পত্র দিয়ে বল্‌ল, "ঘাট্‌ হয়েছে বৌদি, চিঠিখানা দিই-দিই করে' ভুলে' গেছি। কিন্তু কাদু ঝিকে দিয়ে এমন অপমান কর্‌বে, তা' ভাবি নি!"

জ্যোৎস্না তিনকড়ির মুখের দিকে একবার মাত্র কটাক্ষ করে' বল্‌ল, "কাদু ঝিকে দিয়ে অপমান তো কিছু করি নি—চিঠিখানা, যেমন সরকার গমস্তা দিয়ে সব চিঠি আসে, তেমনি পাঠিয়ে দিলেই ভাল হ'ত, এখন দাও।"

তিনকড়ি নিজের দোষেই আঘাতের পর আঘাতে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিল—সে ম্লানমুখে ইজি-চেয়ারে বসে' রঞ্জনের চিঠি বৌদিদির হাতে তুলে' দিল। চিঠিখানা খোলা, রাগে আপাদ-মস্তক জ্বলে' গেল জ্যোৎস্নার। একপ্রকার হুঙ্কারের মতই তার প্রশ্নে তিনকড়ির হৃৎকম্প হ'ল।

"চিঠি খুল্‌ল কে?"

জবাব নেই, নিরুপায়ের মত সে কেবল চেয়ে' আছে জ্যোৎস্নার দিকে।

জ্যোৎস্নার দৃষ্টি আজ নত নয়, মাথার কাপড় সেদিন রাত্রের মতই আধখানা খুলে' পড়েছে পেছন দিকে। কিন্তু এ সে দীনমূর্ত্তি নয়, কণ্ঠের স্বর মাত্রার কারুণ্যে কোমল ও ক্ষীণ নয়। প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার মত উত্তপ্ত সে মূর্ত্তি—ভয়ের সঞ্চার করে। তিনকড়ির মুখে উত্তর নেই

দেখে' জ্যোৎস্না অতিশয় কটুস্বরে বল্‌ল, "তুমি ক্ষমার অযোগ্য ঠাকুর-পো! তুমি আমার স্বামীর চিঠি খুলেছ কোন্ অধিকারে? যাও, আর বসে' থেকো না আমার ঘরে। আমার কোন সংস্রবে তোমায় আর যেন না দেখি, ঠাকুর-পো!"

তিনকড়ি হতভম্ব। সে যেমন বসেছিল, তেমন ভাবেই বসে' রইল সেইখানে—তার যেন নড়্‌বার শক্তি পর্য্যন্ত আর নেই!

এমন অপমান সে হয় নি কারও কাছে। কাজটা যে এতখানি গর্হিত হয়েছে, বোঝ্‌বার-মত হুঁসও তার ছিল না; কেন না, সে কল্পনায় ধরে' নিয়েছিল জ্যোৎস্নাকে সে পেয়েছে একান্ত আপনার জনের মতই। যেন তার এইটুকু অধিকার আছে, চিঠিখানা নিয়ে সে হেসে' হেসে' বৌদিদির কাছে গিয়ে পড়ার সুযোগ পেলে, তার সমালোচনা কর্‌তেও ছাড়্‌বে না—কিন্তু জ্যোৎস্নার স্বরভঙ্গী এবং আচরণ, দুই'ই তাকে যুগপৎ বুঝিয়ে দিল, সে এ বাড়ীর কর্ত্রী, আর তিনকড়ি' অনুগৃহীত, দূরসম্পর্কীয় একজন আত্মীয় ভিন্ন আর কেউ নয়।

তিনকড়িকে নির্ল্লজ্জের মত'বসে' থাক্‌তে দেখে', জ্যোৎস্না নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ছুটে। তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে' যেন আগুন ঝরে' পড়ছিল। তার মনে হচ্ছিল—এই চিঠি—আর কারও নয়, তার স্বামীর—সে চিঠি তার হাতে পৌঁছান উচিত ছিল প্রথমেই—মোড়া খাম খুলে' প্রথম ছত্রটী তার চোখে ফুটে' উঠার যে তৃপ্তি, তা' ক্ষুণ্ণ করে' দিল এই হতভাগ্য কোন্ অধিকারে? মনে হ'ল, চিঠিখানা ছুঁড়ে ফেলে' দেয় সে বাহিরের অন্ধকারে। প্রথম দৃষ্টি চিঠির পাতায় পাতায় দেওয়ার যে অনুভূতি, যে আনন্দ ও পবিত্রতার আস্বাদ, যেন ইহার ভিতর থেকে আর সে পাবে না—বুক ফুলে' উঠ্‌ল, চক্ষু' দিয়ে' উষ্ণ বারিধারায় দুই গাল ভেসে' গেল।

সারা রাত্রি ঘরে আলো জলেছে, সারা রাত্রি চিঠিখানা সে বার বার পড়েছে। 'ছত্রের পর ছত্র—কোথায় এক ফোঁটা কালি প'ড়ে' একটা অক্ষরের অর্দ্ধেকটা ঢাকা দিয়েছে, তখন সে নিশ্চয় হয়েছিল খুবই অসতর্ক—ভেবেছিল, নিশ্চয়ই আমার ব্যথা মর্ম্মদাহের কথা—এই যে মুছে' গেছে দু'টো কথা—বুঝি আমার বুক-ভাসা জলের এক কণা ছিট্‌কে' পড়েছিল তার চোখ দিয়ে!' গর্ব্ব ও আনন্দের পরিপূর্ণ অনুভূতি ক্ষুণ্ণ কর্‌ছিল মাঝে মাঝে তিনকড়িকে মনে পড়ায়—'সে এ চিঠি পড়ে' গেল কোন্ সাহসে—আমার স্বামীর চিঠি—আমার স্বামীর?'

সত্যিই টুনুর ভাই-এর অসুখ; হৃদয় যার আছে, সে যে সব জায়গায় ছেয়ে' যায় এমন করে'ই। এই তো পুরুষের মহত্ত্ব। আহা! ধন্য তারা, যারা তার স্বামীর বন্ধু; ধন্য টুনু, যদি সত্যই সে ভায়ের মত ভালবাসে তার স্বামীকে। কিন্তু সে কি কথা অস্ফুট স্বরে নির্জ্জনে কোলে মাথা তুলে' নিয়ে সে বলেছিল তার স্বামীকে? জ্যোৎস্না চিঠিখানা শক্ত দৃঢ় মুঠার মধ্যে চেপে' ধরে' ছুঁড়ে' ফেলে' দিল ঘরের এককোণে। শক্ত হয়ে' শুয়ে' রইল সে অনেক ক্ষণ—চক্ষু তার অনার্দ্র, যেন জলন্ত অঙ্গারের চেয়েও উত্তপ্ত; কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সে আবার উঠে' গিয়ে চিঠিখানা কুড়িয়ে নিয়ে' এল বুকের উপর, গুটিয়ে-যাওয়া কাগজখানাকে কোমল হাতের সঞ্চালনে চোরস্ত করে' নিল।

সারা রাত কেটে' গেল, চিঠি পড়ে'।

চিঠির সারমর্ম্ম :

'ক্রাইসিস্ কেটে গেছে—দু'দিন দেখে' ফির্‌ছি।'

রঞ্জন তারপর টেনেছে একটা লম্বা ড্যাশ, কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে তা' দুই ইঞ্চি এগিয়ে থেমে' গেছে; যা' জানিয়েছে, বুঝি তার ভাষা নেই!

আজ রঞ্জন ফির্‌বে। দিগ্বিজয়ী বীরের প্রাসাদ-প্রবেশের মত ধুম লেগে' গেছে বাড়ীতে। যে ঘরে যা' কিছু ছিল, সকাল থেকে ভৃত্য দাসী নিয়ে' সব টেনে বা'র করেছে জ্যোৎস্না বারান্দায়—ঘরের মেঝেয় আজ আর এক তিল ময়লা থাক্‌বে না, নারকেল-ছোব্‌ড়া নিয়ে বসে' গেছে সকলে ঘ'ষতে। ঘর-দোর গুছাতে অপরাহ্ন হ'য়ে' গেল।

মা এ সব দেখে' হাসেন আর বলেন, "এ কালের ছেলেগুলো মনে করে, তাদের চোখ দিয়েই বুঝি ঘরের লক্ষ্মী চেনা যায়—অলক্ষ্মীই বেছে' আনে। মায়ের চোখেই ধরা পড়ে ঘরের লক্ষ্মী, মা আমার যেন কমলা —রঞ্জন আর টুঁ-হাঁ করে না!"

জ্যোৎস্না মুখে কাপড় দিয়ে হেসে' পালায়।

এবার আর তিনকড়ি নয়, কানু দিয়ে গেল চিঠি; কেউ খোলে নি। নীল উজ্জ্বল অক্ষরে খামের উপরে স্পষ্ট-স্পষ্ট করে' লেখা— "জ্যোৎস্নাময়ী।"

বুক যেন দুরু-দুরু করে' উঠ্‌ল—আজ যখন আস্‌ছেন, আবার চিঠি কেন! সকৌতূহলে খামের মোড়ক খুল্‌তে' পা দুটো তার থর্‌-থর্‌ করে' কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। খুব আদর সম্ভাষণ জানিয়ে রঞ্জন লিখেছে, "টুনু ছাড়্‌ল না, আর দু'দিন থেকে যেতে হ'ল। বিপদের ভয় আর নেই, দুই বন্ধুকে এক সঙ্গে ভোজ দিয়ে তবে টুনু ছাড়্‌বে, এই তার আকুতি।"

দিন পনর পরে মা নিজেই জ্যোৎস্নার ঘরে এসে' উপস্থিত হলেন। বিছানার উপর সে নিস্তব্ধ হ'য়ে' শুয়েছিল। চক্ষু ছিল ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে স্থির। সে অর্দ্ধমৃত, রুগ্ন, শীর্ণ মুখের দিকে চেয়ে' মা বল্‌লেন, "তুমি পাগল হয়েছ বৌমা, এই নাও রঞ্জনের চিঠি; কি কর্‌বে, ও ছেলেবেলা থেকেই এই রকম, কারু কথা এড়াতে পারে না!"

জ্যোৎস্না তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে’ মেঝের উপর একখানা আসন পেতে দিল।

মা বস্‌তে-বস্‌তেই বল্‌লেন, “দু’দণ্ড বস্‌বার কি আর অবকাশ আছে, আজ ভোরে ব্রহ্মচারী এসে’ হাজির! গুরুমহারাজের ভারী ব্যারাম, দেড়টার ট্রেণেই ছুট্‌তে হ’বে কাশী।”

জ্যোৎস্না অবাক্ হয়ে’ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল। মা চিঠিখানা হাতে দিয়ে বল্‌লেন, “আমাদের কুলগুরু, তবে ইনি কাণে ফুঁ দিয়ে ব্যবসা করে’ বেড়ান না—মন্ত্র কাকেও দিতেই চান না—তোমার শ্বশুর পীড়াপীড়ি করে’ ধরায় কথা এড়াতে পারেন নি। হাঁ, গুরু বটে, তাঁর অন্তিমকালে—”

সম্ভবতঃ এক ফোঁটা জল চোখের কোণে এসে’ পড়েছিল; এক নিমিষে কাপড়ের খোঁটে তা’ মুছে’ নিয়ে, প্রসন্ন গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বল্‌লেন, “তাঁর অন্তিমকালে সাক্ষাৎ নারায়ণের মত এসে’ দাঁড়ালেন, এমন মৃত্যুও কখন দেখি নি। স্বামিহারা হয়েছি, কিন্তু শোক করি নি—তিনি ভগবানেরই কাছে আমার জন্য অপেক্ষা কর্‌ছেন।”

মাথা তাঁর মাটীর দিকে নত হয়ে’ পড়্‌ল।

তিনি আবার বল্‌লেন, “সে সব কথা বল্‌তে আসি নি; যে কর্ত্তব্য তিনি আমায় দিয়ে গেছেন, সমাপ্ত হ’লেই তাঁর কাছে চলে’ যাব। আজ সেই ইষ্টদেব পীড়িত, তাঁর নাকি আসন্নকাল উপস্থিত। অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌লুম না, বৌমা, রঞ্জনের ফিরে আসা পর্য্যন্ত। সে কাল সকালে আটটার মধ্যেই এসে’ পৌঁছবে। আমি বাড়ী থাক্‌ব না। হিসেব করে’ চলো, রঞ্জনকেও বলো—কাগজপত্র সরকার গমস্তাদের বুঝিয়ে দিয়ে গেলুম, সে যেন সব দেখে-শুনে’ নেয়।”

তারপর আসন ছেড়ে' উঠ্‌তে-উঠ্‌তে বল্‌লেন, "একটা কথা মনে রেখো, মা—রঞ্জন যাঁর পুত্র, তাঁর অগৌরব যাতে হয়, সে তা' কর্‌তে পারে না। যদি কোনদিন তুমি আর এমন করে' থাক্‌বে—সে যে কোন কারণেই হোক, তাতে সংসারের অকল্যাণই হবে। আমি চোখে দেখে' তোমায় ঘরে এনেছি, সে সম্মান যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। রঞ্জন যেন বোঝে, মায়ের দৃষ্টি ভুল নয়।"

জ্যোৎস্না মায়ের এই কথায় কি সঙ্কেত আছে, তা' অনুভব করে' নিয়ে, মনে করেছিল নীরবেই থাক্‌বে; কিন্তু হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "আমায় ঘরে এনে' তিনি সুখী হন নি—আশীর্ব্বাদ করুন, আমি মরি—"

জ্যোৎস্নার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে' এল।

মা'ও বাধা দিয়ে বল্‌লেন, "ওসব কথা বল্‌তে নেই। গুরু মহারাজকে বলেছিলুম রঞ্জনকে আশ্রয় দিতে; তিনি বলেছিলেন—এখন তার সময় হয় নি, বিয়ে করুক—ধর্ম্ম আপনি হ'বে। স্কুল-কলেজে পড়ে' গুরুতে তার বিশ্বাস নেই, আমি তাই তাকে এসব দিকে মন দিতে বলি না—কিন্তু যে তাকে গর্ভে ধরেছে, সে যদি তার ভাল-মন্দের ভার, মায়ের কর্ত্তব্য করা হয় না। রঞ্জন চেয়েছিল—ডানা-কাটা পরী বিয়ে কর্‌তে, ঐ-সব টুনু, মুনু, কি সব বিদ্‌কুট নামের মেয়ের সঙ্গে। আমি তার কথা শুনি নি—রাজলক্ষ্মীকে ঘরে এনেছি।"

জ্যোৎস্নার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে' সে বল্‌ল, "জোর করে' আমায় নিয়ে আসায় তিনি অসুখী হয়েছেন, মা।"

"সে কি বৌমা"—দাঁড়িয়ে উঠে' হেসে' মা বল্‌লেন, "ওসব স্বামীকে মাথায় ঠাঁই দিও না। স্বামী গুরু, নারীর দেবতা; তাকে পর করো না কোন কারণে। পুরুষের মন যদি চঞ্চল হয়—নারীর

নিষ্ঠা ও বিশ্বাস তা' দৃঢ় সংযত করবে। নারীর তপস্যাই পুরুষের প্রাণ, পুরুষের শক্তি—একথা ভুলো না।"

মা ঘর ছেড়ে' বেরিয়ে পড়লেন বারান্দায়—তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ জ্যোৎস্না অনুসরণ করে' গেল তাঁর ঘরের দুয়ার পর্য্যন্ত। ঘরের ভিতর আসনে উপবিষ্ট এক দৃঢ়কায় তরুণকে দেখে' সে ফিরে' দাঁড়াল। মা বল্‌লেন, "উনি ব্রহ্মচারী—আমায় নিতে এসেছেন। আমার সঙ্গে কাদু আর বৃদ্ধ বিপিন সরকার যাবে। রঞ্জনকে ব'লো সাবধানে থাক্‌তে, সব দিকে দৃষ্টি রেখো।"

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। রঞ্জনের চিঠিখানা জ্যোৎস্না একবার ভাল করে' পড়ে' নিল। মাকেই লিখেছে সে—খুব অনুনয় করে', দু'দিনের জন্য এসে' কেন একুশ দিন কেটে গেল। রোগের বাড়াবাড়ি, তারপর পথ্য দেখে' যাওয়ার কথা, সুকুমারের চেয়ে টুনুর কাতর অনুরোধ উপেক্ষা করতে সে পারে নি।

জ্যোৎস্না ছুঁড়ে' ফেলে' দিল চিঠিখানি ঘরের বাইরে।

দাঁড়া-আর্সীর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে সে দেখ্‌ল, চক্ষু তার নিষ্প্রভ, ওষ্ঠপুট শুষ্ক, ঈষৎ নীলাভ, মুখকান্তি বিবর্ণ। মাথার চুলগুলি রুক্ষ গ্রন্থিল কাদু চলে' গেছে মায়ের সঙ্গে। সে ঘর থেকেই তীব্র কণ্ঠে ডাক দিল, "সুশীলা।"

সুশীলাও বাড়ীর একজন পুরাতন দাসী। জ্যোৎস্নার গলার ডাক শুনে' সে হাজির হ'ল তার সাম্‌নে।

চিরুণী নিয়ে' চুলের জোট ছাড়াতে তার হাতে খিল ধরে' গেল—জ্যোৎস্না দেখ্‌ল দর্পণে, তার মাথার চূর্ণ-কুন্তল চিবুকে, পৃষ্ঠে, ব[illegible]ড়িয়ে পড়েছে। কেশের পরিপাটী সংস্কারে মুখশ্রীর পরিবর্ত্তন [illegible] তার

নিজের ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটে' উঠ্ল। হাস্তেই হাস্তেই সুশীলাকে নিয়ে' সে বাথ-রুমে গেল।

সারা রাত্রি তার নিদ্রা নেই। আলমারীর মধ্যে যতগুলি বিচিত্র বসন ছিল, সেগুলি বাছাই কর্তে কর্তে অর্দ্ধেক রাত্রি কেটে' গেল। তারপর কখনও ঘরের মধ্যে পায়চারী, কখনও বা ইজি-চেয়ারে চিৎ হয়ে' পড়ে' কত চিন্তা! মনে যে ঝড় বয়ে' গেল সারারাত্রি ধরে', তার অবসাদে সে ভোর বেলা ঘুমিয়ে পড়েছিল অকাতরে। নিদ্রাভঙ্গে চেয়ে দেখ্ল ঘড়ির দিকে, ছ'টা বেজে গেছে অনেক ক্ষণ। তার মনে হ'ল, 'ষোল আনা সাধ মিটিয়ে সে ফিরে' আস্ছে; আর আমি উপেক্ষিতা, সে আবার আমায় ফিরে পাবে, তেমনি করে'? না—তা কিছুতেই হ'তে পারে না।' অর্দ্ধরাত্রি ধরে' বাছাই-করা ফুলে-ফুলে-ছাওয়া রেশমী কাপড়খানি পরে', মাথার চুল আঁচ্ড়ে', সুন্দরী জ্যোৎস্না ঘর ছেড়ে' বারান্দায় এসে' দাঁড়াল। প্রলয়-দোলে তার হৃদয়ের কোলে কোলে আছাড়ি খেয়ে' পড়্ছিল উচ্ছ্বসিত আবেগের ভীম-প্রবাহ।

সাম্নে সুশীলাকে দেখে' হঠাৎ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়্ল একান্ত অতর্কিতে—"সুশীলা, দেখ্ তো, ঠাকুর-পো কোথায়?"

"ডেকে দোব?"

"হাঁ"—এই বলে' মরাল-মন্থর-গমনে জ্যোৎস্না এসে' একখানা কেদারা টেনে' নিয়ে' পড়ার টেবিলের পাশে বসে' পড়্ল।

"বৌদি! আমায় ডেকেছ? দাদা আজ আস্ছে, নয়?

এক মুখ হেসে' জ্যোৎস্না বল্ল, "দেখ তো ঠাকুর-পো—সিনপ্সিস্টা ঠিক করেছি কি না"—একখানা খাতা তার সাম্নে এগিয়ে দিল।

পারুকড়ি খাতা খুল্তে না খুল্তে, খাতাখানা তার হাত থেকে

কেড়ে' নিয়ে জ্যোৎস্না বল্‌ল, "ওঃ, কি স্বার্থপর আমি—এখনও তোমার চা খাওয়া হয় নি নিশ্চয়ই!"

তিনকড়ি বিস্ময়বিহ্বল নেত্রে চেয়ে' রইল জ্যোৎস্নার দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে। সে বিশ্বাস করতে পারছিল না—ঘটনাটা সত্য কি না।

কিন্তু চকিতে জ্যোৎস্না ঘর ছেড়ে' বেরিয়ে গেল—চা নিয়ে সুশীলার সঙ্গে সে ঘরে এসে', টেবিলের উপর ধরে' দিল নিম্‌কি-সিঙ্গাড়াদি খাদ্যদ্রব্যপূর্ণ ডিসের সঙ্গে চায়ের পেয়ালা।

তিনকড়ির চোখ দিয়ে যেন জল গড়িয়ে পড়ে, এমনই তার অবস্থা।

জ্যোৎস্না বল্‌ল, "খাও ঠাকুর-পো, মনটা ক'দিন বড়ই খারাপ হয়েছিল—কি খেলে, না খেলে, দেখ্‌তে পারি নি।"

তিনকড়ি বিশৃঙ্খল মনে উদাসীনের মত জলযোগে বসে' গেল সেইখানে। জ্যোৎস্নার চক্ষু ছিল ঘড়ির দিকে, তখনও আটটা বাজ্‌তে পনর মিনিট বাকী। সে তাড়াতাড়ি ওয়াশিংটন্ আর্ভিং-এর বইখানা খুলে' বল্‌ল—"অনেক চেষ্টা করে'ও এর একটা গল্পেরও সাবস্ট্যান্স ভাল করে' লিখ্‌তে পারি নি। প্যারাফ্রেজ কি ভাবে করেছি, একবার দেখ তো, ঠাকুর-পো!"

তিনকড়ির সে উৎসাহ আর নেই, সে এখনও নিজেকে সাম্‌লে নিতে পারে নি। জাহ্নবীধারায় মত্ত হাতী যেমন উল্টে' পাল্টে' গেছ্‌ল—জ্যোৎস্নার হঠাৎ অনুগ্রহ-বর্ষণে সে এক প্রকার নাস্তা-নাবুদ হয়ে' পড়েছিল। জ্যোৎস্না কথার সঙ্গে ঘন ঘন দৃষ্টি দিচ্ছিল ঘড়ির দিকে। আটটা বাজ্‌তে আর মিনিট পাঁচেক বাকী। তিনকড়ির খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে' এল; সে গ্লাসের জলে হাত মুখ ধুতে ধুতে বল্‌ল, "বৌদি, সত্যি সত্যিই পড়্‌বে?"

হো-হো-হো—কি অস্বাভাবিক হাসি!

তিনকড়ি সেই মূর্ত্তির দিকে বেশী ক্ষণ চেয়ে' থাকৃতেও পার্‌ল না। যেন প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হয়, কি অনর্থ বাধ্‌বে এখুনি। জ্যোৎস্না হেসে' বল্‌ল, "তুমি পড়াবে বল—এক মিনিট ফাঁক দিতে পারবে না—এই যে বস্‌ছ, একেবারে উঠ্‌বে সেই বারটা বাজ্‌লে!"

সে আরও আশ্চর্য্য হয়ে' বলে' উঠ্‌ল, "দাদা যে আস্‌বে এখুনি—"

"আসুক, তুমি বল আমার কথা অমান্য করবে না?"

আদেশ প্রভুর মতই নির্ঘাত ও অমোঘ।

তিনকড়ি বল্‌ল, "না।"

বাইরে মোটরের সাড়া পাওয়া গেল। তিনকড়ি আন্‌মনা হয়, জ্যোৎস্না ধমক দিয়ে বলে, "পড়াচ্ছ কৈ? ক'দিন বা আছে পরীক্ষার?"

ঘরে এসে' ঢুকৃল প্রসন্নমূর্ত্তি প্রিয়রঞ্জন; হেসে' বল্‌ল, "কত যে সুখী হলুম তোমায় দেখে,' কি আর বলৃব! কেমন তিনু—এই কয় দিনে তোমার বৌদিদি খুব প্রগ্রেস্‌ করেছে, কি বল?"

তিনকড়ি জবাব দিতে যাচ্ছিল—জ্যোৎস্না বাধা দিয়া বল্‌ল, "জবাব পরে দিও, এখন পড়াও।"

তিনকড়ি মন্ত্রমুগ্ধ—জ্যোৎস্নার সাম্‌নে দুলে' দুলে' পড়িয়ে যেতে লাগ্‌ল নির্ব্বিকারে।

পড়া চল্‌ল এত বেশী, প্রিয়রঞ্জনের পক্ষে ধৈর্য্য-রক্ষা অসম্ভব হয়ে উঠ্‌ল। সে বল্‌ল, "বাপ্‌, সারা রাত ঘুমোই নি—দোহাই তোমাদের, খাওয়া-দাওয়াটার জোগাড় একটু সকাল-সকাল কর। পড়াটার ক্ষতি যা' হয়, সুদ-শুদ্ধ পুষিয়ে দেব আমি নিজেই।"

জ্যোৎস্না অলক্ষ্যে ঘড়ির দিকে চেয়ে' দেখ্‌ল, এগারটা বেজে' গেছে। তারও অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল, হেসে' বল্‌ল, "ঠাকুর-পো, পাস্‌ করবে পারবে কেমন?"

তিনকড়ি যে কি উত্তর দিবে, তার ঠিক নেই—সে কথার পিঠে কথা বলে' গেল, "হাঁ, নিশ্চয়ই।"

এইবার প্রিয়রঞ্জনের পালা। সে আশা করেছিল, পড়ার ঝোঁকে জ্যোৎস্না তার বুকে এসে' পড়ে নি—এইবার সে দীর্ঘ বিরহের অবসান কর্‌বে মধুর আলাপনে; কিন্তু সে আশ্চর্য্য হয়ে' দেখ্‌লে, বিনা কথায় সেও বেরিয়ে গেল তিনকড়ির সঙ্গে সঙ্গে।

সন্ধ্যার পর সুশীলা এসে' প্রিয়রঞ্জনকে বল্‌ল, "তিনুবাবু বল্‌লেন—বৌঠাকুরুণ যাচ্ছেন তার সঙ্গে টকি দেখ্‌তে।"

"কে যাচ্ছে?"

"বৌঠাকুরুণ।"

প্রিয়রঞ্জন স্তম্ভিত হয়ে' বাতায়ন-পথে নীলাকাশের কোলে যে বিকট দৈত্যের মত ধূসর বর্ণের মেঘটা জমেছিল, সেই দিকে চেয়ে' রইল।

তার পরের দিনের কথা—সারাদিন পড়া আর পড়া, সন্ধ্যা হ'লেই মটর নিয়ে' জ্যোৎস্না বেরিয়ে গেল তিনুর সঙ্গে। কোন কথায় সে কাণ দেয় না—কিছু করার আগে সে রঞ্জনের আদেশ নেওয়ার অপেক্ষাও করে না। জ্যোৎস্না তো এমন ছিল না—এই কয় দিনে তার এ কি পরিবর্ত্তন! সেদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময়ে দুই ভাই খেতে বসেছিল—কিন্তু পূর্ব্বের মত জ্যোৎস্না আর পাখা নিয়ে' কাছে বসে নি। সে পাশের টেবিলে বসে' অঙ্ক কষ্‌ছিল।

তিনকড়ি বল্‌ল, "শুন্‌ছ, দাদা—হাজার হাজার মণ চাউল নাকি জাপান থেকে রপ্তানী হয়েছে ভারতবর্ষে! এই চাউলগুলো আমার জাপানীই মনে হচ্ছে।"

"দূর মূর্খ! পাটনাই চাল, জাপানী হ'বে কেন?"

"কি তার প্রমাণ ?"

"তোমরা এ কী শিখেছ, কথায় কথায় প্রমাণ চেয়ে বস ! কলিকাতার বাজারে জাপানী চাল আস্‌তে এখনও ঢের দেরী আছে।"

জ্যোৎস্না টেবিল থেকেই বিদ্রূপ করে' বলে' উঠ্‌ল, "প্রমাণ যুক্তি চাইলেই মূর্খ বলে' গালি সহজ। চালগুলো, যে জাপানী নয়, তাই বা কে বল্‌ল ?"

প্রিয়রঞ্জনের বিস্ময়ের সীমা রইল না। সে এসে' পর্য্যন্ত জ্যোৎস্নাকে অন্যের সহিত হাস্‌তে দেখে, কথা কইতে দেখে ; বিশেষতঃ, তিনকড়ির সঙ্গে তার কথা ও হাসি যেন ফুরায় না। তার কাছেই তার ম্লান-মূর্ত্তি এ এমনই পীড়ন করে তাকে, যে মনে হয়, এ বাড়ীতে আর তার থাকা সম্ভব নয়। তিনকড়ির এই উদ্ভট কথাটা শুধু সমর্থন করার জন্যই জ্যোৎস্নার কথা নয়—সে কথার সুরে রঞ্জনকে আঘাত দেওয়ার উদ্দেশ্যও যেন নিহিত আছে। মা বাড়ী নেই—রাগারাগি হ'লে যদি কোন কাণ্ড ঘটে, এই ভয়ে সে জ্যোৎস্নার অনেক অভাবনীয় আচার ব্যবহার মুখ বুজে' সয়ে' নিয়েছে—সে এ কথারও কোন উত্তর দিল না। নীরবে খেয়ে' উঠে' গেল।

সেদিন সেই যে অপরাহ্নে রঞ্জন বেরিয়ে গেছে বাহিরে, সন্ধ্যার পর আর বাড়ী ফেরে নি। জ্যোৎস্না সেজে'গুজে' বারান্দার খড়খড়িতে দাঁড়িয়ে' রঞ্জনের আগমন প্রতীক্ষা কর্‌ছিল ; এমন সময়ে তিনকড়ি এসে' বল্‌ল, "বৌদি, আজ এম্পায়ার থিয়েটারে উদয়শঙ্করের নৃত্য—টিকিট কিনে' রেখেছি ; সকাল সকাল চল বেরিয়ে পড়ি।"

কিন্তু জ্যোৎস্না ফটকের দিকে দৃষ্টি রেখে' বল্‌ল, "দাদা তোমার বাড়ী নেই যে !"

"নাই বা থাক্‌ল ! ঠিক সাতটায় আরম্ভ, এখন সাড়ে ছ'-টা, চল বেরিয়ে পড়ি।"

অনেক ক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে' জ্যোৎস্না বল্‌ল, "না।"

তিনকড়ি খুব কাছে ঘেঁষে' দাঁড়াল। অঞ্চলপ্রান্ত ঝুল্‌ছিল পিঠের উপর—সেটা ধরে' সে জ্যোৎস্নার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌ল, "বৌদি, আর অমন করে' 'না' ব'লো না।"

কাপড়ে টান পড়্‌তেই জ্যোৎস্না দেখ্‌ল, তিনকড়ি তার অঞ্চল-প্রান্ত নিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে আঙ্গুলে জড়াচ্ছে। তার মনে হ'ল, এই খেলা প্রশ্রয় পেয়ে যদি বেড়ে' ওঠে, তবে আর তা' ধমক দিয়ে বারণ করা যাবে না। সেই অবস্থায় মানুষের সহিত সহজ সম্বন্ধের মাঝে আস্‌বে নিষ্ঠুর বিপ্লবময় ছেদ—সে বড় নিষ্ঠুর দুর্ঘটনা! রঞ্জনের মনে আঘাত দিতে গিয়ে সে আপনাকেই যেন হত্যা কর্‌তে বসেছে! তার গা শিউরে' উঠল। দাঁড়িয়ে হঠাৎ সে বলে' উঠ্‌ল, "আমার কাপড় নিয়ে তোমার এ কি খেলা? সরে' যাও।"

তিনকড়ির মুখের দিকে চেয়ে' ভয়ে সে আঁৎকে উঠ্‌ল—যেন তার মুখে চোখে কি এক অস্বাভাবিক আকৃতি ফুটে' উঠেছে। সে আরও কাছে এসে' দাঁড়াল—জ্যোৎস্না ঠিক তার কোলের কাছে দাঁড়িয়ে।

"গায়ে এসে' পড়্‌ছ যে, সরে' যাও—মনে রেখো, আমি তোমার বড় ভাজ, মায়ের সমান!"

তিনকড়ির অন্তর অনুরাগের অনুলেপনে রঙে' উঠ্‌ছিল—এক নিমিষে সে কাপড় ছেড়ে' দিয়ে জ্যোৎস্নার লম্বিত স্খলিত করপুট নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে' বলে' উঠ্‌ল, "আমায় ক্ষমা কর বৌদি, আমি তোমায় মায়ের মত দেখ্‌তে পার্‌ব না!"

ভুজঙ্গিনীর ন্যায় গ্রীবা উত্তোলন করে,' জ্যোৎস্না নিজের হাত সবলে ছিনিয়ে নিয়ে, তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে ফুল্‌তে ফুল্‌তে অস্ফুট বিকট স্বরে বলে' উঠল, "এত স্পর্দ্ধা তোমার। নারীকে মায়ের মত সম্মান দিতে পার

না কোন্ সাহসে? আমার হাত ধর কোন্ ভরসায়? জান, এই মুহূর্ত্তে এই বাড়ী থেকে তোমায় বিদায় করে' দিতে পারি!"

তিনকড়ির কণ্ঠে আর অনুনয়ের উক্তি নয়, সে পৌরুষ-পূর্ণ কণ্ঠে স্পষ্ট স্পষ্ট করে' বল্‌ল, "হ্যাঁ পার—আমি পুরুষ, সে ভয় আমার নেই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি মনে করেছ, আমি তোমার খেলার সামগ্রী? নারীর এ স্পর্দ্ধা কি বাতুলতা নয়, যে পুরুষকে ক্রীড়ার সামগ্রী-রূপে দেখে? যে দিন থেকে বুঝেছি, তুমি আমায় ঘৃণা কর, আমি দূরেই সরে' ছিলাম। আদর অনুরাগ দিয়েছ ডেকে'; তোমার নিজের উদ্দেশ্য যদি তার ভিতর কিছু থাকে, সে উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে'ই, তুমি কি পার পাবে মনে কর? আমি জড় মাটীর মূর্ত্তি নই; আমারও প্রাণ আছে, হৃদয় আছে—তাদের দাবী তুমি কি উপেক্ষা করতে পার্‌বে?"

জ্যোৎস্নার তেজস্বিনী মূর্ত্তি এ কথায় নিষ্প্রভ মলিন হয়ে' গেল। কত দূরে এসেছে সে তার পুণ্যভূমি জাহ্নবীতট ছেড়ে', এ কোন্ নরকের প্রান্তদেশে সে এসে' পড়েছে অভিমানে, অহঙ্কারে! একান্ত আপনার জনকে ব্যথা দিতে গিয়ে, সে যে পড়েছে আজ দুর্জ্জয় ব্যথার সমুদ্রে। এখানে যে আর কেউ নাই, তাকে রক্ষা করে। একথা প্রকাশ করারও ভাষা নাই, যে উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে' বলে—এত স্পর্দ্ধা ঐ পর-পোষ্যকে সে দিয়েছে নিজেরই অন্ধতায়, বুঝি আর ইহার প্রতিকার নাই, প্রায়শ্চিত্ত নাই। সে অশ্রুরুদ্ধ নেত্রে, অপমানে যন্ত্র-চালিত প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় নিজের ঘরে গিয়ে ঝনাৎ করে' খিল দিল। তিনকড়ি ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় কয়েকবার সেইখানে পদচারণ করে', মুষ্টিবদ্ধ হস্তে—ফটকে দাঁড় করান ছিল মটরকার, সোফারকে গিয়ে বল্‌ল, "হাঁকাও লেক্-রোড।"

ছয়

ফরসা হয়ে' গেছে। বিছানা ছেড়ে' ওঠার শক্তি যেন আজ আর জোৎস্নার নাই। চিৎ হয়ে' নেটের মশারির ছাঁদার ভেতর দিয়ে, সে রঙ্গীন্ বরগাগুলোর দিকে উদাসীন দৃষ্টিতে চেয়েছিল। মনে হচ্ছিল, বিছানা ছেড়ে' সে আর উঠ্‌বে না জীবনে। কি যেন এমন কিছু ঘটে' গেছে, যা' আর মুছ্‌বে না কোনদিনই; আর সেই ঘটনার কলঙ্কে তার জীবনের সবখানি শুভ্রতা চিরদিনের মতই ঢাকা প'ড়ে' গেছে। প্রতিদিন ঘুমভাঙ্গার পর সে তার ঘুমন্ত স্বামীর মুখখানির দিকে চেয়ে' থাকে; দুই চার মিনিট সেই করুণ চাহনীর স্পর্শে রঞ্জনের আঁখি-পল্লব খুলে' যায়, চন্দ্রসুধায় সরোবরের পঙ্কজ যেমন ফুটে' উঠে পুলকে, সুষমায়; কিন্তু ধীরে ধীরে ঠিক তেমনি করেই' রঞ্জনের আঁখি আবার মুদে' যায় অতৃপ্তির অবসন্নতায়—কেননা, চার চোখের চাওয়া-চাওয়ি হ'লেই, জ্যোৎস্না অকস্মাৎ মুখ ফিরিয়ে এক লম্ফে বিছানা ছেড়ে' উঠে' যায়।

রঞ্জন প'ড়ে' থাকে বিছানায় অনেক ক্ষণ নিস্তব্ধ নির্জীব হয়ে। কাজের পর কাজ—দিবারাত্রি জ্যোৎস্নার আর অবকাশ হয় নাই, যে স্বামীর সঙ্গে দুই দণ্ড হাসে, কথা কয়। অধিকাংশ সময়ই পড়াশুনায় কেটে' যায়। রঞ্জন মনে করে, তিনকড়ির সঙ্গে তার এখন খুবই ঘনিষ্ঠ পরিচয়; যেহেতু সন্ধ্যা হ'তে আর তর্ সয় না, সে বেরিয়ে যায় টকি দেখ্‌তে। খুব মজা!—এই সব চিন্তা জ্যোৎস্না শুয়ে' শুয়ে' ভাব্‌ছিল; পাশে কিন্তু আজ রঞ্জন নাই। তার উৎকন্ঠিত মনোজগৎ তার কাছে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল।

ভাব্‌তে ভাবতে তার নিজের ঠোঁটেই ঔদাস্যের হাসি ফুটে' উঠল—

ভাবনার পর্দ্দা গেল আবার উল্টে'। সে কি টের পায় না—কি ব্যথায় দিন তার কাটে! পুরুষ যেমন চায় নারীর সবখানি হৃদয় নিজের মুঠার মধ্যে ধরে' রাখ্‌তে, নারীরও যে সে অধিকার আছে ষোল-আনা—সে কেন তা' অস্বীকার কর্‌বে! নারী, সেও যে সর্ব্বাগ্রে মানুষ। পুরুষের মত তারও হৃদয়বৃত্তি অজাগ্রত নয়—যেখানে তার পরিপূর্ণ অধিকার, তা' থেকে সে বঞ্চিত হবে কেন? সে হৃদয়ের কোনখানে যদি আর কেউ স্থান করে' নেয়, কোন দিকে হৃদয়-বস্তুটা ঝুঁকে' পড়ে, তার প্রতিকার কর্‌তে হবে সঙ্গে সঙ্গেই, তা' না হ'লে তা' আর কি ফিরে' পাওয়া যায়!

কিন্তু হঠাৎ তার সর্ব্বশরীর শিউরে' উঠ্‌ল! মনে হ'ল কাল সন্ধ্যাকালের নির্লজ্জ তিনকড়ির গর্হিত আচরণের কথা। যেমন কুৎসিৎ, তেমনই বীভৎস! তার হাতখানা এখনও যেন জ্বালা কর্‌ছে—অগ্নিস্পর্শে দগ্ধ হওয়ার মত নিষ্ঠুর যন্ত্রণা! অভিমান-বশে যে পথে সে পা বাড়িয়েছে, সে পথ নিরাপদ্ নয়; কিন্তু বুকে যে ব্যথা ধীরে ধীরে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে, তা' নিরাময় করার ঔদাসীন্য যে ধৈর্য্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়—তা'ছাড়া হৃদয়ের যে ব্যভিচার, তারও তো একটা প্রায়শ্চিত্ত আছে, শোধন আছে! কিন্তু আবার উল্টে' গেল চিন্তার ধারা—তারই ধারণার মূলে যদি মিথ্যা আশ্রয় করে' থাকে! সে কথা ভাব্‌তে গিয়ে চোখের কোণে জল এসে' পড়্‌ল—এ অপরাধের মার্জ্জনা নাই। একান্ত নিরাশ্রয় সে, স্বামীকে ছেড়ে' তার মাটির উপর দাঁড়িয়ে থাকারও যে সাধ্য নাই! আবার মনে হ'ল, এই হাতটা তিনকড়ি একান্ত অতর্কিতে তার নিজের হাতের মধ্যে তুলে' ধরেছিল; কলঙ্কিত, কলুষিত এই হস্ত স্বামীর সেবার অযোগ্য হয়েছে। যদিও ঘটনা স্বামীর অজ্ঞাত, কিন্তু সে আজ অস্পৃশ্য—চিরদিনের জন্য সেবার অধিকার থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে!

উঃ—সমস্ত ভবিষ্যৎ এই কল্পিত ব্যথায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়্‌ল! তার চক্ষু ফেটে' জলধারা গড়িয়ে বিছানা ভাসিয়ে দিল। মৃতের মত সে পড়ে' রইল অনেক ক্ষণ বিছানায় হতভম্ব হয়ে'।

ঘড়িতে এলার্ম দেওয়া ছিল সাতটায়; আধ ঘণ্টা পরেই তিককড়ি আস্‌বে পড়াতে, তাকে প্রস্তুত হয়ে' উঠ্‌তে হবে বই-খাতাপত্র নিয়ে এই আধ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে। থরে থরে এত ক্ষণ ধরে' যে সকল দুর্ব্বলতায় তার হৃদয় আচ্ছন্ন হয়ে' উঠেছিল, জোর করে', শূন্য থেকে যেন সে এক চুম্বক উৎসাহ টেনে,' ধড়মড়িয়ে বিছানা ছেড়ে' উঠে' প'ড়্‌ল তাড়াতাড়ি; প্রাতঃকৃত্যের জন্যে ছুট্‌ল বাথরুমের দিকে।

নিজের মনেই হাস্‌তে হাস্‌তে সে ফির্‌ছিল ঘরের দিকে; মনে হচ্ছিল, বিছানায় পড়ে' পড়ে' যে দুর্ভাবনায় তার হৃদয় নুয়ে' পড়েছিল কিছু আগেই, তা' একটা দুঃস্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। মানুষের শরীরটা এমনই কি গ্যারান্টী দিয়ে' বিক্রয় করা হয়েছে কারও কাছে, যে তার এদিক্ ওদিক্ হ'লে ক্রেতার কাছে গুরুতর অপরাধী হ'তে হয়, জীবন ব্যর্থ হয় ক্ষুণ্ণতায়! দেহের সংযম, কঠোর সতর্কতা কি শুধু নারীকেই পালন কর্‌তে হবে—ভর্ত্তার অনন্তভোগের ক্ষেত্র-স্বরূপ? নারী কি পুরুষের ক্রীতদাসী? তার মনে হ'ল—যে শিক্ষায় সে মানুষ হয়ে' উঠেছে ছোট বেলা থেকে, তারই কুফল-স্বরূপ প্রভাতের দুশ্চিন্তা। কি সঙ্কীর্ণতার শিক্ষাই পিতামাতার কাছে সে পেয়েছিল! সমাজের কুসংস্কার নারীকে কি কৃপণ হ'তেই না শিখিয়েছে! কি হয়েছে এক মুহূর্ত্তের জন্য এই হাতখানা যদি অন্য পুরুষের সংস্পর্শে আসে? সেইদিন কলিকাতার প্রসিদ্ধ মিষ্টার রায়ের পত্নীকে রায়বাহাদুর রমেশ চৌধুরী টকি দেখ্‌তে নিয়ে এসেছিলেন পিক্‌চার-প্যালেসে! সাম্‌নের বক্সেই তাঁরা বসেছিলেন। ছবি দেখে' হেসে' দু'জনের ঢলাঢলি সে স্বচক্ষে দেখেছে।

কখন বা মিসেস্ রায় রায়বাহাদুরের গায়ে ঢলে' পড়েন, আবার রায়-বাহাদুর মিসেস্ রায়কে বুকের মধ্যে টেনে' নিয়ে', মুখের কাছে মুখ রেখে' কত কথাই না বল্ছিলেন! তিনকড়িই তো চিনিয়ে দিল, মিসেস্ রায় ঐ ব্যক্তির পত্নী নয়; বন্ধুপত্নী মিসেস্ রায়কে উনি টকি দেখ্তে এনেছেন। তিনকড়ির সে কথা মিথ্যাও নয়; কেননা, আনন্দবাজারে মিষ্টার রায়ের ছবি সে অনেক বার দেখেছে। তিনি এলেন, তখন আধখানা পালা শেষ হয়ে' গেছে। তখনও মিসেস্ রায় রায়বাহাদুরের হাতখানা ধরে' বসে' আছেন। স্বামীর চোখে সে দৃশ্য হয়তো পড়্ল না; কেননা, রায়বাহাদুর মিষ্টার রায়কে দেখে'ই তাড়াতাড়ি উঠে' তাঁর সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করে' পাশেই বস্লেন। জ্যোৎস্নার চক্ষে ইহা বড় বীভৎস কুৎসিৎ বলে'ই মনে হয়েছিল।

তিনকড়ি বল্ল, ও সব কুৎসিৎ চিন্তা সে-কেলে, এ যুগে অত ছোট মন রাখ্তে নেই; পতি-পত্নীর সম্বন্ধ ছাড়া বন্ধুত্বের সম্বন্ধ একটা আছে—সেখানে ছুঁৎমার্গ রাখা অশোভন অভদ্রতা। ভাসুরের সাম্নে মুখ বা'র কর্লে মরণকালে সে মুখ নাকি পোড়ে না—এই শিক্ষা সে ভুল্তে পারে না, হাড়ে হাড়ে বসে' গেছে। স্বামী ভিন্ন পরপুরুষ স্পর্শ কর্লে, মরণের পর যমদূত জ্বলন্ত লৌহের পুরুষকে আলিঙ্গন করায়, স্বামী ভিন্ন অন্যের মুখের দিকে চাইলেও পাপ হয়, দাঁড়কাক চোখ ঠুক্রে' খায়—তিনকড়ি হো-হো করে' হেসে' বলেছিল, এ সব যদি সত্য হ'ত, পৃথিবী জুড়ে যমের জেলখানাই থাক্ত, মানুষের স্বাধীন জীবনের সন্ধান মিল্ত না! দেহ নিয়ে নারীর এই ছুঁৎমার্গ স্বার্থপর পুরুষেরই একটা নিষ্ঠুর বিধান, একটা নিষ্ঠুর কার্পণ্য। নারীর উপর পুরুষের এইরূপ যুক্তিহীন অধিকার ও কর্তৃত্ব-বাদ দেশ থেকে উঠে গেছে বহুদিন; গেঁয়ো মেয়েদের মধ্য থেকে এ পাপ বিদেয় হ'লে নারী-জাতি পায় মুক্তি, আর সে জয় শুধু নারীর

নয়, পুরুষের উদার্য্যেরও পরিচয়। বাথ-রুম থেকে নিজের ঘরে আস্‌তে আস্‌তে কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে গত সন্ধ্যার দুর্ঘটনা এমনি করে' জ্যোৎস্নার মন থেকে মুছে' দিতে স্বভাবের স্নেহ-প্রলেপ পড়্‌ছিল। হঠাৎ সুশীলা এসে' সাম্‌নে দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে' যেতে যেতে বল্‌ল, "রাণী-মা, এই বুঝি ঘুম থেকে উঠ্‌লে? কাল যে কি সর্ব্বনাশ ঘটেছে!"

জ্যোৎস্নার মনে কুসংস্কার-নাশের সংগ্রাম চল্‌ছিল ভীষণ-ভাবে, অতীত মনটা নূতনের অভিযান স্বীকার করে' নিচ্ছিল না কোনমতে; আর তার হাতটার যেখানে তিনকড়ি ধরেছিল মুঠিয়ে, জ্বলে' খাক হয়ে' যাচ্ছিল তীব্র যন্ত্রণায়। কয়েক পা অন্যমনস্ক ভাবে এগিয়ে এসে'ই, তার মনে সুশীলার কথাগুলো প্রতিধ্বনিত হয়ে' উঠ্‌ল। সে ফিরে দেখ্‌ল, সুশীলা চলে' যাচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে হন্‌-হনিয়ে নীচে।

"সুশীলা, শোন্‌।"

রাণী'মার গলা পেয়ে' সে ফিরে' দাঁড়াল অন্যমুখী হয়ে।

"কি বল্‌ছিলি রে?"

সুশীলা হাঁপাতে হাঁপাতে চোখ দুটো কপালে তুলে', মুখখানা আধ-হাত ফাঁক করে' বলে' উঠ্‌ল, "দাঙ্গা মা, দাঙ্গা—যার তার সঙ্গে নয়, একেবারে শিখ পাঞ্জাবীর সঙ্গে!"

জ্যোৎস্না অবাক্‌ হয়ে কিছু নূতন ব্যাপার শোনার উদ্‌গ্রীবতা নিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "তারপর?"

"তারপর, তোমার এয়োতের জোর মা, এয়োতের জোর! যদি সোঁপাট পড়্‌ত লাঠীটা মাথায়, বাবুকে কি আর ফিরে' পাওয়া যেত! তবুও কি কম চোট লেগেছে মাথায়? সদ্য-সদ্য ডাক্তার-বদ্যি এসে পড়্‌ল তাই"—

জ্যোৎস্নার প্রাণের ভিতর কে যেন ডুক্‌রে' কেঁদে' উঠ্‌ল—তার বুঝ্‌তে বাকী রইল না, কাল রাত্রে স্বামীর উপরই হয়ে গেছে একটা দারুণ দুর্ঘটনা। এক নিমিষে তার মনে হ'ল, বিয়ের পর যমের ঘর থেকে স্বামীকে সে ফিরিয়ে এনেছিল; বিধাতা তার কথা শুনেছিল যে পুণ্যে, আজ সে পুণ্যফল তার হারিয়ে গেছে; মনের জোর, বুকের শক্তি যেন আর কিছুমাত্র নেই। এমন দুর্ঘটনা তার স্বামীর উপর হওয়ার কারণ কাল সন্ধ্যা-বেলারই পাপ—পরপুরুষের স্পর্শ বিধাতা সইবেন কেন?

আকুল বিস্ফারিত নয়নে সে আবার জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "তোদের বাবু কোথায় রে? আমায় তো তোরা কিছু বলিস্‌ নে!"

"বল্‌ব কি, মা—মটর, পুলিশ, লোকজনে বাড়ী ছেয়ে' গেল। রক্ত ঝুঁজিয়ে পড়্‌ছে চৌচির-ফাটা মাথা দিয়ে', তবুও কি তাঁর আগ্রহ, যেন কথা তোমার কাণে না পৌঁছায়! নিশুত রাত্রি, তোমার ঘুম ভাঙ্গাতে তাঁর মানা, আমরা অমান্য করি কেমন করে', মা?"

জ্যোৎস্নার মনে হ'ল—হাতের দশটা আঙ্গুলে ধারাল নখ যদি থাক্‌ত, বুক চিরে' হৃৎপিণ্ডটা টেনে' বার করে' সে নিশ্চিন্ত হয়! সর্ব্বশরীর থর্‌-থর্‌ করে' কাঁপ্‌ছিল। "কোথায় তিনি?"—এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে, সুশীলার সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে' সেও নীচে নেমে' পড়্‌ল তাড়াতাড়ি। স্বভাবতঃই তাকে কে যেন টেনে' নিয়ে চলেছিল ফটকের পাশে, সেই হল-ঘরের দিকে।

দীর্ঘ দালানের ভিতর দিয়ে যেতে যেতেই সুশীলা বলে' চল্‌ল, "ঐ ভবানীপুরের অপয়া বাড়ীটা—ভাড়া দেবার নাম নেই—বাবু গেছলেন তাগাদায় নিজেই, কথায় কথায় বচসা—তারপর এই কাণ্ড। মাগো, সে কি কাণ্ড! রক্ত দেখে' ভিরমি যেতে হয়।"

"চুপ কর্, সুশীলা"—তার মনে হচ্ছিল, এই রকম নিষ্ঠুর কথা তার কাণে যদি আর যায়, সে হুম্‌ড়ি খেয়ে' পড়ে' যাবে।

মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা—রঞ্জন শুয়ে' আছে একখানা সোফায়। মাথার উপর পাখা ঘুর্‌ছে শোঁ-শোঁ করে'। কাছে বসে' আছে এক অপরিচিত ভদ্রলোক। জ্যোৎস্নার লজ্জা-সরম তখন ছিল না; তার চৈতন্য এসে' জমেছিল চক্ষু-দু'টীতে। উদাস আগ্রহ-দৃষ্টি স্বামীর মুখের দিকে পড়্‌তেই রঞ্জন চেয়ে' দেখ্‌ল তার কাতর বিষণ্ণ মুখ; পাশেই সে অপরিচিত বন্ধুর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে'ই অপলকে জ্যোৎস্নার মুখের দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে চেয়ে' রইল।

ভদ্রলোক সসম্ভ্রমে উঠে' দাঁড়ালেন। জ্যোৎস্নাকে তিনি একবার ভাল করে' দেখে নিয়ে রঞ্জনকে বল্‌লেন, "মিষ্টার রঞ্জন, তবে এখন উঠি! মিসেস্ মুখার্জ্জী স্বয়ং উপস্থিত, আমাদের গার্জ্জেন্‌শিপ্ এবার ছেড়ে' দেওয়াই সঙ্গত।"

তারপর জ্যোৎস্নার দিকে বক্র কটাক্ষপাত করে' তিনি বল্‌লেন, "বড় বেঁচে' গেছেন! জায়গাটা একেবারে অ-বাঙালীর হয়ে পড়েছে। এক জন সার্জ্জেণ্টের সাম্‌নে পড়েছিলেন তাই রক্ষে, তা' না হলে সাবাড় করে'ই দিত···গুড্‌বাই"—রঞ্জনের শিথিল হাতখানা ধরে' একটু নাড়া দিয়ে সে ব্যক্তি প্রস্থান কর্‌লেন।

বাড়ীর দাস-দাসী সবাই ভীড় করে' দাঁড়িয়েছিল—হল-ঘরের মধ্যে। ইশারা করে' জ্যোৎস্না তাদের বিদায় করে' দিল।

জ্যোৎস্না উদ্যত অশ্রু, আরক্ত নয়ন মেলে সরল প্রাণে রঞ্জনের প্রতি চেয়ে' রইল অপলকে। অচঞ্চল প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় সে দাঁড়িয়ে—আর কাতর-মূর্ত্তি রঞ্জন সোফার উপর শুয়ে'ই জ্যোৎস্নার সুতীব্র দৃষ্টিবর্ষণে অভিষিক্ত হ'তে লাগল। দু'জনেই নির্ব্বাক্; যেন বিপদ্ ঝঞ্ঝার ভিতর

দিয়ে বহু দিনের আটকান অমৃতের ঝরণা-ধারা ঝরে' পড়বে এখনই—এই আসন্ন তৃপ্তির কল্পনায় দু'জনেই বিভোর হয়ে পড়েছিল কয়েকটী মুহূর্ত্তের জন্য। কিন্তু রঞ্জন যখন বল্‌ল, "বস, জ্যোৎস্না", তখন জ্যোৎস্না একখানা ফ্যান্সি-চেয়ার টেনে' নিয়ে, দু'হাত দূরে বসে' পড়্‌ল এমনই বিক্ষুব্ধ হতাশ হয়ে', যে রঞ্জন স্পষ্টই দেখ্‌ল, তার চোখ মুখ হঠাৎ কাল হয়ে গেছে।

রঞ্জন বল্‌ল, "এস, একটু কাছে এস!" জ্যোৎস্না বসে' বসে'ই চেয়ারখানা হড়্‌কে' এক হাত আগে গিয়ে বস্‌ল রঞ্জনের নাগাল পাওয়ার বাহিরে। অনির্ব্বচনীয় ব্যথার শিহরণে সে অতিশয় ক্লান্ত হয়ে চক্ষু মুদিত করে'ই বল্‌ল, "কি হ'ল তোমার জ্যোৎস্না, আর একটু কাছে আসাও কি মানা?"

জ্যোৎস্নার হৃদয় মোচড় দিয়ে উঠ্‌ল অব্যক্ত বেদনায়; সে কেঁদে' উঠ্‌ত হাহাকার করে'; কিন্তু তার আরও কাছে গিয়ে বসার উদ্দীপনায় করুণ ক্রন্দন রুদ্ধ হয়ে গেল। রঞ্জন কোলের উপর হাতখানা রেখে' আশা করেছিল, কুসুম-পেলব জ্যোৎস্নার করপুট-স্পর্শে সে আরাম পাবে সান্ত্বনা পাবে। কিন্তু জ্যোৎস্না বসে' আছে কাষ্ঠপুত্তলিকার মত স্থির, নিস্পন্দ।

বেণী এসে' জানাল, "ডাক্তার এসেছে রাণী-মা"—

জ্যোৎস্নার বিশীর্ণ মুখ দিয়ে যেন বহু দূর থেকে অস্পষ্ট জড়ান বাণী বাহির হ'ল—"ঘরে চল লক্ষীটি, ঘরে চল; সারা রাত কত পর ভেবে'ই খবর দাও নি আমায়—"

রঞ্জনের বুকের উপর একটা কঠিন পাথর যেন চাপান ছিল, যেন তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল—হঠাৎ হড়্‌কে' তা' সরে' গেল এই একটী কথায়। অভিমান, নিছক অভিমান! হৃদয়হারা যদি সন্ধান পায়

হারানিধির, বিনা আয়াসে, বুক তার ভরে' উঠে আনন্দে, কৌতূহলে এক নিমেষে। ক্ষীণস্বরে রঞ্জন বল্‌ল, "অনেক রাত তখন—ঘুমুচ্ছিলে, জাগাই নি। ডাক্তার আস্‌ছে, ব্যাণ্ডেজ হয়ে গেলেই ঘরে যাচ্ছি চল—'

জ্যোৎস্না চেয়ার ছেড়ে', ঘরের বাইরে খড়খড়ির পাশে এসে' দাঁড়াল। ডাক্তার ব্যাণ্ডেজ খুল্‌তেই রগের উপর ইঞ্চি তিনেক ক্ষত তার দৃষ্টিপথে পড়্‌ল, কপালে রক্তাক্ত অসংখ্য আঁচড়। জ্যোৎস্নার বুকে যেন বিড়াল আঁচ্‌ড়াতে লাগ্‌ল। তারপর পিচকারীর জল যখন ফিণকি দিয়ে ঘায়ের উপর গিয়ে' পড়্‌ল, রঞ্জনের যন্ত্রণাক্লিষ্ট বিকৃত মুখের দিকে সে আর চাইতে পার্‌ল না; ছুটে' সে হল-ঘরের বারান্দা পেরিয়ে উপরে উঠার সিঁড়ির নীচে এসে' দাঁড়াল।

কি সে কর্‌বে! স্বামীর সেবা কি দিয়ে কর্‌বে? মানুষের অব্যক্ত অনুভূতি মানুস কি বুঝে না? এই দেহটার একটা প্রায়শ্চিত্ত আছে, এই হাত যে পিশাচ অতর্কিতে ধরে' ফেল্‌ল খপ্‌ করে'—নারীর পবিত্রতাকে উপেক্ষা করে'—সে তার কি প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বে! এলোমেলো চিন্তায় তার মাথা ঘুলিয়ে' যেতে লাগ্‌ল। বিচিত্র স্বপ্নের তন্তু নিয়ে যেন মাকড়সা তার মাথার ভিতর তাড়াতাড়ি জাল বুনে' যেতে লাগ্‌ল। হল-ঘরের ঐ খড়খড়ির পাশে দাঁড়িয়েই সে একদিন দেখেছিল, টুনুর কোলে তার স্বামীকে শুয়ে' থাক্‌তে। পর-নারীর স্পর্শে পুরুষের দেহ বুঝি কলঙ্কিত হয় না? ছাই চিন্তা! ঐখানে সে কিসের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাক্‌বে—স্বামীকে উপরের ঘরে নিয়ে যাবার জন্য! তিনি ব্যাণ্ডেজ হয়ে' গেলেই তো আস্‌বেন! বিছানাটা হয় তো এখনও পরিষ্কার করে নি সুশীলা; সারা সকাল বাবুকে নিয়েই তো ব্যস্ত আছে সবাই, ঘর-দোরের কাজ সার্‌বে কে? সেই বিবাহের সময়ে ফুলকাটা ষাজিমটা শাশুড়ী দিয়েছিলেন ফুলশয্যার রাত্রে বিছানায় পেতে, সেইটা

বিছিয়ে দিবে খাটের উপর পরিপাটী করে'। চেয়ার টেবিলগুলো এলোমেলো হয়ে ঘরময় ছড়ান আছে—আর যত অনর্থের মূল ঐ পড়ার বইগুলো, উনুনে গুঁজে' দিয়ে আপদ্ চুকিয়ে দিবে গিয়ে। জ্যোৎস্না ঘরের দোরে এসে' দাঁড়াল।

"আজ আমি পড়্ব না—"

জ্যোৎস্নার রুক্ষ কর্কশ কণ্ঠ।

এত বড় কাণ্ড যেন কিছুই ঘটে নাই, এমনই স্বচ্ছন্দ স্বরে তিনকড়ি বল্‌ল, "দুনিয়া উল্‌টে' যাক্, রুটিন্ ভাঙ্গা হবে না। এস, এক ঘণ্টাও পড়্‌তে হবে।"

জ্যোৎস্না ঘরে এসে'ই তিনকড়িকে সগৌরবে শিক্ষকের আসনে অতিশয় স্বচ্ছন্দে বসে' থাক্‌তে দেখে', হাড়ে হাড়ে জ্বলে' উঠেছিল। কিন্তু তার কণ্ঠে গম্ভীর দাবীর যে স্বর বেজে' উঠল, তা' শুনে' সে কয়েক মুহূর্ত্ত স্তম্ভিত হয়ে' সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল। মনে হ'ল, রাম ভজন অথবা ছতরু সিং-কে ডেকে' শুয়ারকে ঘর থেকে বা'র করে' দেয়। কিন্তু এই সময়ে এইরূপ একটা উপদ্রবের সম্ভাবনা-সৃষ্টির উদ্দীপনা তার মনে মনেই জ্বলে' উঠে', তখনই নিভে' গেল খড়ের আগুনের মত। সে টেবিলের সাম্‌নে বসে' অতি সহজ ভাবেই বল্‌ল, "এক ঘণ্টা অনেক সময়; আধ ঘণ্টার বেশী আমার আজ পড়ার সময় হবে না—"

"কেন?"

জ্যোৎস্না তিনকড়ির মুখের দিকে রুক্ষ দৃষ্টিতে চেয়ে' দেখ্‌ল—প্রভুর মত তার কণ্ঠভঙ্গী; মনে হ'ল, মুখে পদাঘাত করে' তার এই ছদ্মবেশ চূর্ণ করে' দেয়। কিন্তু না, আবার সাম্‌লে নিয়ে' বল্‌ল, "আধ ঘণ্টার বেশী নয়, কালকের আধ-কষা থিওরেম্ দুটো শেষ করে' দাও।"

পড়া চল্‌ল। জ্যোৎস্নার ধারণা ছিল, ব্যাণ্ডেজ হ'তে আধ ঘণ্টার উপর লাগ্‌বে। এই বেয়াদব আগন্তুক অভিভাবককে বিদায় করে' দিতে হবে সহজে, স্বভাব-বশে। কিন্তু সে ভুলে' গিয়েছিল বিছানায় যাজিম পেতে' দেওয়ার সাধ, সাজিয়ে-রাখা ঘরে তার স্বামীকে আবাহন করে' নেবে হৃদয়ের শ্রদ্ধা দিয়ে', নতি দিয়ে' আজ আবার নূতন করে'। ভুলে গিয়েছিল উপরের মন থেকে এই অনুরাগের স্বপ্ন ; কিন্তু গভীর মনে সাধের হিল্লোল কিল্‌বিল করে' উঠ্‌ছিল অব্যক্ত যন্ত্রণায়। তার খাতায় হাতের প্রত্যেক অক্ষরটা বাহির হচ্ছিল রক্তাক্ত হয়ে, আর তিনকড়ির কথার প্রত্যেক টুক্‌রোটা কাণে বিঁধ্‌ছিল বিষাক্ত স্থঁচের মত !

তার উপর হঠাৎ তিনু বলে' উঠ্‌ল, "গাজুরি সব জায়গায় খাটে না —উনি গেছেন কেরামত করতে পাঞ্জাবীর কাছে ! প্রাণ নিয়ে ফিরেছেন এই ঢের ; লাগে নি বেশী, দু'চার দিনেই সেরে' যাবে। তেমন সিরিয়াস্ যদি হ'ত, তা' হ'লে পড়াতে বস্‌তুম না। এটা তুমি মনে রেখো।"

কথা জ্যোৎস্না কাণেই নিল না। তার স্বামীর কথা নিয়ে' তিনকড়ির মুখে এই উক্তিগুলি অতি অভদ্র ও অশোভন বলে'ই তার মনে হ'ল। সে মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল—আর একটা থিয়োরেম্ শেষ হ'লেই সে নিষ্কৃতি পায়, তাই সে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা কর্‌ল,

"সম-দ্বি-ভুজ ত্রিভুজের বিপরীত কোণদ্বয় কেমন করে' সমান হ'ল ?"

তিনকড়ি সে কথার উত্তর চাপা দিয়ে, তার মনে যে ঔৎসুক্য চেপে'-ধরা সাপের ফণার মত চাগাড় দিয়ে' উঠ্‌ছিল, একেবারে সেটা ব্যক্ত করে' ফেল্‌ল এই কথায়—'আচ্ছা বৌদি, থিয়োরেম্‌টা তো এখুনি শেষ করে' ফেল্‌বে—বল তো, দাদার মায়ের পেটের ভাই যদি হতুম, কাল আদর করে' তোমার হাতখানা ধরার তৃপ্তি থেকে আমায় এমন করে' বঞ্চিত করতে পারতে কি ?"

জ্যোৎস্না মর্ম্মভেদী কটাক্ষে সটান তিনকড়ির মুখের দিকে চেয়ে' কি উত্তর দিতে যাচ্ছিল—দরজার সম্মুখেই রঞ্জন মাথায় ফেট্টি বেঁধে' এসে' দাঁড়াল।

তিনকড়ির দিক্ থেকে সেই কটাক্ষ নমিত হ'তে হ'তে ফিরে' দাঁড়াল রঞ্জনের মুখের দিকে গিয়ে। রঞ্জন একটু বিহ্বল হয়ে' পড়েছিল এই অবস্থায় জ্যোৎস্নাকে স্বচ্ছন্দ মনে পড়ার টেবিলে বসে' থাক্‌তে দেখে'—তার উপর জ্যোৎস্নার তীব্র কটাক্ষ-দৃষ্টি কেবল পড়ার প্রশ্ন নিয়েই চেয়ে' ছিল না তিনকড়ির দিকে, তার দুর্ব্বল শরীরে, অসুস্থ মনে এটাও যেন স্পষ্ট হয়ে' উঠ্‌ল।

"থাক্-থাক্, পড়, আমি পাশের ঘরে যাচ্ছি।"

মুষ্টিপ্রহারে নিজের বুক চুরমার করে' দিতে ইচ্ছে হ'ল জ্যোৎস্নার। কিন্তু বিরক্ত কণ্ঠে সে বলে' উঠ্‌ল—একান্ত অসহায়ের মত, "কেন, কেন?"

সে স্বর শ্রুতিসুখকর হয় নি; রঞ্জন ফিরে' গেল বিমুখ হয়ে' পাশের ঘরে। জ্যোৎস্না উপুড় হয়েই পড়্‌ল থিয়োরেম কষার খাতার উপর বাণবিদ্ধা পক্ষিণীর মত আর্ত্তনাদ করে'।

তিনকড়ি বসে' রইল বাক্যহীন মূকের মত প্রস্তরমূর্ত্তি—অনেক ক্ষণ সেইখানে; তারপর, সে উঠে' গেল দারুণ দুশ্চিন্তা নিয়ে'। আজ তার মনে হ'ল, একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও, এদের সাধের ঘরে ধিকি-ধিকি আগুন জ্বলে' উঠ্‌ছে, তারই ইন্ধনে।

টেবিলের উপর উপুড় হয়ে' পড়ে', ফুলে' ফুলে' সে অনেক ক্ষণ কেঁদে' ঘুমিয়ে' পড়েছিল অঘোরে, হঠাৎ কার করস্পর্শে চম্‌কে' উঠে' যেমন মাথা তুল্‌বে, দেখ্‌ল,—মৌনমূর্ত্তি রঞ্জন মাথায় ফেট্টি বেঁধে' দাঁড়িয়ে; তার চক্ষের কোলে কোলে করুণার জ্যোৎস্না-ধারা ছড়িয়ে পড়্‌ছে, প্রসন্ন

গম্ভীর মূর্ত্তি। সে সস্নেহে বল্‌ল, "জ্যোৎস্না, তুমি নাকি মাসের মধ্যে অনেক দিন না খেয়েই কাটিয়ে দাও! তাই এমন শীর্ণ হয়ে গেছ। চোখের কোলে কালি পড়েছে।"

জ্যোৎস্না স্বাভাবিক স্বরে সহজ-ভাবে উত্তর দিল, "ছাই! কে তোমায় বল্‌লে ওসব কথা?"

"যেই বলুক, সত্যি নয় কি?"

"না—নির্জ্জলা মিথ্যা, তুমি কেন মিথ্যাকে প্রশ্রয় দাও, নিষ্ঠুরের মত এমন করে'? বল, তুমি মিথ্যা ধারণা কর নি?"

কথাটা অতর্কিতেই যেন মুখ দিয়ে' বেরিয়ে' গেল।

সপ্রতিভ মুখখানা তার রাঙা হয়ে উঠেছিল।

রঞ্জন জ্যোৎস্নার মাথায় হাত রেখে' বল্‌ল, "কি ধারণা, জ্যোৎস্না? তোমার উপর মিথ্যা ধারণা—তুমি কি বল্‌ছ?"

জ্যোৎস্না খেয়াল করে নি—অসুস্থ শরীরে রঞ্জন দাঁড়িয়ে আছে তার মাথায় স্নিগ্ধ-শীতল হাতখানি রেখে'; সে তাড়াতাড়ি উঠে' বল্‌ল, "শুয়ে' ছিলে, উঠে' এলে বুঝি আমার খাওয়ার তাগিদ্ দিতে? চল, বিছানায় চল। বিছানায় চল। স্থির হয়ে' শুয়ে' থাকবে সারাদিন, উঠ্‌তে পাবে না—বল, আমার কথা রাখ্‌বে?"

রঞ্জন মৃদু হেসে', বিছানায় এসে' শুয়ে' পড়ল। হাত বাড়িয়ে, জ্যোৎস্নাকে টেনে' কাছে নিতে গিয়ে, সে দেখ্‌ল, তাকে নাগাল পাওয়া যায় না, এমনই দূরে দূরে নিজেকে সে সরিয়ে রেখেছে যেন ইচ্ছা করে'ই।

রঞ্জনের চক্ষু আপনা হতেই বুজে' গেল ধীরে ধীরে।

জ্যোৎস্না তার পায়ের তলায় বসে' খুঁচিয়ে কথা বাহির করল। "আচ্ছা বল ত, তোমায় যে আমি ঘরে আস্‌তে ব'ল্‌লুম, হল-ঘর

থেকে তুমি যেন বাঘ-সিংহি দেখে', চম্‌কে', মুখ ফিরিয়ে চলে' গেলে ও-ঘরে, কেন বল দেখি ?"

"তুমি যে পড়্‌ছিলে নিবিষ্ট হয়ে তিনকড়ির কাছে ; পাশের পড়া ক্ষতি হয়, এই ভয়ে।"

"সত্যি বল্‌ছ ?"

"তোমার মনে হচ্ছে যে, আমি মিথ্যা বল্‌ছি ?"

"হাঁ, মনে হচ্ছে। তুমি ঠিক কথা চেপে' মিথ্যা কথায় আমায় প্রবঞ্চনা কর্‌ছ। আমি তোমার কি করেছি, বলত ?"

পা-দুটো রঞ্জন জ্যোৎস্নার কোলে নিজে থেকেই তুলে' দিল ; তার মনে হচ্ছিল, এখুনি জ্যোৎস্নার কর-সঞ্চালনে অনুরাগের স্পর্শে তার হিয়াখানি পূর্ণ হয়ে' উঠ্‌বে পুলকে, আনন্দে। কিন্তু জ্যোৎস্নার কাছ থেকে সে কোন সাড়া না পেয়ে' পা-দুখানি আবার ধীরে ধীরে নামিয়ে' নিল বিছানায়।

হঠাৎ জ্যোৎস্না তেলে-বেগুনে জ্বলে' উঠার মত, তীব্রকণ্ঠে বলে' উঠ্‌ল, "আমি হাড়ি না বাগ্দী, পা-দুটো যে নামিয়ে নেওয়া হ'ল আমার কোল থেকে ?"

রঞ্জন হাত বাড়িয়ে জ্যোৎস্নাকে কাছে নিতে উঠে' বস্‌ছিল। জ্যোৎস্না বিছানা থেকে দূরে সরে' গেল। দূর থেকে হুকুমের মত ভারী গলায় বল্‌ল, "শোও বল্‌ছি, উঠ্‌তে পাবে না। আমার কথার জবাব দিলে না যে ?"

রঞ্জন বিষণ্ণ মনে বিছানার উপর ঢিপ্ করে' শুয়ে' পড়্‌ল।

"কি কথার জবাব, জ্যোৎস্না ? ঘরে এসে' ফিরে' গেলুম কেন ? দুর্ব্বল মনের ধর্ম্ম, অপরাধী আমি নিজেই ; মনে হয়েছিল, এসে' দেখ্‌ব, তুমি দাঁড়িয়ে আছ আমার আসার উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায়। এর চেয়ে

বড় স্বার্থপরতা আর কি আছে! তোমার যে পাশের পড়া, সময়ের মূল্য তোমার মত আর কে বুঝ্বে, জ্যোৎস্না?"

"ঠিক ব'ল্ছ?" দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করে' জ্যোৎস্না বল্ল, "ঠিক বল্ছ? নির্জ্জলা সত্য কথা নয়!"

"না, আর একটু বলার আছে। শুধু পড়্ছিলে, না বুঝি অন্য কথাও হচ্ছিল! তোমার উচ্চকিত চাহনীর সঙ্গে যে কথাটা মুখ দিয়ে' বাহির হ'তে যাচ্ছিল, আমি এসে' পড়ায় তা' যেন ফিরে' গেল তোমার বুকের মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে'—ঠিক বলি নি?"

"আর একটু বল—তোমার পায়ে পড়ি, আমায় এমন ক'রে' তিলে তিলে দগ্ধ ক'রো না। আর কিছু তোমার মনে হয়েছিল কি না বল। আমায় বৃথা সান্ত্বনা দিও না। আমায় সত্যি করে' বল—তোমার মনে আর কিছু হয়েছিল কি না!"

"আর কি হবে, জ্যোৎস্না? আর কি হ'তে পারে। তুমি এর চেয়ে আর কি বেশী কর্তে পার, সে যে আমি কল্পনাও কর্তে পারি না।"

তীব্রকণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়ে' জ্যোৎস্না বলে' উঠ্ল, "তার চেয়ে' আর কি কল্পনা করবার আছে, তুমি মনে কর! আমি কি করেছি, যার বেশী আর করা যায় না! কি দেখেছ তুমি? এত মিথ্যা, এত ছলনা, মুখ ফিরিয়ে' চলে' গেলে, আবার বল কি না—বেশী কিছু মনে হয় নি তোমার? ধূর্ত্ততা কর্ছ কার কাছে? বিশ্বাসঘাতক, প্রতারক!"

এ কি কথা! রঞ্জন অবাক্ হয়ে' তার সমুজ্জ্বল চক্ষু-দু'টীর দিকে তাকিয়ে রইল—তার মনে হ'ল, এ কি সেই জ্যোৎস্না! সেই লজ্জাঘন, ব্রীড়াবনত, কোমল লতার ন্যায় সময়ে-অসময়ে তার সবখানি দিয়ে অন্তরে বাহিরে জড়িয়ে' থাক্তে চাইত, সবিনয়ে একান্ত অকিঞ্চনের মত

অর্থহীন কত কথা পাগলের মত বলে' যেত, প্রলাপের বান থামাতে পারত না। সারা রাত্রি ধরে' তার কথার প্রবাহ ক্লান্ত হ'লেও, চক্ষু বুজার উপায় ছিল না, অভিমানে গলা ধরে' বলত, 'ঘুমোলে? কথা বুঝি আমার ভাল লাগে না? ভাল বুঝি বাস না আমায় তোমার সবখানি দিয়ে'?" এই কি সেই সরল, অকপট, নির্মেঘ স্বচ্ছ নীলের মত সুষমাময়ী তার জ্যোৎস্না? রঞ্জনের বাক্‌স্ফূর্ত্তি হ'ল না, স্তব্ধ হয়েই সে শুয়ে' রইল।

চাপা আগুন এমন দপ করে' জ্বলে' উঠায়, জ্যোৎস্না নিজেই যেন অপ্রস্তুতে পড়্‌ল, স্বর নামিয়ে' বল্‌ল, "দুঃখ দিও না, সত্যি করে' বল— আমায় তোমার সংশয় হয় নি একবিন্দু? মনে হয় নি একবারও, আমি কিছু অন্যায় কর্‌ছি?"

রঞ্জন শিশুর মত উত্তেজিত কণ্ঠে বলে' উঠ্‌ল, "না, না, না, জ্যোৎস্না, তুমি আমায় ক্ষমা কর, তোমার পরিবর্ত্তন আমি আর সহ্য ক'র্‌তে পারি না!"

উত্তেজনায় বোধ হয় ক্ষত-মুখে রক্ত উৎসরিত হয়েছিল, সাদা ব্যাণ্ডেজের উপর রক্তাভ বর্ণ ফুটে' উঠ্‌ল, করুণায় জ্যোৎস্নার হৃদয় ভেসে' গেল অকস্মাৎ প্লাবনে। সে হুমড়ি খেয়ে' রঞ্জনের বুকে গিয়ে' পড়্‌ল, যেন নিজেকে তলিয়ে দিতে, ডুবিয়ে' দিতে তার অপরিসীম অনুরাগের সমুদ্রে।

রঞ্জন তার নিস্পন্দ ঋজু দেহবল্লরী দুই বাহু দিয়ে' বুকের উপর চেপে' ধরে', বহুদিন পরে সান্ত্বনায় সমাহিতচিত্তে বিভোর হয়ে' রইল চক্ষু মুদিত করে'। সে অনেক ক্ষণ—কত ক্ষণ, দু'জনেই তা' নির্দ্ধারণ কর্‌তে পারে না।

পরীক্ষা দেওয়ার দরখাস্তে শিক্ষকের একটা সই চাই। রঞ্জন বল্‌ল, "তিনুই তোমায় পড়িয়েছে, তার শিক্ষকতা স্বীকার করাই তোমার সঙ্গত। আমি আর ক'দিন পড়ালুম !"

"তা' বৈ কি—গোড়াপত্তন কর্‌লে কে ? ও-সব বাজে কথা শুন্‌ব না। ঠাকুর-পো যদি সই করে, তোমার পায়ে মাথা খুড়ে' রক্ত-গঙ্গা হব।"

"আস্ত পাগল ! ও মনে কর্‌বে কি বল তো ! কত যত্ন করে' পড়ালে, তার অধ্যক্ষতা অস্বীকার করা যে নিমক্‌হারামি !"

"ইস্‌, বল কি ? তত্ত্বকথা আর শেখাতে হবে না। এখন আর মূর্খটি নেই। আজ-বাদে-কাল পাস্‌-করা বলে' পরিচয় দেব। তোমার নাম যদি দরখাস্তে না দেখি, ও-মুখো হচ্ছি না, তা' বলে' রাখ্‌ছি কিন্তু—"

জ্যোৎস্না ঘুরন্ত লাট্টুর মত কাত্‌রে' ঘরে থেকে বের হয়ে' গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনকড়িও ঘরে এসে' হাজির। হাতে ছিল এক তাড়া কাগজ ; টেবিলের উপর রেখে' বল্‌ল, "বি, টি, পরীক্ষা শেষ হ'ল, বাড়ী যাওয়ার আগে মাসীমার সঙ্গে বুঝি দেখা হ'ল না !"

"এত তাড়াতাড়ি কেন ? তোমার বৌদির একজামিন্‌ পর্য্যন্ত থেকে যাওয়া উচিত।"

তিনকড়ি বিষণ্ণমুখে বল্‌ল, "সে কর্ত্তব্যবোধ তুমি আসার পর থেকেই ছেড়েছি। এখন আমার প্রয়োজনও শেষ হয়েছে, নেহাৎ জোর করে'ই পড়াই। বৌদির ইচ্ছা নয়, যে আমার কাছে পড়ে।"

"না, না, ও তোমার ভুল ধারণা।"

জ্যোৎস্না ঘরে এসে' ঢুক্‌ল। তিনকড়ি উঠে' যাচ্ছিল তাড়াতাড়ি ; রঞ্জন বল্‌ল, "শুনছ, তিনু কি বলে ! আমি এসেছি বলে' নাকি তুমি

ওর কাছে পড়্‌তে বস না। কাজের সময় কাজী, শেষে বদনামের ভাগী হ'লে!"

জ্যোৎস্না স্বামীর দিকে কটু কটাক্ষপাত কর্‌ল। তিনকড়ি আভাষে বুঝে' নিল, যে সে জ্যোৎস্নার কাছে অপ্রিয়ভাজন হয়েছে; ইশারায় সে ইঙ্গিত দাদাকেও যে সে দেয় নি তা' নয়—বিনা-বাক্যে চেয়ার ছেড়ে' সে উঠে' গেল।

জ্যোৎস্না—"কি যে বল—তোমার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই; মানুষকে বেশী প্রশ্রয় দিলে সে তার ন্যায্য সীমা ছেড়ে' অনধিকার-চর্চ্চার সুযোগ পায়। আমি তা' পছন্দ করি না। কুটুম্বের ছেলে এসেছে, মানে-মানে বিদায় হ'লেই বাঁচি! বেশী ঘনিষ্ঠতা দেখান সঙ্গত নয়।"

জ্যোৎস্না কথাগুলো পুস্তকের একটা প্যারাগ্রাফ পড়ার মত সটান বলে' গেল।

রঞ্জন কথা পাল্টে' নিয়ে' হেসে' বল্‌ল, "সত্যি বল্‌ছি জ্যোৎস্না, পাটনা থেকে ফিরে' আসা অবধি তোমার মূর্ত্তিটা যে রকম থম্‌থমে হয়ে' উঠেছিল, তাতে মনে হয়েছিল, মা এলে বাড়ী ছেড়ে পালাতে হবে শীগ্‌গীর। পাঞ্জাবীর লাঠী শনির দশা ছাড়িয়ে দিলে। কুষ্ঠীটা দেখালে হয়, সম্ভবতঃ বৃহস্পতির দশায় এসে' পড়েছি!"

জ্যোৎস্না গম্ভীর হয়ে' বল্‌ল, "আচ্ছা, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ঠিক বল্‌বে?

রঞ্জনের মুখ দিয়ে' কিছু উত্তর বের হবার আগেই সে বল্‌ল, "প্রতুল বোসের স্ত্রী নাকি অখিল মিত্তির—ঐ যে নাটক করে' বেড়ায়—তার সঙ্গে নাচ্‌বে! আচ্ছা, এই যে পর-পুরুষের সঙ্গে ছোঁওয়া-ছুঁয়ি, তার স্বামী তাকে কিছু বল্‌বে না?"

রঞ্জন হেসে' বল্‌ল, "সে-কালের কুসংস্কার ধুয়ে'-মুছে' গেছে। ছোঁওয়া-ছুঁতের ধর্ম্ম এ যুগে নেই। তোমার মাথায় ঐগুলো সব কিল্‌-বিল্ করে, দেখ্‌ছি!"

"হাঁ, করে। তুমি তাই বুঝি টুনুর কোলে মাথা দিয়ে শুয়েছিলে? আর টুনুও হয় তো তোমার কোলে মাথা রেখে', ছুটো হাত বাড়িয়ে, গলা ধরে', চেয়ে' থাকে তোমার মুখের পানে! এযুগে ও-সবে আর দোষ হয় না, না?"

কথা বলে'ই জ্যোৎস্না এক হাত জিব্ কেটে' মুচ্‌কে' হেসে' ফেল্‌ল—কিন্তু রঞ্জন তার মুখের দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে' রইল হতভম্ব হয়ে'।

জ্যোৎস্না খিল্‌খিল্ করে' হেসে' উঠ্‌ল—ব'ল্‌ল, "ঠাট্টা বোঝ না বুঝি? অবাক্ হয়ে' চেয়ে রইলে যে? আর যদি সত্যই হয় দোষ কি তাতে, ছোঁওয়া-ছুঁতের বালাই এ যুগে তো ধুয়ে'-মুছে' গেছে, নিজেই বল্‌লে না?"

"কিন্তু যা' সত্যি নয়, তা' কাণে শুনে' গা একটু শির্‌শির্ করে' উঠে। এ রকম কথা হঠাৎ তুমি ব'ল্‌লে কেন বল দেখি?"

জ্যোৎস্না তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে' রইল তার মুখের দিকে চেয়ে। যেন সে শঙ্কিত, সঙ্কুচিত, সংশয়ে আড়ষ্ট হয়ে' পড়েছে না? মুখও গেছে শুকিয়ে', আঁতে ঘা পড়েছে কি না!

মানুষ যখন হাসে আনন্দ করে', তখন তার মনে হয়, দুঃখ-বিষণ্ণতা-ক্রোধ বুঝি সব পালিয়েছে তার ত্রিসীমা ছেড়ে'। কিন্তু ঘটনার সংঘাতে যখন আবার ফণা ধরে' গর্জ্জে' উঠে, তখন মনে হয়, ক্লান্ত তারা, একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছিল হাসি-কৌতুকের চাদর মুড়ি দিয়ে'। জ্যোৎস্নার ক্ষত-স্থান যেন দগ্‌দগিয়ে' উঠ্‌ল—কিন্তু মনের ভাব গোপন করে' সে বল্‌ল,

"বাবারে বাবা, তামাসা করবারও যো নেই! চোখ মুখ রেঙে' উঠ্‌ল— কথা শুনে'। আচ্ছা, সত্যি সেই যে পাটনা থেকে এলে, তারপর তোমার বন্ধুর খবরও তো নাও না ভুলে'? আর টুনুরও তো বিয়ের বয়স উৎরে' গেল; কাজ নেই, কর্ম্ম নেই, ভাইকে চিঠিপত্রও তো লেখে না আর! তুমি যে রকম কুঁ'দুলে মানুষ, আস্‌বার সময়ে ঝগড়াঝাঁটী নিশ্চয় করে' এসেছ! যেমন আমার সঙ্গে রাতদিন হচ্ছে!"

"বেশ তুমি! উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে! তোমায় সে সব কথা বলি নি। সময় বা পেলুম কখন? টুনুর কাণ্ড শুন্‌বে? সে এক লম্বা চিঠি—"। তাড়াতাড়ি তার সুটকেশ খুলে' টুনুর দাদার একখানা চিঠি সে জ্যোৎস্নার গায়ে ছুঁড়ে' ফেলে' দিল। কি একটা অভাবনীয় আতঙ্কে জ্যোৎস্নার মুখখানা কাল হয়ে' উঠ্‌ল। চিঠিটা লম্বাই বটে—সে ব'ল্‌ল শুষ্ক মুখে, "কি লিখেছে পড়, শুনি।"

রঞ্জন অত্যন্ত উৎসাহে পড়া জুড়ে' দিল, জ্যোৎস্নাকে শুনিয়ে'। মর্ম্মার্থ এই—টুনুর বিবাহের সাধ গেছে ঘুচে' অনেক দিন, ব্যারিষ্টার পি, মুখার্জ্জির কত সাধাসাধি, টুনুকে তার পছন্দ হয়েছিল, বেজায় রকমের সে বিদ্রূপ করে'ই জবাব দিয়েছে, হৃদয় তার হারিয়ে গেছে কোন এক জায়গায়, খুঁজে' পাওয়া যাচ্ছে না, তল্লাস পেলে পত্রযোগে জানাবে মনের কথা। তারপর, টুনু নাকি পাটনার কোন এক গোঁসাই'র পাল্লায় কৃষ্ণপ্রেমের সাধনা নিয়েছে! সাড়ী, সেমিজ, হাল-ফ্যাশানে যেমন সে সেজে-গুজে' বেড়াত, বডি-ব্লাউজ যে ভাবে সে গায়ে এঁটে' প্রজাপতির মত ডান্সে, টেনিসে উড়্‌ত, এখন সে সব ভাব গেছে উল্টে'; তার মুখে আর পাউডারের প্রলেপ পড়ে না, সাবান-এসেন্সের পাট সে ছেড়েছে; খুব রোক—তীব্র বৈরাগ্যের দিকে। উড়ো পাখী, কদমফুল, মাধবীপাতা, কাঁচা রঙের ছাপ, গোলাপী রং'এর উপর বৃন্দাবনী শাড়ী

তার হয়েছে প্রিয় পরিচ্ছদ। মাথার ঝুঁটী সে টেনে' সামনের দিকে রাখে, সে এক অপূর্ব্ব বেশ! আর নাকে কাটে লম্বা তিলক, যাকে লোকে বলে রসকলি। গলায় তার তুলসীর মালা, হাতে একটা কুঁড়োজালি। ঠোট দুটো সর্ব্বদাই নড়ছে, বিড়বিড় করে' কি বলে সেই জানে। তারপর অনুনয় করে' রঞ্জনকে লিখেছে তার ভাই, যদি সে আসে একবার পাটনায়, টুনুর পাগ্‌লামী সে হয় তো ঘোচাতে পারে।

নীচের ঠোঁটটা উপরের দাঁতে পিষে' জ্যোৎস্না চাপা গলায় জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "কবে যাচ্ছ শুনি, এই রসের বোষ্টমীটির মান ভাঙ্গ্‌তে?"

রঞ্জন হো-হো করে' হেসে' ব'ল্‌ল, "তোমার পরীক্ষার জন্যই তো আছি আট্‌কে', তা' না হ'লে টুনুর এ রোমান্স্ স্বচক্ষে দেখার আগ্রহ আমার কম নয়।"

জ্যোৎস্নার মুখ দিয়ে' আর উত্তর বা'র হ'ল না। আকাশ যেন বায়ুশূন্য হয়েছে—নিঃশ্বাস প্রশ্বাস তার বন্ধ, বাক্ রুদ্ধ। অন্তরে প্রচণ্ড ঝটিকাবর্ত্তের পূর্ব্বাভাস সে অনুভব করে' সেখান থেকে উঠে' চলে' গেল বাইরে।

রঞ্জন খাতাপত্র ঘাঁট্‌কাচ্ছিল কি একটা হিসাব বাহির করার জন্য। তিনকড়ি এসে' ব'ল্‌ল, "বৌদিদি জেদ ধরেছেন, আজ যাবেনই তিনি চিত্রায় চণ্ডীদাস দেখ্‌তে। তোমায় খবর দিতে বল্‌লেন।"

রঞ্জন মুখ না ফিরিয়েই ব'ল্‌ল, সময় নেই ভাই, এখন চণ্ডীদাস দেখার। পরীক্ষার সময়ে হঠাৎ তোমার বৌদিদির এ আবার কি সখ্! যাও তুমি তাকে নিয়ে, আমি নাই গেলুম।"

পেছনেই দাঁড়িয়েছিল সজ্জিত-বেশে জ্যোৎস্না। চক্ষের ইশারায় তিনকড়িকে নিঃশব্দে ডেকে' নিয়ে' গেল দূরের বারন্দায়। সে আল্‌গোছে

মেঝের উপর পা ফেল্‌তে ফেল্‌তে দুলে' দুলে' চল্‌ছিল এগিয়ে', তিনকড়ি তার পশ্চাতে।

একবার জ্যোৎস্না ফিরে' চেয়ে' দেখ্‌ল, তিনকড়ি আস্‌ছে তার সঙ্গে সঙ্গেই, কিন্তু দৃষ্টি তার অবনত : সে পিঠের কাপড়খানা আর একটু নামিয়ে অতি সন্তর্পণে বারান্দার প্রান্তে খোলা খড়খড়ির পাশে এসে' দাঁড়াল।

অপূর্ব্ব সুন্দরী! তিনকড়ি নিমিষহীন দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়েছিল।

"কি বল্‌লেন উনি? চণ্ডীদাস দেখার সময় নেই। হুঃ, আমার আছে না? ঠাকুর-পো, আমায় নিয়ে যেতে পার কোথাও, এমন কোন জায়গায়, যেখান থেকে আর ফেরা যায় না কোন-মতে—যেখানে তোমার দাদাও আর পৌঁছতে পার্‌বে না—শত চেষ্টায়!"

তিনকড়ির সঙ্গে আজ অপরাহ্নেই কথা; এমন হেসে', এমন মিষ্টি করে' বহু দিন সে তার সঙ্গে আলাপ করে নি। দুর্ভেদ্য প্রাচীরের আবেষ্টনে প্রাণ তার হাঁফিয়ে উঠেছিল। "একদিন নিয়ে চল না, ঠাকুর-পো, টকি দেখে' আসি।"

মুখের কথা খসাতে তর্ সয় নি, তখনই তিনকড়ি বক্সের টিকিট কিনে' এনে' হাজির।

"আজই?"

"হাঁ"—তিনকড়ি যেন এ সুযোগ আর ছাড়্‌তে পারে না।

কিন্তু জ্যোৎস্নার পা থর্-থর্ করে' কাঁপ্‌ছিল। রাগে-অভিমানে আত্মহারা সে, এই সময়ে কেউ তাকে রক্ষা করার নাই! অধীর হয়ে সে বুকে ছুরী বসাতে যায়—কেউ তার হাতখানা খপ্ করে' ধরে'

ফেলে না—নিবারণ করে না! কথা দিয়ে তা' আর ফেরান যায় না, তবুও সে বল্‌ল, "বলনা তোমার দাদাকে সঙ্গে যেতে।"

রঞ্জন কাণে নিল না—শেষ আশা, পা হড়কে' দিয়ে' করুণ দৃষ্টিতে তার সাহায্যপ্রার্থনা—সে কি আর তাতে আছে, সে কি জ্যোৎস্নার মর্ম্মব্যথার আর সন্ধান রাখে? টুনু, টুনু, টুনু! কৃষ্ণ-বিরহে উদাসিনী, বৈরাগ্য-বেশে প্রেমোন্মাদিনী টুনু! বাধা জ্যোৎস্না, তার সরে' পড়াই ভাল। কিন্তু অসহায়—কোথায় যাবে সে! একবার ফাঁকে জলা-মাথা যদি ঠাণ্ডা হয়, বাহিরের হাওয়ায় একটু ঘুরে'ই ফিরে' আস্‌বে। আর পরপুরুষের সঙ্গে এই ঘুরে' আসার ব্যাপার নিয়ে' বুকে ওর বাজ্‌বে না একবারও কি একটা হাতুড়ীর ঘা! বলুক্ আর নাই বলুক, সেদিন তার মুখ শুকিয়েছিল কটাক্ষের একটা লঘু সঙ্কেতে। লাগ্‌বে না বুকে, খুব লাগবে!

"চল ঠাকুর-পো!" গায়ে ঢলে' পড়ার ভাব নিয়ে' সে টল্‌তে টল্‌তে নীচে দাড়-করান "লাক্‌সারি-কারে" গিয়ে ঝুপ করে' বসে' পড়্‌ল। কার্ ছুট্‌ল বায়ুবেগে চৌরঙ্গীর দিকে।

ডাণ দিকে গভর্ণমেণ্ট হাউস্, ষ্ট্র্যাণ্ডে গিয়ে' পড়্‌ল নক্ষত্রবেগে জ্যোৎস্নাকে নিয়ে' হাওয়া-গাড়ী, চালকের আসনে বসে আছে স্বয়ং তিনকড়ি। সোফার নাই। ডাণ দিকে গঙ্গার কাল জল থিক্-থিক্ কর্‌ছে আলোর আভায়। বাঁ-দিকে উঁচু নীচু কেল্লার ঢিপি, মৃত্তিকা গর্ভে বাড়ীর অস্পষ্ট ছাদ, আর বেতার-যন্ত্রের সুদীর্ঘ পোষ্টগুলো অজান জগৎ থেকে খবর আনার জন্য যেন উদ্‌গ্রীব হয়ে' দাঁড়িয়ে' আছে শোঁ-শোঁ, গাড়ী গিয়ে' পৌঁছাল হেষ্টিংস্-হাউসের পাশ দিয়ে গড়ের্ মাঠে।

জ্যোৎস্না চমকে' উঠে' বল্‌ল, "কোথা নিয়ে চলেছ, দিগ্বিদিক্ জ্ঞান-হারার মত? পথ ভুল করেছ, পিক্‌চার-প্যালেস্ তো মার্কেটের কাছে।"

ভবানীপুর, কালীঘাট পায় হয়ে চলেছে গাড়ী ঊর্দ্ধশ্বাসে। জ্যোৎস্না চেঁচিয়ে' উঠে' বল্‌ল, "থামাও গাড়ী, তা' না হ'লে আমি লাফ দিয়ে' পড়্‌ব। কথা শোন—চেঁচাব।"

শীতের রাত্রি। পাশ দিয়ে ছুটেছে অজস্র গাড়ী। লোকের ভীড় কমে' এসেছে এই পথে। বালিগঞ্জ ছাড়িয়ে গাড়ী এসে' পড়েছে লেক্-রোডে। দক্ষিণে কৃত্রিম হ্রদে চাঁদের ছায়া—বাঁ-দিকে বনের ভিতর দিয়ে বিকট 'কুক্' দিতে দিতে মাল-বোঝাই একখানা গাড়ী রেলপথে প্রচণ্ড দৈত্যের মত ছুটেছে। জ্যোৎস্নাদের গাড়ী এসে' দাঁড়াল একটা ঝোপের ধারে খেজুর গাছের তলায়। জ্যোৎস্না কি বল্‌তে যাচ্ছিল—তিনকড়ি গাড়ীর দরজা খুলে' ভিতরে এসে' বস্‌ল তার পাশেই।

জ্যোৎস্না চারিদিকে চেয়ে' দেখ্‌ল—জনমানবশূন্য স্থান। ঝিঁঝিঁ ডাকছে কর্ণ বধির করে'। কম্পিত-কণ্ঠে করুণ অনুনয়ে সে বলে' উঠ্‌ল, "ঠাকুর-পো, রক্ষে কর—আমি তোমায় বুঝ্‌তে পারছি না!"

তার মনে হ'ল বাঁ-দিকের অসাড় হাতখানা তিনকড়ির হাতের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। তার অস্ফুটকণ্ঠে বাক্‌স্ফূরণ হ'তে না হ'তেই সে অনুভব ক'র্‌ল, তিনকড়ি তার বাম অঙ্গ বেষ্টন করে' দক্ষিণ বাহুর উপর তার ডাণ হাতখানি তুলে' দিয়েছে—বিষাক্ত নিঃশ্বাসে তার সর্ব্বাঙ্গ যেন পুড়ে' যায়! সর্প-দংশনের চেয়েও অধিক জ্বালা, চেষ্টা করে'ও সে আর নিঃশ্বাস ফেল্‌তে পারে না। রুদ্ধ-কণ্ঠ—নাক দিয়ে'ও নিঃশ্বাস পড়ে না। মুখ দিয়ে' অব্যক্ত প্রতিধ্বনি হ'ল—কাণে তখনও 'গুন্-গুন্ করে' ভারী গলার কি যেন এলোমেলো শব্দ পৌঁছচ্ছিল।

পাশের বিদ্যুতালোকে তিনকড়ি দেখ্‌ল, এ জ্যোৎস্না নয়, একটা

মৃত-কঙ্কালময়ী প্রেতমূর্ত্তি। দৃষ্টি স্থির, চক্ষের তারা প্রায় দুই ইঞ্চি ছিট্‌কে' বাহির হয়ে' পড়েছে, মুখ পাথরের মত সাদা, ওষ্ঠপুট নীল, আর দুই কস্ দিয়ে উদ্গীর্ণ ফেনপুঞ্জ বীভৎস মৃত্যু-চিহ্ন প্রকাশ কর্‌ছে! তার ভীষণ ভয় হ'ল। তাড়াতাড়ি গাড়ীর সাম্‌নে এসে', সে দ্রুত ছুটিয়ে' দিল গাড়ী চৌরঙ্গীর দিকে। মিউজিয়ম্ ছাড়িয়ে', একবার ফিরে' পেছন দিকে তাকিয়ে' দেখ্‌ল, জ্যোৎস্না মরে নি—মাঠের হাওয়া লেগে' সে আবার জীবন পেয়েছে ফিরে, বোধ হয়, নিঃশ্বাস নিচ্ছে ধীরে, চক্ষের তারা দু'টা আয়ত নয়নপল্লবের নীচে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে স্থিরভাবে।

গাড়ী হাঁকাতে হাঁকাতে পিক্‌চার-প্যালেসের সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াল। জ্যোৎস্না তখন প্রকৃতিস্থ; চোখ চেয়ে' দেখ্‌ল—নানা রঙের বাল্‌বে বিদ্যুতের আলো, আর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে ফুটপাতের উপর তার স্বামী। গাড়ী থাম্‌তেই সে এসে' দরজা খুলে' বল্‌ল, "এসো। ছবি অর্দ্ধেক শেষ হয়ে' গেছে, কোথায় ছিলে তোমরা এত ক্ষণ—সোফারকে ছেড়ে দিয়ে?"

সোফারও ছিল তিনকড়ির নির্দ্দেশ-মত পিক্‌চার-প্যালেসের গেটে দাঁড়িয়ে'। তিনকড়িও নেমে' পড়েছিল গাড়ী থেকে, সন্ত্রস্ত অথচ স্বাভাবিক স্বরে বল্‌ল,—"একটু হাওয়ায় ঘুরে' এলুম, দাদা। নামো বৌ-দিদি, দেরী হয়ে' গেছে অনেক।"

কিন্তু কি অস্বাভাবিক দৃষ্টি—উন্মাদ-মূর্ত্তি জ্যোৎস্নার! রঞ্জন কিছু না বুঝে'ই, বলে' উঠ্‌ল, "যাও বাড়ী, আর একদিন এসো সকাল সকাল ছবি শেষ হয়ে' এসেছে।" তিনকড়ি অবিলম্বে ভোঁ-ভোঁ গাড়ী ছুটিয়ে দিল বাড়ীর দিকে, জ্যোৎস্নাকে সে বাড়ী পৌঁছে দিতে পার্‌লে বাঁচে। জ্যোৎস্নার কাতর দৃষ্টি স্বামীর কৌতূহল-দৃষ্টির উপর স্থির হয়েছিল। গাড়ী ছুট্‌ল; সে দেখ্‌ল স্বামী তার স্তব্ধ হয়ে' দাঁড়িয়ে আছে সেইখানে, দৃষ্টি তার গাড়ীর দিকেই।

সাত

মা ফিরে' এসেছেন কাশী থেকে', গুরুদেবকে সঙ্গে নিয়ে'। জ্যোৎস্না সেই যে বিছানা নিয়েছে, আর উঠে নি মাথা তুলে'। দুদিন সে 'হাঁ' করে নি—এক ফোঁটা জলও তার মুখে পড়ে নি। রঞ্জন নিরুপায় হয়ে' মাকে তার করে' দিয়েছিল শীঘ্র ফিরে' আসার জন্য। ডাক্তারেরা বলেন, কোন কারণে, "নার্ভাস্ শকে" জ্যোৎস্নার এই অবস্থা। মুখ না খোলে, নাক দিয়ে' রবারের নলে দুগ্ধপান করাতে হবে।

কিন্তু সে উপদ্রব আর জ্যোৎস্নার প্রতি করতে হ'ল না—মায়ের স্নেহবর্ষণে সে আবার যেন নূতন করে' বেঁচে' উঠ্‌ল। কিন্তু সে মানুষ আর জ্যোৎস্না নয়। পড়া-শুনা তো একেবারেই নাই, সংসারের কর্তৃত্ব, আভিজাত্য, আত্মসম্মান-বোধ যেখানে, সেখান থেকেই সে সরে দাঁড়ায়। সে ভোরে উঠে' নর্দ্দমা পায়খানা পরিষ্কার করে, মায়ের পূজার আয়োজন করে' দেয়। হবিষ্যান্ন রাঁধ্‌তে বল্‌লে হাত গুটিয়ে' দাঁড়ায়। বরং ঝিদের হাত থেকে লোক-জনের এঁটো বাসন নিয়ে' মাজ্‌তে বসে—তবুও কোন বড় কাজে এগোয় না।

মা জিজ্ঞাসা করেন, "এসব কি কাজ? মাথা খারাপ কর কেন—কি হয়েছে তোমার।"

নিশ্চল দৃষ্টি, স্ফূরিত অধর, দাঁতে দাঁত চেপে যেন মর্ম্মকথা ফিরিয়ে' দিয়ে' সে আবেগের কান্না রোধ করতে আর পারে না। সে চেঁচিয়ে' কেঁদে' ওঠে'—মা আঁচল নিয়ে' চোখ মোছাতে যান, জ্যোৎস্না ছুটে' পালায়। কাদু বলে—ও আর কিছু নয়, নিশ্চয়ই মন্দ হাওয়া লেগেছে গায়ে। রোজা ডাকতেই হবে। মা সে কথায় কাণ দেন না।

রঞ্জন যে কি কর্‌বে, ভেবে'ই পায় না। সে অনেক জিজ্ঞাসা করেছে জ্যোৎস্নাকে, কি তার হয়েছে,—জবাব পায় না। তিনকড়িকে ডেকে' সে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলে'ও সদুত্তর পায় নি। সেই রাত থেকেই জ্যোৎস্নার এই অবস্থা ; পথে কি এমন কাণ্ড ঘট্‌তে পারে, যে জ্যোৎস্নার এমন ভূতে পাওয়ার মত অবস্থা হয়! তিনকড়ি বলে—পথে দু'একবার তার গলার আওয়াজ শুনেছিল বটে ; কিন্তু লেক্‌রোডে গিয়ে' সে দেখ্‌ল —বৌদিদি তন্দ্রাচ্ছন্না। ভয়ে ভয়েই সে ফিরিয়ে' এনেছিল গাড়ী—তারপর কেন যে তার এমন অবস্থা, সে'ও বুঝে না, ভেবে'ও স্থির কর্‌তে পারে না।

গুরুজী আসন করেছিলেন বাইরের ঘরে। কাশী থেকে এক মহাপুরুষ এসেছেন রঞ্জনের বাড়ী, একথা পাড়ার লোকের কাণে গিয়েছিল। কথা কাণে হাঁটে ; আফিসের কেরাণী থেকে আদালতের উকিল-মহলেও মহাপুরুষের আগমন-বার্ত্তা রাষ্ট্র হয়ে' পড়েছিল। রঞ্জনের বাড়ী লোকসমাগমে মুখর হয়ে' উঠেছিল। ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু বড় কেহ নহে, সকলেই যেন দায়গ্রস্ত, মহাপুরুষের কৃপা হ'লেই বিপদ্ কাটে —এই নতি, মিনতি ; হল-ঘরে নানা সুরে, নানা ছন্দে কলরব চলে রাত্রিদিন।

মা বল্‌লেন, "হাঁ রে রঞ্জন, সহর-শুদ্ধ লোক মহাপুরুষের কাছে আসছেন ; আর তুই কি এমনই ধিঙ্গি হয়েছিস্ যে একবার সময় হ'ল না ওঁর কাছে গিয়ে' একটা প্রণাম দিয়ে আস্‌তে ?"

রঞ্জন ঢিপ্ করে' মায়ের চরণে প্রণতিজ্ঞাপন করে' বল্‌ল, "জন্মে' অবধি এমন কিছু পাইনি, যা' আশ্রয় বলে' মেনে নি, বিশ্বাস করে' আস্থা রাখি। পেয়েছি মাতৃস্নেহ, আজও আছি পাহাড়ের আড়ালে—আমার আর কিছুর প্রয়োজন নেই, মা!"

মায়ের বুক ভরে' উঠেছিল রঞ্জনের কথায় মহিমায়, মর্য্যাদায়। তবুও বল্‌লেন, "এমন ছেলেও কখন দেখি নি—আজ বাদে কাল ছেলের বাপ হবি, মায়ের কোল-ছাড়া হ'তে চাস্ না! আমি বল্‌ছি শোন্—আর কিছু না পারিস্, একটা পেন্নাম দিয়ে' আয়—তা' না হ'লে উনি মনে বড় দুঃখ কর্‌বেন।"

"বল কি, মা? সন্ন্যাসী মানুষের আমাদের মত আবার দুঃখ কষ্ট আছে নাকি?

রঞ্জন আর একবার মায়ের চরণে মাথা ছুঁইয়ে বলে' গেল, "মাথাটা এখানে যা' নুইয়েছি, মা—আর কোথাও ঘাড় হেঁট কর্‌তে ব'লো না।"

কানু পাশে দাঁড়িয়েছিল; মা বল্‌লেন, "দেখ্‌লি কানু, ছেলের রকম দেখ্‌লি? আমি ম'লে এ বাড়ীতে আর সাধু সন্ত পা দিচ্ছে না।"

"তা' না দিক্, মা—ও একটা বাজে ঝঞ্ঝাট্, ও-কি ধর্ম্ম বুঝি না, মা। সারাদিন গ্যাঁট্ হয়ে' বসে থাকা, ধম্ম কোথায় মা?"

"ওকি কথা রে? মন্দিরে মাটি-পাথরের দেবতাও বসে' খায়—তাই বলে' কি ঠাকুর-দেবতাকে অমান্য কর্‌বি?"

"দেবতা খায় কোথা, মা? ও-মোড়ের কালীমন্দিরে যা' দ্রব্য-সামগ্রী দেওয়া হয়, খায় তো হারু ঠাকুর। যদি হারু ঠাকুরকে দেবতা বল—কথা নেই। যা' দেখ্‌ছি, তাই বল্‌ছি মা—আমরা মুখ্যু সুখ্যু মানুষ, ভিতরে যদি কিছু থাকে বুঝি না!"

কানুর পাষণ্ড বৃত্তির পরিচয় পেয়ে' মা কি বল্‌তে যাচ্ছিলেন—কিন্তু হঠাৎ তিনকড়ি এসে' বল্‌ল, "মাসীমা, তোমার জন্যই পড়ে' আছি কম্বল বিছিয়ে'। বি-টি পাশ করেছি—বল্‌লেই তল্‌পা তল্‌পি বাঁধি।"

"আর দু'দিন থেকে যা—পূর্ণিমাতে গুরুদেব উপদেশ দেবেন। তা' ছাড়া দু'দশ জনকে নেমন্তন্নও কর্‌ব। দু'দিন থেকে গেলে ক্ষতি আর কি হবে?"

"ক্ষতি আর কি হবে! তবে মাসীমা, রাগ কর্‌বেন না—যদি থাকি, সে মাসীমা বল্‌ছেন বলে'—গুরুজীর কথা শুন্‌তে নয়"—এই বলে' সে চলে' গেল।

মা বল্‌লেন, "শুন্‌লি, কাদু! তোদের কর্ত্তাবাবুও লেখাপড়া শিখেছিলেন এদের চেয়ে কম নয়। কিন্তু সে যুগে তাঁরা চাইতেন সব কিছুকে বিশ্বাস কর্‌তে; আর এই জন্যই মন্দিরের দেবতা ছিল জাগ্রত, আর মানুষের মধ্যেও মহাপুরুষ দেখা দিতেন। এরা যে কি জিনিষ হারাচ্ছে, বুঝ্‌ছে না!"

গৃহিণী বিরক্ত হবেন, তাই কাদু মুখে কিছু বল্‌ল না; কিন্তু তার মোটেই ভাল লাগ্‌ছিল না—একজন বসে' বসে' খাবে, আর দশজন তার খিদমৎ খাট্‌বে। সে ঠোঁট্‌ উল্টে' চলে' গেল সেখান থেকে।

জ্যোৎস্না আড়ালে দাঁড়িয়ে কথাগুলি বোধ হয় শুন্‌ছিল কাণ পেতে'। সে এই প্রথম নাতিদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে' বল্‌ল, "মা, আমায় একবার নিয়ে চল না—গুরুজীর কাছে। আমার কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে।"

মা যেন হাতে স্বর্গ পেলেন; এই চাওয়াই তাঁর অন্তরে অন্তরে ছিল। কাশী থেকে ফিরে' এসে' তিনি সংসারে কি যেন একটা সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে, এইরূপ অনুভব কর্‌ছিলেন। জ্যোৎস্নার কথা শুনে' তিনি কাদুকে ডেকে' বলে' দিলেন, "দেখ্‌তো কাদু, হল-ঘরে এখন কারা আছে! যদি বাইরের লোক থাকে, বল্‌বি,—মেয়েরা আস্‌ছে, তাদের একটু উঠ্‌তে হবে।"

\

হল-ঘরের সোফা, কৌচ, বিলাতী ভাবের সাজ-গোজ সবই সরিয়ে' ফেলা হয়েছে। মেঝের উপর বিস্তৃত করে' গালিচার উপর পরিষ্কার

ফরাস পাতা; আর এক পাশে, পুরু গদীর উপর মৃগচর্ম্ম বিছিয়ে গুরুজী বসে' আছেন পদ্মাসন করে'। শাশুড়ী ও বধূ ঘরে গিয়ে' প্রবেশ কর্‌তেই, গুরুদেবের প্রসন্নদৃষ্টি তাদের নীরবেই কাছে এসে' বস্‌তে অনুজ্ঞা দিল। মা বল্‌লেন, "এই আমার রঞ্জনের বউ, আমি নিজের চোখে দেখে' ঘরে তুলেছি। বউমার কি জিজ্ঞাসা করার আছে। ডাক্তারেরা অনেক কথাই বলেন; কিন্তু আমার মনে হয়, রোগের প্রতিকার আপনার হাতেই আছে। তুমি ব'স, বউ মা—মহাপুরুষের কাছে কিছু গোপন ক'রো না। মনে যদি কোথাও কোন ব্যথা লেগে থাকে, খুলে' ব'লো; ওঁর দয়া হ'বে, কোন কষ্ট থাক্‌বে না।"

মা বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে তাড়াতাড়ি। মহাপুরুষ বয়ঃস্থ। মাথার চুলগুলি লতিয়ে' পড়েছে স্কন্ধে, চিবুকে; শ্মশ্রু-গুম্ফে বদনমণ্ডল আচ্ছন্ন। শুভ্রকান্তি, দৃষ্টি সমুজ্জ্বল। জ্যোৎস্নার মনে হ'ল—সন্ন্যাসী বল্‌তেই অধুনা ভণ্ডের কথাই মনে হয়, সম্ভবতঃ ইনি সে প্রকৃতির নন। তিনি জ্যোৎস্নার মুখের দিকে চেয়ে' হেসে' বল্‌লেন, "তোমার অসুখের কথা শুনে'ই তো তাড়াতাড়ি চলে' আসা। কিন্তু রোগীর কাছে তো আমি যাই না, মা—রোগীই আমার কাছে আসে। তুমি ইচ্ছা ক'রেই মনে তিলে তিলে আঁধার জমিয়ে তুলেছ, ঔষধে ইহার প্রতিকার নাই। মনকে শক্ত কর, সংশয় রেখো না—প্রফুল্ল হও।"

জ্যোৎস্না কথা শুনে' হতভম্ব হয়ে' গেল—তার মনে হ'ল, মহাপুরুষ নিশ্চয়ই অন্তর্য্যামী। কিন্তু নিজে একটু সতর্ক হয়ে বল্‌ল, "আপনি কি বল্‌ছেন, বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।"

তোমাকে এখন বোঝাতেও পার্‌ব না। রাজলক্ষ্মী তুমি, কিন্তু আকাশের সূর্য্যও রাহুগ্রস্ত হয়—খুব দুঃসময়. তোমার, বড় আশ্রয়ের দরকার। সে আশ্রয় স্বামী ভিন্ন আর কে হ'তে পারে?"

কথাগুলি ভাল—কিন্তু জ্যোৎস্নার মনে হ'ল, তার অবস্থার কথা যত সে গোপন করুক, যে কোন দিক্ দিয়েই হোক তা' প্রকাশ হয়ে' গেছে অনেকের কাছেই—মহাপুরুষ তারই প্রতিধ্বনি তুলেছেন। স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ নিয়ে' কেউ যে তাকে শিক্ষা দেবে, ইহা যেন তার কাছে অপমান বলে'ই বোধ হ'ল—সে তাড়াতাড়ি প্রণাম করে' উঠে' পড়্‌ছিল।

মহাপুরুষ বল্‌লেন, "আর একটু ব'স—দু'চারটী কথা শুনে' যাও। যে স্রোতঃ বয়েছে, যদি দৃঢ়ভাবে আশ্রয় ধরে' না থাক, বিপদের সম্ভাবনা আছে। আমি তোমাদের হিতকামী, এই সংসারে কল্যাণ কামনা করার আমার দাবী আছে। মনে ক'রো না—তাতে আমার স্বার্থ আছে, একবিন্দু। রঞ্জনের সাধু সন্ন্যাসীর উপর বিশ্বাস নেই; তোমারও না থাকা সঙ্গত; কিন্তু বুঝে দেখো, আমি যা' বল্‌ছি, তোমার মনেরই অবস্থার কথা, অসত্য বলে' অস্বীকার কর্‌তে পার না!"

জ্যোৎস্নার মন আরও বিষিয়ে' উঠ্‌ল। সে এই অযাচিত উপদেশ শুন্‌তে আসে নি। আর কথাগুলি এমনই সাধারণ, লেক্-রোড থেকে' ফিরে' আসার পরে', সে এমন অবস্থায় আছে, ভরসা পেলে তা' দেখে' বাড়ীর ঝি-চাকরও তাকে এমন উপদেশ দিতে পারে। কিন্তু রূঢ় আচরণ শোভন হবে না। কাজেই সে জোড়-করে নিবেদন জানাল, "আপনার কাছে নারীর কর্ত্তব্য কি, এমন কিছু সদুপদেশ শুন্‌তে এসেছি।"

মহাপুরুষ হেসে' উঠ্‌লেন হো-হো করে'; বল্‌লেন, "খুব বুদ্ধিমতী তুমি, আর ফাঁদেও পড়েছ বুদ্ধির চাতুরীতে। যাক্, সে কথা—উপদেশ শুনবে? মনে রেখো, নারীর কর্ত্তব্য, ভর্ত্তা যাতে শান্তি লাভ করে, সেইরূপ নীতি পালন করা। স্বামী যখন রিপু-পরতন্ত্র, অগ্নিমূর্ত্তি ধরে—নারীর ধর্ম্ম, তখন তাঁকে প্লাবিত করে' দেওয়া, জাহ্নবী-ধারায় অভিষিক্ত করে'। নারী সতত পরুষবাক্য সহ্য করবে, পুরুষের মুখে না প্রতিবাদের

উচ্চকণ্ঠ উঠে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে'। পতি-প্রতিকূলা নারীদের জীবনে সুখ নাই।"

জ্যোৎস্নার মনে হ'ল, কাণে আঙ্গুল দিয়ে' সে উঠে' পড়ে—এসব কথা তার অজানা নয়, কিন্তু গ্রন্থমধ্যেই এই সকল বাণী নিহিত থাকাই ভাল। জীবনের তাগিদে যে আচরণ ইচ্ছা-অনিচ্ছা সত্ত্বে প্রকাশিত হয়ে পড়ে, সে কথা তো কেহ লিখে রাখে না! জ্যোৎস্নার মন ভিন্নমুখী হয়ে' পড়্লেও, মহাপুরুষ হাসেন আর বলেন, "নারীরা যেরূপ মনোভাব-পরায়ণা হয়, পতিও তাহারা তাদৃশ লাভ করে। বিবাহ-কালে নারী পত্নীস্বরূপা। কিন্তু স্বামীকে ভরিয়ে' যদি সে তুল্‌তে না পারে, তার স্ত্রীত্বই ব্যর্থ হয়। নারীকে পতি ভরায় বলে'ই সে ভার্য্যা বটে, কিন্তু এই ভরণ হয় উভয় দিক্ থেকেই পরস্পরকে সার্থক করে'। এমন ভাবেই পতি নূতন করে' জন্ম নেয় পত্নীর মধ্যে—তাই সে জায়া। তারপর, পতিপরায়ণা নারী শোক-দুঃখ-মোহাদি মুছে' দিয়ে' পতিকে যখন শিবত্বে তুলে' দেয়, তখনই সে হয় কলত্র। আমি তোমায় যোগ্য পতির যোগ্যপত্নী হতেই বলি।"

এক খাম্‌চা বিষ গায়ে ছড়িয়ে' দিলেও এত যন্ত্রণা হয় না! তার বুকে হাতুড়ীর আঘাত পড়্‌তে লাগ্‌ল দুম্-দুম্ করে'। ব্যথায় কাতর হয়ে', যেন সে চীৎকার করে' বল্‌তে চায়—ওগো জানি, জানি, জানি! কিন্তু যে নিরুপায়া, নারীত্বের অঙ্কুর যার অকালে ঝল্‌সে' গেছে রৌদ্র-তাপে, তার বেদনা-বিধুর অন্তরের জন্য সান্ত্বনার কোন প্রলেপ আছে কি—মহাপুরুষের ঝুলিতে? পুরাণ-সংহিতার কথা শুন্‌তে এখানে আসি নি, এসেছি জান্‌তে—স্বেচ্ছায় হোক্, অনিচ্ছায় হোক্, নারীর অঙ্গ যদি কলুষিত হয়—ব্যভিচার-স্পর্শে—তার কি মুক্তি আছে, প্রায়শ্চিত্ত আছে?

জ্যোৎস্না একটু তীক্ষ্ণকণ্ঠে বল্‌ল, "শুধুই স্ত্রীর কর্ত্তব্য শুনে' শুনে' কাণ আমাদের ঝালা-পালা হয়ে' গেছে—আপনারা কি পতি-ধর্ম্ম প্রচার করেন না?"

"কিন্তু সে কথা তোমার কাছে বলা তো নিরর্থক, মা!"

"কেন? নারী বলে' বুঝি? কিন্তু সর্ব্বাগ্রে আমরাও মানুষ! পুরুষের মুখে নারীর ধর্ম্ম যেমন প্রচারিত হয়, নারীর কণ্ঠে পুরুষের ধর্ম্ম প্রচারিত না হবে কেন? পুরুষ জান্‌তে পারে, নারীর ধর্ম্ম কি; আর নারী জান্‌বে না বুঝি পুরুষের ধর্ম্ম?"

মহাপুরুষ একটু অপ্রতিভ হলেন—মনে মনে, জ্যোৎস্নার প্রশংসা করে'ই বল্‌লেন, "দৃষ্টি আমার ভুল নয়, সত্যই তুমি বুদ্ধিমতী। ভর্ত্তার ধর্ম্ম, স্ত্রীকে কোন অবস্থায় স্বাধীন-ভাবে অবস্থান কর্‌তে দিবে না।"

কথা শুনে'ই, জ্যোৎস্না উত্তেজিত কণ্ঠে বলে' উঠ্‌ল "কেন?"

"নারী কদাপি স্বাধীন অবস্থায় থাকার যোগ্য নয়, এই জন্য পতির সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ভার্য্যাকে রক্ষা করা; এই বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র অবহেলা সন্তাপের কারণ হয়।"

জ্যোৎস্নার বুক ছিঁড়ে', একটা উষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে' এল। কিন্তু কথাটা নারীত্বের অভিমানে বেজেছিল—সে প্রশ্ন তুল্‌ল, "কেন, বলুন দেখি, নারীকে পুরুষ এমন হীনচক্ষে দেখ্‌বে?"

"নারী যে স্বভাবতঃই চঞ্চলপ্রকৃতির। এইজন্য সৌন্দর্য্যের বিচার নাই—বয়স-বিশেষের বিচার নাই—স্বাধীন অবস্থায় যে সুযোগ ঘটে, নারীর চিত্ত পুরুষ-সন্দর্শনমাত্রে ব্যাভিচার করে' বসে।"

জ্যোৎস্না অস্থির হয়ে' উঠ্‌ল। তখন তার আর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান রইল না। সর্পের ন্যায় উন্নতফণা তুলে' সে বল্‌ল, "কোন্ যুগের কথা বল্‌ছেন আপনি—সে কোন যুগ? বিধাতা তাদের স্বভাবতঃ দুর্ব্বল

করে' গড়েছেন বলে' পুরুষ অবাধে অত্যাচার করেছে নারীর উপর—সেই আদিযুগের কথা আজ আর মাথা পেতে' নেবে না নারী—পৃথিবীর দায়েই সে দুর্ব্বলা, দেহের রক্ত দিয়ে তাকে সৃজন কর্‌তে হয়, দেহ তার ক্ষীণ, অসহায়া সে পৃথিবীর কল্যাণে। কিন্তু দেহটাই কি তার সবখানি? নারীর কি শক্ত মন নাই, দুর্জ্জয় হৃদয় নাই, প্রখর বুদ্ধি নাই? শরীরই গড়ে' তুলেছে তার অন্তঃকরণকে, না তার অনিন্দ্য দিব্য সুন্দর অন্তঃকরণই গড়ে' তুলেছে কল্যাণময়ী মূর্ত্তি—নারীর আকারে?"

মহাপুরুষ মৃদুহাস্যে জ্যোৎস্নার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে' রইলেন—তারপর স্থির হয়ে' বল্‌লেন, "একটা কথা, বউ-মা—ব্যসনরত দুর্জ্জনের সংসর্গ, ভর্ত্তৃবিরহ, স্বেচ্ছাভ্রমণ নারীকে কলুষিত করেই করে। ভর্ত্তা যদি এই সকল ক্ষেত্রে উদাসীন হয়—নারীর পতন সেখানে অবশ্যম্ভাবী।"

উদ্‌গ্রীব দৃষ্টিতে মহাপুরুষ জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে' রইলেন।

জ্যোৎস্নার হৃদয়ে যেন এককালে, শতসহস্র বৃশ্চিকের দংশন-জ্বালা অনুভূত হ'ল। উদ্ধত গর্ব্ব প্রচণ্ড আঘাতে কে যেন অবনত করে' দিল! বিচূর্ণ-ফণা সর্প-চৈতন্য, নিরুপায় হয়ে' যেমন ফুল্‌তে থাকে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে, তেমনই জ্যোৎস্নার সর্ব্বশরীর পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল শ্বাসে, শ্বাসে বাতাস নিয়ে'—বুক তার যেন এই মুহূর্ত্তেই ফেটে' যাবে চৌচির হয়ে'!

সে হিয়াখানি শূন্য করার জন্য সুগভীর নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে' করুণ-কণ্ঠে বলে' উঠ্‌ল, "মার্জ্জনা করবেন—কথার উপরে কথা কইছি। সে যুগের কথা জানা নেই—পুরাণসংহিতার সে মৃত বাণীর চেয়ে জাগ্রত জীবনবেদে এই কথাই স্পষ্ট হয়ে উঠে, যে কোন স্বাধীন অবস্থায় সুযোগের ফাঁকে নারীর চিত্ত হয় তো কোথাও কোথাও দুর্ব্বল হয়ে' পড়তে পারে। কিন্তু এই অবস্থায় বুঝি একজনও পুরুষ খুঁজে' পাবে না

না—যার পতনের সম্ভাবনা নাই। এখানে যুক্তি নাই, কোন উপদেশ নাই—এ যুগের এই সত্য দর্শন, সংহিতায়, পুরাণে পুরুষ যদি সঙ্কলন করে' না যায়, নারীজগৎ উদাসীন থাক্‌বে না এই সব-চেয়ে বড় সত্যটাকে লেখনীগত করে' যেতে।"

মহাপুরুষ তেমনই মৃদু হাস্যে বল্‌লেন, "আমি সন্তুষ্ট হলাম তোমার কথায়। কিন্তু সে যুগের এ যুগের, কথা নয়—ঋষিবচন মিথ্যা নয়, মা; বিধাতা সৃষ্টি করেছেন নারীকে যেরূপ স্বভাব দিয়ে, তাতে সততই তাকে আশ্রয় নিতে হবে পুরুষকে আড়াল করে'। কাম, ক্রোধ, পরহিংসা, কৌটিল্য পুরুষকেও কাপুরুষ করে। নারীর স্বৈরাচার-পরায়ণতায় নারী নিজেও সাবধান হবে, পিতা, ভর্ত্তা, পুত্রও তাকে সতত রক্ষা কর্‌বে—নানাকাজে গৃহস্থালীর পর্য্যবেক্ষণে।"

জ্যোৎস্নার চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল অন্তর্বিপ্লবে; কথা বাড়াবার আর তার ইচ্ছা হ'ল না। হাত বাড়িয়ে মহাপুরুষের চরণ-ধূলি নিতে নিতে, মৃদু-ম্লান হাসি-মুখে সে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "ভর্ত্তার ব্যভিচারে পত্নী যখন স্নেহলাভে বঞ্চিতা হয়, তখন তার ব্যভিচার কোথাও যদি স্বাভাবিক না হয়ে', এমন কি মন কলুষিত না হয়ে'ও যদি দৈবক্রমে অঘটন সংঘটিত হয়, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নারী করবে—না ব্যভিচারী পুরুষকে কর্‌তে হবে? এই প্রশ্নের উত্তর আপনি দেবেন কি?"

যেন একটা গভীর রহস্যের যবনিকা সরে' গেল সন্ন্যাসীর দৃষ্টির সাম্‌নে থেকে। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বল্‌লেন, "দেখ মা, বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে নারীকে যে অধিকার দেওয়া হয় নি হিন্দুধর্ম্মে—তার মানেই নারী হীন, অপদার্থ। তার এই হীনতা থেকে মুক্তি নির্ভর করে পুরুষের হাতে। অন্ধকার মৃত্তিকা-গর্ত্ত থেকে জহুরীর হাতেই হীরার যেমন আদর বাড়ে, তেমনই পুরুষই নারীকে তুল্‌তে পারে, দৈন্য থেকে, অপদার্থতা থেকে।

নারীর স্বেচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত, যে অবস্থায় হোক, যদি পবিত্রতা নষ্ট হয় কোন কারণে, বিনা প্রায়শ্চিত্তে তার শোধন হয় না কোন কালে। প্রজ্জ্বলিত আগুনে যে স্বেচ্ছায় অঙ্গুলি প্রদান করে, আর অনিচ্ছায় যার অঙ্গুলি পড়ে, উভয়েরই হাত অগ্নি দগ্ধ কর্‌তে ছাড়ে না। পাপসংস্পর্শ ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তুলা বলে'ই জেনো।"

"বেশ, এই কথাই শিরোধার্য্য করে' নিলাম"—

হঠাৎ তার সমস্যার যেন অন্ত হয়ে গেল এই অবস্থায়। জ্যোৎস্নার ম্লান অবনত দৃষ্টি উত্তেজনায় প্রোজ্জ্বল হয়ে' উঠ্‌ল। সে দ্রুতপদে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে' গেল।

মা বসে' আছেন সোফায়, ছেলে মেঝের উপর বসে' মায়ের সঙ্গে কথা কইছিল। জ্যোৎস্না সদম্ভে ঘরে এসে' ঢুক্‌ল। মা ও ছেলে দু'জনেই বিস্মিত হয়ে' গেল, জ্যোৎস্নাকে দেখে'—কেন না, এই ক'দিন সে মলিন সরমের প্রলেপ তাকে বিবর্ণ ও বিশীর্ণ করে' তুলেছিল, অকস্মাৎ তা' যেন ধুয়ে' মুছে' গেছে ; ফুটে' উঠেছে, অপরিসীম দীপ্তি তার মুখে, চোখে, সর্ব্বাঙ্গে! মায়ের মন প্রফুল্ল হয়ে' উঠ্‌ল। তিনি হেসে বল্‌লেন, "মহাপুরুষের সঙ্গে অনেক কথাই কয়ে' এসেছ, দেখ্‌ছি। আমি বল্‌ছি কি জান, বউমা, মনটা তোমাদের দু'জনেরই দেখ্‌ছি ভেঙ্গে' পড়েছে, যেন দু'জনেই মন-মরা হয়ে পড়েছ, কি জানি কি কারণে—যাই হোক্, রঞ্জনকে বল্‌ছি, দিন কতক তোমায় নিয়ে ঘুরে' আসুক পশ্চিমে। কি বল ?"

শ্বশ্রূঠাকুরাণীর কথায় সস্মিতদৃষ্টি নিক্ষেপ করে' বহুদিন পরে সে বিনা-বাক্যে পালঙের তলা থেকে ফুল-ঝাঁটা বা'র করে' ঘরের এক প্রান্ত থেকে ঝাঁট দেওয়া আরম্ভ করে' দিল। মা হেসে' বলে' চলে

গেলেন, "বেটী আমার পাগলী, তাড়াতাড়ি ঝাঁট দেওয়ার তাগিদ পড়ে' গেল!"

রঞ্জন জ্যোৎস্নার প্রফুল্ল-মূর্ত্তি দেখে' ভরসা পেয়েছিল মনে। সে উঠে' গিয়ে' জ্যোৎস্নার কব্জী ধরে' ঝাঁটা-গাছটা কেড়ে' নিল জোর করে'ই, বল্‌ল, "খুব কাজের লোক তুমি তা' আমি জানি; পুরীর পর এই আর একটা সুযোগ পাব—শুধু তুমি আর আমি। কোথায় যাবে?"

"যমের বাড়ী!"

মেঘ কাটে নি। চক্‌সা দেখে মা ও ছেলের মনে আশা হয়েছিল—কিন্তু জ্যোৎস্নার মুখ অন্ধকারময় গম্ভীর। রঞ্জন তবুও তার হাত ধরে' ঘরের মধ্যখানে টেনে' আন্‌ছিল - জ্যোৎস্না খুব বিরক্ত হয়ে' বল্‌ল, "ছেড়ে' দাও হাত, তুমি আমায় ছুঁয়ো না—"

"কেন? কি অপরাধ করেছি আমি; কোথাও তো তোমায় বাধা দিই নি, জ্যোৎস্না! আমায় সিনেমা দেখ্‌তে যেতে বলেছিলে তোমার সঙ্গে—কাজ ছিল তখন অনেক, তাই যাই নি। কিন্তু তবুও তাড়াতাড়ি ছুটেছিলাম শেষে, তুমি রাগ কর্‌বে বলে', পিক্‌চার হাউসের দোর পর্য্যন্ত —মনে আছে তোমার?"

'তারপর!'—

"তারপর আজ এই দশ পনের দিন, তোমার মুখে হাসি দেখি নি, কথা শুনি নি—ভাদ্দরের ভরা গুমোটের মত দম আট্‌কে' যায়—এক ঝলক বাতাস পাই নি বুক-ভরা নিঃশ্বাস নিতে। যাক্ সে কথা। যদি এই জন্যই তোমার রাগ হয়ে' থাকে, এমন একটা কিছু বল, যা' কর্‌লে মান-ভঙ্গ হয়।"

কান্না কেমন করে' সে রোধ কর্‌বে এই অবস্থায়! স্বামীর অপরাধ পাল্লার একদিকে চাপিয়ে' আত্মাপরাধ ওজন কর্‌তে গিয়ে সে আজ ঝুঁকে

পড়েছে মাটীর দিকে, গুরু ওজনের চাপে। কি উত্তর দিবে সে—পায়ের তলা থেকে ঘরের মেঝে যদি ভেঙ্গে' পড়ে নীচের দিকে', সে বুঝি তবু রক্ষা পায় রঞ্জনের এই করুণ অনুনয়ের হাত থেকে! সে একান্ত অস্বাভাবিক কণ্ঠে, দাঁতে-দাঁতে চেপে' বলে' উঠ্‌ল, "যাও, যাও, হয় আমায় নজর-ছাড়া করো, নয় তুমি মর, আমি মুক্তি পাই জীবনের মত।"

কই এমন কথা তো কোনদিন জ্যোৎস্নার মুখ দিয়ে' বাহির হয় নি—কি হ'ল তার! জ্যোৎস্নাও স্পষ্ট দেখ্‌ল, তার চক্ষু দিয়ে' জল গড়িয়ে' পড়্‌ছে অজস্রধারে—সে চলে' গেল মাথা নামিয়ে', ধীর পদে, ঘর ছেড়ে'।

মধ্যরাত্রি। রঞ্জন শুয়ে' আছে খাটের উপর। সমুন্নত বক্ষ দুলে' উঠ্‌ছে নিঃশ্বাসের তালে তালে। ঘরের কোণে অপর একটা ছোট খাটের উপর জ্যোৎস্না প্রতি রাত্রেই আশ্রয় নেয়—আজ সে উঠে' এসেছে বিকারগ্রস্ত রোগীর মত কি একটা কাণ্ড বাধাবে বলে'। সুইচ্‌ খুলে' দিয়ে' সে অনিমেষ নয়নে অনেক ক্ষণ চেয়ে' রইল স্বামীর দিকে। রূপের তুলনা নাই—দেবতার ন্যায় কান্তিমান্‌—যেন স্বয়ং কামদেব, রতি-কামনায় স্তিমিত-নেত্র! মৃত্যু হয় না দেখ্‌তে দেখ্‌তে! বিষ খেলে হয় না! ঐ খাটের পাশে ফ্যানের হোল্ডে, গলায় দড়ি দিয়ে ঝুল্‌লে হয় না? না—সে প্রাণহীন দেহটাকে নিয়ে' অনেক ছোঁয়াছুঁয়ি হবে—কি জানি, হয় তো সে ঘুম ভেঙ্গে' মৃতদেহটাকেই বুকে নিয়ে কলঙ্কিত হবে! ভাব্‌তে ভাব্‌তে মাথার শিরাগুলি স্ফীত হয়ে' উঠ্‌ল—ঘাড়ের শিরাগুলি এমনই ব্যথিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, যেন মনে হ'ল, সে শিরোহীন কবন্ধের মত একটা বিকট প্রেতিনী। চক্ষে আলো শূলের মত বিদ্ধ হ'তে লাগ্‌ল; তাড়াতাড়ি সুইচ্‌ বন্ধ করে' দিয়ে' সে বারান্দায় এসে' দেখ্‌ল—নিশুত রাত্রি, নিস্তব্ধ রাজ-নগরী। ধীর পদসঞ্চারে সে মায়ের ঘরের সামনে

এসে' দাঁড়াল। তন্দ্রাতুরা পুরী। সে আরও এগিয়ে গেল—পাশেই তিনকড়ির ঘর, দুয়ার খোলা, কক্ষ অন্ধকারময়। জ্যোৎস্না ত্বরিৎপদে ঘরে ঢুকে' পড়ল। বীভৎস উত্তেজনায় সুইচ্ খুলে' দিতেই তিনকড়ি সবিস্ময়ে চেয়ে' দেখ্ল—সম্মুখে বিভীষণা, উন্মাদিনী জ্যোৎস্না—বিশৃঙ্খল কেশপাশ; নয়ন আরক্ত ঘূর্ণ্যমান, স্ফুরিত অধর এখনই যেন বাণী উচ্চারণ কর্‌বে। সত্যই তাই!

জ্যোৎস্না বল্‌ল, "ওঠ, চল।"

ধড়্মড়িয়ে তিনকড়ি উঠে' বস্‌ল—উত্তর দিল, "কোথায়? তুমি কেন এত রাত্রে এখানে?" তার সন্ত্রস্ত দৃষ্টি বারান্দায় গিয়ে' পড়ল—ঘরের আলো সেখানে ছড়িয়ে পড়েছে, অবাধে এলিয়ে।

"কোথায়? যমের বাড়ী। ভয় হচ্ছে? দরজার দিকে ঘন-ঘন তাকাচ্ছ যে, দরজা বন্ধ করে' দোব—চোর, ধূর্ত্ত..."

তিনকড়ি এই অভাবনীয় ঘটনায় এক মুহূর্ত্ত বিচলিত হয়ে' পড়েছিল; হঠাৎ যেন দেখ্ল—বারান্দায় এক অস্পষ্ট পুরুষ-মূর্ত্তি! নিশ্চয়ই দাদাও এসেছে সঙ্গে সঙ্গে। সে নিজেকে তবুও প্রকৃতিস্থ করে' বল্‌ল, "অযথা তিরস্কার কর্‌ছ, তোমার এই আচরণ কুল-বধূর নয়"—যেমন করে' পড়ার টেবিলে বসে' তার মুখে শাসন-বাণী বাহির হ'ত কৃত্রিম দম্ভে, ঠিক তেমনি করে'ই এই কথাগুলো সে মাষ্টারী ঢঙে উচ্চারণ কর্‌ল।

জ্যোৎস্না হঠাৎ মৃদুহাস্যে বলে' উঠল, "ঠাকুর-পো, ভয় নেই কিছু; আজ আমি এসেছি স্বেচ্ছায় তোমার কাছে—রূপ যেচে' দিতে নয়, বাড়ী ছেড়ে' পালাতে চাই।"

তারপর হঠাৎ তার চক্ষু ঝাপ্সা হয়ে এল—করুণ মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে, হাত দু'টী জোড় করে' সে বল্‌ল, "দয়া করে' একটা উপকার কর—

আমায় কোথাও নিয়ে' চল—আমি এক মুহূর্ত্ত এ বাড়ীতে তেষ্ঠাতে পারছি না!"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ। মলিনতার ছায়ামাত্র নাই—নির্ভীকতার ভাস্বর মূর্ত্তি! কিন্তু এই নীরব রাত্রি—ঘরের আলোয় চারিদিক্ ছেয়ে' গেছে! জ্যোৎস্নার কণ্ঠে উচ্চকিত কাতর উক্তি, পাশেই মাসী-মা আছেন শুয়ে'—সে তো চক্ষের ভ্রম, কিন্তু দাদাও এ দৃশ্য দেখ্‌লে কি মনে কর্‌বে! তিনকড়ি এগিয়ে' গেল দরজার দিকে।

জ্যোৎস্না কাতর বচনে বার বার কেবলই এই অনুনয় জানাতে লাগ্‌ল, "ওগো আমায় নিয়ে চল এ বাড়ীর ত্রিসীমানা ছাড়িয়ে'—আমার মরা দেহটাও যেন এদের চক্ষে না পড়ে—এমনই একটা উপকার কর, ভাল হবে তোমার—"

জ্যোৎস্না বুঝ্‌তে পারে নি—তিনকড়ির সঙ্গে সঙ্গে সে এসে' পড়েছে ঘরের বাইরে বারান্দায়; হঠাৎ তার চমক হ'ল। তিনকড়ি চাতুরী করে' জ্যোৎস্নাকে বাহিরে এনে'ই, তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে' দরজা বন্ধ করে' দিল ঝনাৎ করে'।

জ্যোৎস্না মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হয়ে' সেখানে দাঁড়িয়ে' রইল। আবার মন ফিরে' এল তার লুপ্ত চৈতন্য—সে এ বাড়ীর কর্ত্রী না! অপদার্থ—কিসের দৈন্য তার, কি সে করেছে, কালই লাথী মেরে' সে তাড়িয়ে' দেবে এই ধূর্ত্ত প্রবঞ্চককে!

স্বপ্নের মত কি যেন হয়ে' গেল এক নিমিষে! কিন্তু স্বপ্ন নয়, সে দাঁড়িয়ে আছে তিনকড়ির শয়ন-গৃহের রুদ্ধ দুয়ারের সম্মুখে। প্রশস্ত দীর্ঘ বারান্দায়, ঘন অন্ধকার ঢেউ খেলিয়ে' যাচ্ছে অধিকতর ঘনিমায়। বাতাস মিশে' গেছে অন্ধকারে জমাট হয়ে'।

"জ্যোৎস্না!"

ত্রস্তা, চকিতা জ্যোৎস্না বলে' উঠ্‌ল, "কে তুমি ?"

"আমি, আমি নিধু—"

আঁচলে চোখ-দুটো ভাল করে' মুছ্‌তেই, সেই অন্ধকারে প্রেত-মূর্ত্তির মত, একটী মনুষ্যমূর্ত্তি তার চোখে পড়্‌ল।

"তুমি কোথায় ছিলে এতদিন ?"

"কিন্তু ফিরে' যেতে হ'ল, জ্যোৎস্না। সদ্য জেল থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম—আশ্রয় নিতে, তোমারই কাছে !"

—"এত রাত্রে !"

"দুর্ভাগ্য আমার ! সে কথা আর নয়, চল্লুম—আমি পুরুষ, চোর, ফেরার আসামী, আর তুমি ব্যভিচারিণী না ? কলঙ্কিনী—বংশের কালী, তোমার সংস্রবে আমার মত পাপীও লজ্জা পায় ! চল্লুম।"

অন্ধকারে মিলিয়ে' গেল প্রেতের মতই সে মূর্ত্তি ; কিন্তু নিঃসংশয়ে সে তার ভাই নিধিরাম ছাড়া আর কেউ নয়। জ্যোৎস্না ধুঁকৃতে ধুঁকৃতে আবার তার ঘরে এসে' ঢুক্‌ল। অন্ধকারে সে হাঁফিয়ে' উঠেছিল—স্থইচ্ টা প'রে দেখ্‌ল, বিছানা শূন্য ! কিন্তু যে দুয়ার দিয়ে সে ঘরে প্রবেশ করেছিল, সেই মুক্ত দ্বারেই দাঁড়িয়ে' আছে ম্লান-মুখে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে চেয়ে' তার স্বামী বঙ্কন।

—আট—

সকালে তিনকড়ির আর টিকি দেখা গেল না; সে ভোরে উঠে'ই পালিয়েছে তল্পি-তল্পা বেঁধে'। তার এই প্রস্থান-পর্ব্বটা সকলের চক্ষেই খুব অস্বাভাবিক বলে' মনে হ'ল; বিশেষতঃ, তার মাসীমা ব্যথিত হয়ে বল্‌লেন, "এক গাছের ছাল অন্য গাছে লাগে না, তিনুর আক্কেল দেখ্‌লি, কাদু? কাজ সারা হ'ল, আমায় না জানিয়েই সে চম্পট দিলে!"

কাদু ঠোঁট উল্টে' বল্‌ল, "এ যে কলিকাল, মা! যে ডালে বসে, সেই ডালেই কোপ্ দেয়। এমন লোকের ভাল হবে না—তা' আমি বলে' দিচ্ছি।"

"ষাট্ ষাট্, ওকি কথা তোর মুখে, কাদু? যেমন রঞ্জন, তেমনই তিনু। মার জন্যে মন কেমন কর্‌ছে, ক'দিন ধরে'ই বল্‌ছে—মাসীর টানাটানি কাজেই তাকে ছিঁড়্‌তে হয়েছে।"

খবরটা রঞ্জনের কাণে গিয়েও পৌছল। সে কিছুতেই ভেবে' স্থির ক'র্‌তে পারে না, তিনুর এইরূপ আচরণের কারণ কি হ'তে পারে! অনেক বার ইচ্ছা হ'ল, জ্যোৎস্নাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, অত রাত্রে সে তিনুর ঘরে কি প্রয়োজনে গিয়েছিল। কিন্তু এতখানি বেলা হ'ল, জ্যোৎস্না বিছানা ছেড়ে' এখনও উঠে নি। কথাটা আর জিজ্ঞাসা করা হ'ল না। সে একপ্রকার মনে মনে স্থির করে'ই নিল, তিনকড়ির এই অকস্মাৎ প্রস্থানের মূলে জ্যোৎস্নারও হাত আছে। আর সে কথা জ্যোৎস্নাকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা—কেন না, জ্যোৎস্না যখন তার কাছে গোপন করেছে, তখন এ কথা গোপন করে'ই সে রাখ্‌বে।

জ্যোৎস্নার প্রতি সংশয়ের কষাঘাতে সে এই প্রথম অবসন্ন হয়ে প'ড়ল। ভেবে' কুল-কিনারা পাওয়া যায় না, তিনকড়ির সঙ্গে জ্যোৎস্নার

রহস্যময় সম্বন্ধ কি এমন থাক্‌তে পারে, যার জন্য সে তাকে গোপন ক'রবে! আর তাই যদি নাই হবে—তবে সে গভীর নিশীথে তার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হবে কেন? যতই তোলাপাড়া করে, মনের উপর ছায়াপাতই অধিক হয়। শেষে এই কথাই সে স্থির করে' নিল—জ্যোৎস্না যে কোন কারণেই হোক, তিনকড়িকে বাড়ীছাড়া করেছে। তিনকড়ির উপর জ্যোৎস্নার ভাল নজরও ছিল না, অনেক কথায় ও ঘটনায় সে তা' বার বার লক্ষ্য করেছে। তিনকড়ি জ্যোৎস্নার হুকুমেই বাড়ীছাড়া—কিন্তু এ নিষ্ঠুর দাবী জ্যোৎস্নার পক্ষে শুধু অসঙ্গত নয়, অস্বাভাবিকও বটে! সময়ে হয়তো এই প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যাবে। জ্যোৎস্নার কাছ থেকেই সে উত্তর আস্‌বে। এই বিষয় নিয়ে অধিক আন্দোলন না করাই শ্রেয়ঃ। বাড়ী ছেড়ে' সে বেরিয়ে গেল। মাথাটা ভারী হয়ে উঠেছিল।

মায়ের কাছে খবর এল—গুরুজীও চলে' যাচ্ছেন। তাড়াতাড়ি গলায় কাপড় দিয়ে তিনি স্কুল-ঘরে গিয়ে দেখেন, শিষ্যেরা আসন গুটিয়ে বাঁধছে, আর গুরুদেব খড়খড়ির ধারে দাঁড়িয়ে পথের উপর দিয়ে লোক-চলাচল নিবিষ্টচিত্তে নিরীক্ষণ কর্‌ছেন। ঘরের দিকে তাঁর দৃষ্টি ফের্‌তেই, মা ভূ-নত হয়ে প্রণাম কর্‌লেন। শঙ্কা-জড়িত কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "হঠাৎ এ কি ব্যবস্থা, আজই চলে' যাওয়ার তাড়া—কালও তো জান্‌তে পারি নি! আমি যে পূর্ণিমায় গুরু-পূজার উৎসব আয়োজন করেছি!"

সন্ন্যাসী হেসে' ব'ললেন, "ডাক এল মা; কাজেই ছুট্‌তে হ'ল। তোমার ডাকে হাজির হয়েছিলাম, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। দরকার পড়লে, আবার আস্‌ব। এ বন্ধন জন্মজন্মান্তরের, মরণেও মুক্তি নেই। আড়াই দণ্ড কালের মধ্যেই বাহির হ'তে হবে; তা' না হ'লে, সম্মুখে

যোগিনী প'ড়বে। কোথাও যখন পা বাড়াই, শুভযাত্রা ক'রতে হয়। নিজের কল্যাণের জন্য নয়—যারা আশ্রয় নিয়েছে, তাদের মঙ্গলের জন্যই আমার এই বাঁধন।"

মা অবাক্ হয়ে সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চেয়ে' রইলেন। তিনি ব'ললেন, "পাপ বিদায় হয়েছে, মা—কিন্তু পাপের চাইতে পাপের জের ভোগ হয় অতি কষ্টে। কিছুদিনের জন্যে দূরেই যাচ্ছি—ভিতরে যেদিন প্রয়োজন অনুভব হবে, এসে' হাজির হ'ব।"

সন্ন্যাসী মায়ের অনুরোধে উপরোধে কাণ দিলেন না—স্মিত-মুখে গৃহিণীকে আশীর্ব্বাদ করে' সশিষ্য প্রস্থান ক'রলেন।

কি একটা অনাগত বিপদের আশঙ্কায় মার প্রাণ কেঁপে' কেঁপে' উঠ্ছিল। এই কয় দিন তাঁর বাড়ী হয়ে উঠেছিল যেন উৎসবময়। বিগ্রহশূন্য মন্দিরের মত বাড়ী এখন যেন খাঁ-খাঁ ক'রতে লা'গ্ল। উপরে উঠে' দে'খ্লেন, তিনকড়ির ঘর শূন্য। তাড়াতাড়ি রঞ্জনের পড়ার ঘরে ঢুকে' দে'খ্লেন—জিনিষ-পত্তর অগুছান অবস্থায় ছড়িয়ে আছে; চতুর্দ্দিকে অলক্ষ্মীর পদসঞ্চারে তাঁর হৃদয় ঘন-ঘন কেঁপে' উঠ্ছিল।

আজ অধীর হয়েই তিনি ছুটে' গেলেন রঞ্জনের শয়ন-গৃহের দরজায়—দে'খলেন, ভিতর থেকে দোর বন্ধ। বেলা অনেক হয়েছে। ঘরের লক্ষ্মীর এখনও বিছানায় পড়ে' থাকা তো ভাল কথা নয়। দোরে করাঘাত করার সঙ্গে তিনি মৃদুকণ্ঠে ডাক দিলেন, "বৌমা!" সাড়া নেই! তিনি অস্থিরচিত্তে ফিরে' আস্ছিলেন তাঁর ঠাকুর-ঘরে, হঠাৎ বন্ধ দুয়ার খুলে' গেল সশব্দে। তিনি মুখ ফিরিয়ে ঘরের দিকে তাকাতেই দে'খলেন জ্যোৎস্নার বিকৃত মূর্ত্তি।

"একি দশা হয়েছে তোমার? সাধু পুরুষ বাড়ী ছেড়ে' পালা'লেন—সত্যই দে'খছি ভূতের উপদ্রব!"

জ্যোৎস্নার মেঘের মত কালো-চুলের রাশি ঘরময় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। বিবর্ণ মুখ। কেশ কর্ত্তিত, সম্মুখে মুখের উপর গুচ্ছে গুচ্ছে আধ-ছাঁটা চুলগুলি ঝুল্‌ছে। সীমন্তদেশ সিন্দুর-শূন্য। একি রঞ্জনের গৃহলক্ষ্মী জ্যোৎস্না! মায়ের বুক বিদীর্ণ হয়ে' গেল। তাঁর রুদ্ধকণ্ঠে একটীও শব্দ উচ্চারিত হ'ল না। তিনি সেইখানেই বসে' প'ড়লেন—পা দুটো যেন কে ভেঙ্গে' দিল লাঠী মেরে'।

বাড়ীতে হৈ-চৈ পড়ে' গেল। নিশ্চিন্ত, নির্ব্বাক্ জ্যোৎস্না। তার কুণ্ঠা নাই, লজ্জা নাই; সে মায়ের কাছে বসে' রইল অনেক ক্ষণ। বাড়ীর গৃহলক্ষ্মীর এই অদ্ভুত বেশ দর্শন করে' ভৃত্য-দাসী মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রতে লা'গ্‌ল। মুখে কারও কথা নাই—কাজে কারও গা নড়ে না। এ দৃশ্য শোকদৃশ্য নহে; কিন্তু বধূ-ঠাকুরাণীর দিকে চেয়ে' কেউ আর অশ্রু সংবরণ ক'রতে পা'রল না।

মা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "একি করেছ? তুমি কি পাগল?"

জ্যোৎস্নার মুখে মলিন মৃদু-হাস্য দেখা গেল। মায়ের পায়ে হাত দু'খানা রেখে' সে ব'ল্‌ল, "তোমার পায়ে পড়ি মা, এই অলক্ষ্মীকে বিদায় করে' দাও! বড় সাধ করে' ঘরে এনেছিলে, মায়ের চেয়ে অধিক স্নেহ; অধিক ভালবাসা পেয়েছিলাম—আমি হতভাগিনী, এ স্বর্গ আমার ভাগ্যে নাই—দাও মা হতভাগিনীকে বিদায় করে'!"

মা পুত্রবধুর দিকে চেয়ে' দে'খ্‌লেন—কলঙ্কহীন শুভ্র চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় মুখশ্রী—অকপট চোখের আলোয় দশ দিক্ ঝলসে' যায়। কি দুর্গ্রহে সোণার প্রতিমা আজ আত্মঘাতীর পথে? হঠাৎ মনে হ'ল তিনকড়ির আকস্মিক প্রস্থানের কথা—কে জানে এই ঘটনার সঙ্গে লক্ষ্মীছাড়ার কোন সম্বন্ধ আছে কি না? কিন্তু সর্ব্বশরীর শিউরে' উঠল—ছিঃ ছিঃ, এমন কুৎসিৎ কথা মনে হওয়ার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

মা বাহুবেষ্টনে জ্যোৎস্নাকে বুকে নিয়ে ব'ল্‌লেন, "কেন মা, কিসের দুঃখ তোমার! আমি যে নিজের চক্ষে দেখে', তোমায় বরণ করে' ঘরে তুলেছি। রঞ্জনের অকল্যাণ-সৃষ্টির একবিন্দু বিষ যদি মায়ের প্রাণে সঞ্চিত থাকে, এ জীবন যে আমারই ত্যাগ করা উচিত!"

জ্যোৎস্না মায়ের বাহু-বন্ধন ছাড়িয়ে সোজা হয়ে বসে' ব'ল্‌ল, "তুমি ভগবতী! বিশ্বাস কর কি মা—এই হতভাগা কন্যাকে সতী বলে'? বিশ্বাস কর কি মা—তোমার দৃষ্টি অভ্রান্ত? তোমার সন্তানের অকল্যাণ আমা হ'তে হওয়ার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নেই? বল মা—"জ্যোৎস্নার চক্ষে উষ্ণ জলধারা প্রাবৃটের বর্ষণের ন্যায় গড়িয়ে প'ড়তে লা'গল।

মা উঠে' দাঁড়া'লেন—জ্যোৎস্নার মাথায় হাত দিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে, কিন্তু বুকের সবখানি জোর দিয়ে' বলে' উ'ঠ্‌লেন, "বৌমা, গ্রহদোষে আজ তোমার মন পাগল হয়েছে। আমার বিশ্বাস ম'লেও যাবে না—তুমি সতীলক্ষ্মী, রঞ্জনের কল্যাণময়ী, জীবন্তপ্রতিমা। আজ তোমায় দেখে' ব্যথায় বুক ভরে' যায়—কিন্তু আমার আশীর্ব্বাদ কোনমতে ব্যর্থ হবে না।"

কিছু দূরে দাস-দাসীরা জটলা পাকিয়ে' অনুচ্চ কণ্ঠে আন্দোলন সুরু ক'রছিল। মা তাদের দিকে চেয়ে' এক ধমক্ দিয়ে ব'ললেন, "কি হচ্ছে সব দাঁড়িয়ে, কাজ-কর্ম্ম চুলোয় গেছে বুঝি?"

যার হাতে ঝাঁটা ছিল, যন্ত্র-চালিতের মত বারান্দার প্রান্ত থেকে সে ঝাঁট দিতে সুরু ক'র্‌ল। সুশীলা ঘড়া কাঁকে কি ব'লতে 'হাঁ' করেছিল—কথা আর বেরুল না, সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে' গেল এক নিমিষে। রাত্রিবাস কাপড়-চোপড় নিয়ে কাহু কল-তলায় গিয়ে হাজির হ'ল মুখ ভারী করে'। হঠাৎ বাতাস বন্ধ হ'লে বিশ্ব জুড়ে' যে গুমোট জমে' উঠে তা' যেমন এক ঝট্‌কা দক্ষিণে বাতাসে দূর হয়ে যায়, মায়ের

হুম্‌কি শুনে' বাড়ীর থমকান ভাব ভেঙ্গে' গেল এক মুহূর্ত্তে—সব দিকেই প্রকৃতিস্থ ভাব, যেন কোন আকস্মিক ঘটনায় কেহই স্তম্ভিত হয় নি কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে।

জ্যোৎস্না মায়ের আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হ'তে দিবে না। মাথার কেশ আবার শোভা হয়ে' দেখা দেবে। তার দুর্ভাবনা রইল তবুও, স্বামীর মনে যে ব্যথার আঁচড় কাল রাত্রে সে দিয়েছে, তার দাগ সে মুছে' দিতে পা'রবে কি না!

রাত্রির ঘটনার পর সকালে উঠে'ই সে ভেবেছিল—এ প্রাণ সে বা'র ক'রে' দেবে অনায়াসে; কিন্তু মরণের ডাক না এলে মরার সাধ সফল হয় না—মরার পথে এক পা'ও এগোতে পারা যায় না। তার মরণের সময় এখন নয়, প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে হবে বড় নিষ্ঠুর, নির্ম্মম হয়ে। যে রূপ দেখে' পতঙ্গ ঝাঁপ দিতে চায় তার বুকে, রেখে যায় মলিন অঙ্গের কলঙ্ক-চিহ্ন, তা' যদি মুছে ফেলা সম্ভব না হয়, রূপের সহচরী যারা তাদেরই বিদায় দিতে হবে। তাই সে বিছানা ছেড়ে', কাঁচি দিয়ে চুলগুলো কেটে' বাদ দিল তাড়াতাড়ি; তারপর নিটোল গোলাপী গণ্ড তীক্ষ্ণ ছুরীর ফলায় খণ্ড খণ্ড ক'রতে যাচ্ছিল—এমন সময়ে বদ্ধ দুয়ারে করুণাময়ী মায়ের কথায় ভরসা পেয়ে' এইবার সে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কৃষ্ণ কেশ-গুচ্ছ তুলে' নিয়ে' অনিমিষ নয়নে সেইগুলির দিকে চেয়ে' হা'সতে লা'গ্‌ল—না জানি, কেশের অভাবে এই রূপের কান্না, তার প্রতিধ্বনি স্বামীর কাছ থেকে কি ভাবে আ'সবে! সে আজ একটা কৌতূহল-সৃষ্টির কৌতুক-মূর্ত্তি। আর্সীর কাছে গিয়ে মুখ দেখার আর তার ভরসা হ'ল না—চোখ বুজে' সে দাঁড়িয়ে রইল প্রস্তর-মূর্ত্তির মত। কাণে বা'জ্‌ল কার পদ-শব্দ; ফিরে'ই যার সঙ্গে চোখা-চোখি, সেইখানেই ছিল সকল ভয় একত্র ঘনীভূত হয়ে।

ভরসা জড় করে' সে নির্ভয়েই চেয়ে' রইল তার দিকে। ব্যথা-বিজড়িত কণ্ঠে বিস্ময়-বিহ্বল রঞ্জন অস্ফুটস্বরে ব'ল্‌ল, "একি করেছ, জ্যোৎস্না?"

খুব গম্ভীর-স্বরে, বিস্ফারিত নেত্রে রঞ্জনের মুখের দিকে চেয়ে' জ্যোৎস্না উত্তর দিল, "প্রায়শ্চিত্ত!"

বজ্রাহতের ন্যায় রঞ্জন বিশীর্ণ-মূর্ত্তি হ'য়ে গেল—কথার উত্তরে। যেন তার আর কোন কথা বলার প্রয়োজন নেই! সে ফিরে'ই যাচ্ছিল মুখ ফিরিয়ে; কিন্তু হঠাৎ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "কিসের প্রায়শ্চিত্ত? আমি নিদ্রিত, গভীর নিশীথে অভিসারিকার মত গিয়েছিলে তিনকড়ির ঘরে? তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত কেন, জ্যোৎস্না?"

'কিসের মত?'

"অন্যায় কথা বেরিয়ে' গেছে মুখ দিয়ে—অপরাধ নিও না। আমি কোন দুষ্ট অভিপ্রায় নিয়ে বলি নি।"

"তুমি সাধু, তোমার মন কিছুতে টলে না—আকাশের মত উদার পুরুষ—তোমায় নমস্কার করি। কিন্তু আমার দুষ্ট অভিপ্রায় ছিল।"

'তা' আমি জানি না। তুমি তিনকড়ির ঘরে গিয়েছিলে, এটাই আর তিনকড়িকে আজ আর খুঁজে' পাওয়া গেল না, এইটাই সত্য—তোমার কি অভিপ্রায় ছিল—তা'তো আমি জানি না, জ্যোৎস্না!"

"আমি তো ব'লেছি, দুষ্ট অভিপ্রায় ছিল।…চুপ করে' রইলে যে?…দেখ, এমন করে' মাথা নীচু করে' থেকো না—আমি প্রলয়ঙ্করী, গলায় ছুরী দিতে পারি তা' জান?"

অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর—জ্যোৎস্না অপূর্ব্ব-চরিত্রের নারী! রঞ্জন নীরবেই বেরিয়ে' যাচ্ছিল—জ্যোৎস্না দ্রুত এসে' তার জামার পকেটটা ধরে' ফে'ল্‌ল। কর্কশ-কণ্ঠেই ব'ল্‌ল, "বলে' যাও, আর এ মুখ দেখবে না?"

"জোর করে' যদি বলাও—আমি নিরুপায়।"

"জোর করে' কেন? নিজের চক্ষে দেখেছ, গোপনে তোমার অগোচরে নিশুত রাত্রে পর-পুরুষের ঘরে যেতে—কলঙ্কিনী আমি, এ মুখ কোন পুরুষের কি আর দে'খ্‌তে আছে!"

"শোন, জ্যোৎস্না—তুমি অনেক কথা বাড়িয়ে' ব'ল্‌ছ। আমি যেটুকু দেখেছি—যেটুকু সত্য বলে' জেনেছি, তার বেশী একটী কথাও উচ্চারণ করি নি—আমায় আর ব্যথা দিও না। বুঝেছি, প্রণয়ে যে সুখের কল্পনা মানুষের হিয়ায় হিয়ায় ঘুরে' মরে, সে আমার কাছে যাদুকরী ছলনা!"

রঞ্জনের দু'টী চক্ষু জলসিক্ত হয়ে' এল। করুণ কণ্ঠস্বর, বুঝি পাষাণ বিগলিত হয়!

জ্যোৎস্না ছট্‌ফট্‌ ক'রতে লা'গল অন্তরে অন্তরে—কি করে' সে আপনাকে প্রকাশ ক'রবে, এই সহজ-সরল মানুষটীর কাছে! হঠাৎ সে ছিন্নমূল বৃক্ষের মত রঞ্জনের পদতলে পড়ে' উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে' উ'ঠ্‌ল—চাপা গলায় অস্ফুটস্বরে বলে' গেল এক নিঃশ্বাসে, "ওগো, আমায় ক্ষমা কর। হাত ধরে' কে নিয়ে' চলে অন্ধকারে, পথ-হারা আমি—কলঙ্কিত এ দেহ তোমার পূজার অযোগ্য। আমায় আরও কঠোর প্রায়শ্চিত্ত দাও।"

ব্যথিতার আর্ত্তনাদ ব্যথিতের প্রাণকে বিচলিত করে সমধিক-ভাবে। রঞ্জন নিরুপায়ের মত মেঝের উপর বসে' প'ড়ল—হতাশ নিরাশ হয়ে'। দূরে সতর্ক পদশব্দ—করুণা-মূর্ত্তি বাৎসল্য-প্রভাবে, বিদীর্ণ-হৃদয় পক্ষিণীর ন্যায়, মা ছট্‌ফট্‌ করে' বেড়াচ্ছিলেন সম্মুখের বারান্দায়।

কিছুই ঘটে নি, এমনই ভাব নিয়ে জ্যোৎস্নার সারা দিন কেটে' গেল। অমাবস্যার পর—সম্মুখে যেন জ্যোৎস্নাপক্ষ, কলায়-কলায় তার বুক ভরে'

উঠ্‌বে পূর্ণিমার আলোয়। যে ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে' তার অভিমান অন্ধতা এনেছিল সবখানিকে ঘনিয়ে, প্রলয়-ঝঞ্ঝার আঘাতে তা' গেছে তরল ফিকা হয়ে' মিশিয়ে'। স্বামীকে সে দেখে বৃহৎ, উদার, নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের মত, শুভ্র মাধুর্য্যময়। নিজের দিকে চেয়ে'ই তার ঘৃণা হয়—এত বেশী ইচ্ছা হয়, আর সে দেখাবে না কাউকে তার মুখ। সে আজ পর্য্যন্ত যা' করেছে সবই তার স্বেচ্ছাকৃত পাপ, তা' না হ'লে একনিষ্ঠ পূজার অধিকার থেকে সে এমন করে' বঞ্চিত হবে কেন? যে কর-কমল চরণ-পদ্মে উৎসর্গ করে' তার জীবন ধন্য হবে, দিনে দিনে তা' উচ্ছিষ্ট করে' দিয়ে গেল যে ভূতের মত, তাকে তো সে ডেকে' নিয়ে এসেছিল নিজেই দর্পান্ধ হয়ে। তার অনাঘ্রাত ফুলের মত দেহ-বল্লরী বিষাক্ত সর্পের বন্ধনে নিপীড়িত হ'ল, সে পাপ তারই তো আত্ম-কৃত! আর অন্তর যতই অমলিন, অনাবিল হউক—সে তো প্রশ্রয় দিয়েছে অন্যকে মুহূর্ত্তের জন্যও তাকে বাহ্যতঃ মলিন করার; কাতর হৃদয় নিয়ে সেই তো ব্যগ্রতা প্রকাশ ক'রতে গিয়েছিল নিঃশব্দে গোপনে, একটা দৈত্যের কাছে একান্ত ভিখারিণীর মত—কিন্তু কি চাওয়া তা'তো সে ভেবে' দেখে নি অভিমানে! অপমানিত করেছে, অবহেলা করেছে,—অনাদৃত রূপের লাঞ্ছনায় তার সদর্প হিয়া ভেঙ্গে' চূরমার হ'ল না কেন সেই মুহূর্ত্তে, যখন তারই বাড়ীতে বসে', সে তাকে ঘরের বাইরে ছলে, কৌশলে টেনে' এনে দূর করে' দিল! দোর বন্ধ হয়ে' গেল, যে পথে সে চেয়েছিল ছুটে' যেতে প্রতিশোধের আগুনে জ্বলে' ম'রতে; প্রভুত্ব করার অধিকার যেখানে বিধাতার দেওয়া, সেখানে মাথা নত না করে' ভিক্ষাপাত্র হাতে কোথায় গিয়েছিল সে পাপের ছলনায়? আত্মকৃত অপরাধের মাত্রা চিন্তায় চিন্তায় অজগর সর্পের মত তাকে জড়িয়ে ধরে তীব্র পীড়নে। নিঃশ্বাস নেওয়ার সাধ্যও হারিয়ে যায় বুঝি!

কিন্তু পুত্রবৎসলা, দয়ার আধার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর অভয়বাণী এখনও যে সাহস দেয়, সান্ত্বনা দেয় মাথা তুলে' দাঁড়া'বার। সে তো হারায় নি, যে মন্ত্র তার হৃদয়ের পরতে পরতে এঁকে দিয়েছে পবিত্র দাম্পত্য-সম্বন্ধের পুত চিত্র—সেই প্রথম দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত তা' তেমনই ভাস্বর ও সুন্দর হয়ে আছে। প্রকৃতির বিপ্লবে পথের ধূলা উড়ে' গৃহ-চূড়া ভাঙ্গে, লণ্ডভণ্ড হয় সৃষ্টির সৌন্দর্য্য; কিন্তু সে ক্ষণিক বিপর্য্যয়ে সৃষ্টির তো লয় হয় না—মলিন হয় না কোন দিন! প্রকৃতির হাতেই আবার সুন্দর হয়ে' তা' ফুটে' উঠে সৃজনের লাবণ্যে, অভিনব শোভায়। তবে কেন জীবনের ক্ষণিক উত্তেজনায় যে বিবর্ত্তন ঘটে' যায়, তার স্মৃতি নিয়ে এত ব্যথা তার? নারীত্বের এই কোমল ভাব-প্রবণতাই তো দায়ী তার জন্য! এত সহজে কেন তার অন্তরে অপ্রিয় ঘটনার এমন গভীর রেখাপাত হয়? সূর্য্যকিরণ-বিহীন লতা-গুল্মের ন্যায় প্রাচীর-বন্ধনে নারীর অন্তর-বাহির বুঝি হয়ে' গেছে শ্রীহীন, শক্তিহীন। জ্যোৎস্না সারা দিন আত্মগ্লানির সঙ্গে সংগ্রাম করে' রাত্রিতে অবসন্ন হয়ে' পড়েছিল মৃতের মত। রাত্রি-শেষে প্রভাতের আলোয় সে চক্ষু মেলে' দে'খ্‌ল, স্বামী তার বিছানায় নাই। সারা রাত্রি সে সোফায় পড়ে' ঘুমিয়ে কাটিয়েছে; পূর্ব্বের মত স্বামী তাকে ডেকে' কাছে নিয়ে শোয় নি—বড় নিষ্ঠুর উপেক্ষা, বড় নিদারুণ ঔদাসীন্য!

বেলা হ'ল, ঘরের বাহির হ'তেই শুন্‌ল সে মায়ের গলা। ইচ্ছা হ'ল, ছুটে গিয়ে তার প্রতিবাদ করে—কিন্তু তার সাহসে কুলা'ল না। কাদু ঝি ব'ল্‌ছে, "বৌ-ঠাকুরাণীর তেমন অপরাধ নেই, দাদাবাবুকেই সবাই দোষ দিচ্ছে!" মা ব'ল্‌ছেন, "এসব কথা বাহিরের লোক জা'ন্‌লে কি করে'?" কাদুর উত্তর—"কি জানি মা, পাড়ায় ঢি, ঢি! হরি মুদীর দোকানে এই নিয়ে সকাল সন্ধ্যায় জটলা হচ্ছে। আমি তো মা, ক'

আঙুল দিয়ে পালিয়ে এলুম।" মা ব'ল্‌ছেন, "ঘরের কথা বাহিরে নিয়ে গেছিস্‌ তোরা, তা' না হলে' তিনুর কথা, বৌমার কথা, এত ভিতরের খবর তাদের দেবে কে?"

সুশীলার গলা পাওয়া গেল। সে ব'ল্‌ল, "রাণী-মা যে মাথার চুল কেটে' নিজের মুখেই নিজে কালি মেখেছেন! অমন থোকা-থোকা চুলের গোছা দেখে' ঝাড়ুদার সবাইকে জিজ্ঞাসা করেছে—হাঁ গা, এ যে আমাদের রাণী-মার মাথার চুল। কার মুখ ঢা'ক্‌বে, মা? তুমি তখন কাশীতে, তিনুবাবু রাণী-মাকে নিয়ে রোজই হাওয়া খেতে বেরুতেন, তখনই পাড়ায় কাণাঘুষা চ'লত—কালকের ঘটনা কারও মুখে থাবা দিয়ে রাখা যায় না, বড় কলঙ্কের কথা, মা!"

কথা শুনে' জ্যোৎস্নার পা ছু'টা থর্‌-থর্‌ করে' কাঁ'পতে লা'গ্‌ল। কলিকাতা সহর বলে' প্রত্যক্ষ লোক-গঞ্জনা থেকে সে ছাড়ান পেয়েছে, নইলে লাঞ্ছনার সীমা থা'ক্‌ত না। না, তাকে পালাতেই হবে এ বাড়ী ছেড়ে'—এ কলঙ্ক মোছা যাবে না।

রাত্রি-কাল। আজ জ্যোৎস্না মাথার অবশিষ্ট চুলগুলি পরিপাটী করে' আঁচড়ে' নিয়েছে। সীঁথির উপর সিন্দুর-শোভা উষালোকের ন্যায় উজ্জল। বিচিত্র বেশ-ভূষায় সম্রাজ্ঞীর চেয়ে গৌরবদৃপ্তা—বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিক্ত শয়ন-কক্ষে সে পাদচারণ ক'রছিল সদম্ভে—যেন তাকে মুছে' ফেলতেই হবে স্বপ্নের মত এই কয় দিনের কলঙ্ক-চিহ্ন তার অঙ্গ থেকে। হঠাৎ তার চ'খে প'ড়ল—কার্ণিসের উপর একটা পুরুষ-মূর্ত্তি, খড়খড়ির গরাদ ধরে' দাঁড়িয়ে' রয়েছে। আতঙ্কে কণ্ঠ শুষ্ক—সে চীৎকার ক'রতে পা'র্‌ল না। তখনই সে মূর্চ্ছিত হয়ে' প'ড়্‌ত—কিন্তু পরিচিত কণ্ঠের শব্দ শুনে', বিস্ময়ান্বিত হয়ে' খড়খড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

"এ কি, এখানে তুমি কি করে' এলে ?"

"দারোয়ানেরা বাড়ী ঢু'কতে দিল না—ব'ল্‌ল বাবুর কড়া হুকুম, তাঁর হুকুম না পেলে' কারুকে প্রবেশ ক'রতে দেওয়া হবে না—বাহির হ'তেও নয়।"

"তাই নাকি ?"

"তুই কিছু জানিস্ না ? যত নষ্টের গুরু তুই! আমি সব জানি, সে-কথা ব'ল্‌তে আসি নি—খবর রাখি সব। আপদ্ বিদেয় হয়েছে, এখনও যদি সতর্ক হয়ে' চলিস্, সুখে থাক্‌বি।"

জ্যোৎস্নার আপাদ-মস্তক জ্বলে' গেল কথা শুনে'। ধমক দিয়ে বলে' উঠ্‌ল, "এখুনি বিদায় হও এখান থেকে, চোর ডাকাত!"

সে ব্যক্তি গলা নামিয়ে ব'ল্‌ল, "মর তুমি, আমার কি ? মায়ের পেটের বোন—তাই তোকে মন্দ দে'খ্‌লে বুকে বাজে। কিন্তু ও-সব কথা নয়—তুই যাই-ই হ', আমি তোর দাদা, আজ বড় বিপদে পড়ে' এসেছি—দু'শ টাকা দিতেই হবে' তোকে। তা' না হ'লে জেলে যাব আমি।"

"জেলে যাবে, চোর ডাকাতের উপযুক্ত স্থান—আমি টাকা পাব কোথায় ?"

"টাকা না থাকে—গা থেকে দু'খানা গয়না খুলে' দিতে পারিস্ তো! এই বিপদে যদি না দেখ'বি, বোন হয়ে' জন্মেছিলি কেন ?"

"গয়না আমার বাবার নয়। তুমি যাও এখুনি এখান থেকে, বিপদের উপর বিপদ্ বাড়িও না।"

"অনেক কষ্টে খিড়কীর পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে এসেছিলুম তোর কাছে, দু'-শ টাকা পেলে জীবনের মোড় ফিরে' যায়—তা' না হ'লে জেল খেটে'ই ম'রতে হবে, জ্যোৎস্না।"

"মর তুমি—ভাই বলে' আর পরিচয় দিও না—গলায় দড়ি দিয়ে মর-গে। তোমায় আমি একটা কাণাকড়িও দোব না।"

কি একটা অস্পষ্ট ভাষায় গালি দিয়ে ঝুপ্ করে' সে লাফিয়ে প'ড়ল ছাদে। তারপর অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না—যেন মনে হ'ল, একটা প্রেত-মূর্ত্তি গাছের কালো ছায়ার কোলে কোলে ছুটে' চলেছে। দৃষ্টি চলে না—তবুও মনে হ'ল, খিড়কীর প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করে' নিধুবাবু বাহির হয়ে গেল। খোঁড়ার পা খানায় পড়ে—যেমনি সে মুখ ফেরাবে, দেখে, রঞ্জন ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। এইমাত্র না হোক, বেশীক্ষণ সে আসে নি—তাকে দেখে'ই নিধুবাবু সরে' পড়েছে। বেড়া'বার ছড়ি এখনও তার হাতে আছে।

অপরাধীর মত জ্যোৎস্নার মুখ শুকিয়ে গেল। রঞ্জন কোন প্রশ্নই তু'লল না। জ্যোৎস্না হাঁফ ছেড়ে' বাঁ'চল। মনে হ'ল—এইমাত্র যে অভাবনীয় ঘটনার স্রোতঃ বয়ে গেল, রঞ্জন তার বিন্দু-বিসর্গও টের পায় নি।

জ্যোৎস্না হাতের ছড়ি নিয়ে ব'লল, "আজকাল বেড়া'বার সখ খুব বাড়িয়ে তুলেছ! কই আগেকার মত আমার কাছে তো আর একদণ্ড থাক না!"

রঞ্জন জ্যোৎস্নার কাছে কিছু শু'নবে বলে' যেন উদগ্রীব ছিল; কিন্তু এই কথায় সে নিরাশ হয়েই খড়খড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াল—দূরে দৃষ্টি সঞ্চালন ক'রে কি যেন দেখার চেষ্টা ক'রছে।

জ্যোৎস্না ব'লল, "কি দে'খছ?"

"ফাল্গুন মাস এল, বসন্তের বাতাসে জুঁই'র ঝাড়ে একটাও তো ফুল ফোটে নি! কুঁড়ি ধরে নি!"

"সত্য কথা ব'লছ?"

"কেন? তুমি কি মনে কর, আমি মিথ্যা ব'লছি?"

"হাঁ, মনে হচ্ছে।"

"তবে মিথ্যা।"

জ্যোৎস্নার চক্ষে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। করুণ মিনতির স্বরে (ব'লল, "তুমি কেন এমন হ'লে—স্বর্গের দেবতা, তোমার মুখ দিয়ে কে হতভাগিনীর দায়ে মিথ্যা বা'র হ'বে!"

রঞ্জন স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে' রইল।

জ্যোৎস্না তার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে তুলে' নিল—স্প সাড়া নেই, যেন নির্জীব পাষাণ! মনে হ'ল, ছুঁড়ে' ঠেলে' দেয় হাতখান —কিন্তু অপরাধের মাত্রায় নিজেই সে ভেঙ্গে' পড়ে' যাচ্ছিল প্রতি মুহূর্তে দর্প তার শিরায় বিন্দুমাত্র শক্তি-সঞ্চার ক'রতে পা'রল না। ব্যথিতে মতই অতিমাত্র নত হয়েই সে ব'লল, "আমার সব কিছু ক্ষমা করে যেও—কে যেন বিনা অপরাধে পদে পদে আমায় শাস্তি দিচ্ছে! কেন- আমার কি কেউ রক্ষা-কর্তা নেই? তুমি কি আমার পানে মুখ তুলে চাইবে না?"

"কি হয়েছে তোমার? যদি না বল, আমার কি হাত আছে জ্যোৎস্না, তোমায় কোন সাহায্য করি?"

"তুমি কি বিশ্বাস কর, যদি তা' বলার হ'ত তোমায় জানাতুম না সে কথা বলা যায় না—বলা গেল না বলে'ই তো এত ব্যথা, এত বুক ভরা কান্না নিয়ে জ্বলে' ম'রছি, ডুবে ম'রছি—তবুও কি তোমার দয় হবে না!"

"আশ্চর্য্য কথা! যখন সে কথা বলা যায় না, তখন বলো না—কি ক'রলে তুমি সুখে থাক, সান্ত্বনা পাও বল—আমার তাতে ত্রুটি হ'বে না।"

"এ কি কথা তোমার ! ওগো তুমিই বল, আমার এই দগ্ধ প্রাণ শীতল করার ঔষধ যদি আমার জানা থা'কবে, তোমার পায়ে ধরে' এত কান্না, এত ভিক্ষা কিসের জন্য ক'রব ? আমায় তুমি ব্যাধি-পীড়িতা রোগিণীর মতই দেখো—তুমি আমার স্বামী, দেবতার চেয়েও বড়, আমার চিকিৎসা কর, আমায় নীরোগ কর !"

রঞ্জন আজ অতিশয় বিস্ময়ের সহিত জ্যোৎস্নার মুখের দিকে তাকা'ল—সত্যই তার বিনীত কাতর মূর্ত্তি, বড় করুণার পাত্রী ; কিন্তু সব যেন প্রহেলিকাময় ! কার সঙ্গে কথা কচ্ছিল জ্যোৎস্না খড়খড়ির দিকে দাঁড়িয়ে ! পুরুষের কণ্ঠ, সে বিষয়ে সংশয় নাই। কথা স্পষ্ট নয়। জ্যোৎস্না সমস্যাকেই ঘনিয়ে তোলে কথায়, আচরণে। সকল দুয়ার বন্ধ রেখে' অতিথিকে ঘরে ডাকা, সে কি পরিহাস নয় !

সে উদাসীন হয়েই বিছানায় গিয়ে ব'সল। সঙ্গে জ্যোৎস্না বিছানার উপর উ'ঠ্‌তে গিয়ে থমকে' দাঁড়া'ল তার স্বামীর উদাসীন মুখের দিকে চেয়ে' ; অনেক ক্ষণ নীরবেই সে দাঁড়িয়ে রইল। ঘড়ির শব্দ দু'জনেরই কাণে প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে বা'জছিল—টিক্-টিক্-টিক্।

বসন্তকাল ফুরা'ল—মল্লিকার মালা, যূথীর গোড়ে রঞ্জন একদিনও জ্যোৎস্নার গলায় দুলিয়ে' দিল না, কবরীর শোভা বাড়া'ল না ! দারুণ গ্রীষ্মে হাতপাখা আর চলে না—বিচিত্র-চিত্রিত ফ্যান্ এনে' জ্যোৎস্নাকে পছন্দ করার অনুযোগ সে জানা'ল না। রঞ্জন যেন এ বাড়ীর মানুষ নয় ! বাড়ীতে থেকেও যেন সে নেই ; কি খায় না খায়, তা'ও খেয়াল রাখে না। জ্যোৎস্না আগের মতই পাখা নিয়ে' বসে' এটা সেটা খাওয়ার তাগিদ দেয় ; কিন্তু অন্যদিক্ থেকে সন্তোষের ঝরণা-ধারায় তৃপ্তির প্রতিদান যদি একদিনও না পাওয়া যায়, অতিশয় অকপট সেবার উৎস-

ধারাও যে শুখিয়ে আসে নিঃস্ব হয়ে’! কিন্তু আগে জ্যোৎস্না সোহাগের নির্ঝরের মত বয়ে’ চ’লত রঞ্জনকে অভিষিক্ত করে’; আজ তপস্যাই অগ্নিস্রোতঃ সৃজন করেছে আপনাকে ঘিরে’। রঞ্জন এখন ভোরে উঠে’ই মুখ-হাত ধুয়ে’ ভ্রমণে বাহির হয়; জ্যোৎস্না তার ছড়িটী আগিয়ে দেয় হাতে তুলে’, জুতো মুছিয়ে দেয় আঁচল দিয়ে’। গলার বোতাম যদি খোলা থাকে, সস্নেহে সে এঁটে’ দেয় করপল্লবের স্পর্শে। প্রতীক্ষার দৃষ্টি প্রতিদিনের আশা-ভঙ্গে পাথরের মত শক্ত হয়ে’ গেছে; ঔজ্জ্বল্যহীন, কিন্তু সেবায় তার ক্লান্তি নেই।

সকালের জলখাবার রন্ধন-শালা থেকে আর আসে না—বারান্দায় ষ্টোভ জ্বেলে’ সে নিজেই তৈরী করে। শ্বেতপাথরের রেকাবীতে থরে থরে কচুরী, নিমকী, সিঙ্গাড়া সাজিয়ে’ দেয়, চায়ের বাটি এগিয়ে’ ধরে, কত তৃপ্তি নিয়ে’ মুখের পানে চেয়ে’ থাকে সে—যদি রঞ্জন একবার বলে’ কোন একটা কথা—ভাল মন্দ যাই হোক; একটু সাড়া পেলেও, সুখের সমুদ্র বুকে উপ্‌ছে’ ওঠে। কিন্তু কি নিষ্ঠুর হয়েছে রঞ্জন, তার মুখে কথা নেই! যেন সে একটা যন্ত্র-বিশেষ; হাসে, খায়, চোখ মেলে’ চায়, কথা কয়; কিন্তু আসল মানুষটী যে ধরা দেয় না—এই অতৃপ্তির উত্তাপে, জ্যোৎস্নার বুক দিনের পর দিন ঝল্‌সে’ ওঠে। মরুভূমির বুকে স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসার সকল ধারাই শুকিয়ে যায়। আজ সে কেবল সেবার অর্ঘ্য নিয়ে, বিষণ্ণ শুষ্ক মুখে দেবতার দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকে—যদি প্রসন্ন হাসির রেখা এই প্রস্তর-বিগ্রহের ঠোঁটে এক মুহূর্ত্তের জন্য ফুটে’ ওঠে, তবেই সে ধন্য হবে। এতই দীনতা আজ তার!

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, বর্ষার আকাশ ঘনিয়ে’ এল খিড়কীর বাগানে, পিঁজরায় ময়ূর-ময়ূরীর নৃত্য সুরু হয়েছে—কেকা-রবের প্রতিধ্বনি শোনা যায়—মালতীর গন্ধ বাতাসে ভেসে’ আসে—দেবতার রুদ্ধ দুয়ারে দাঁড়িয়ে

পূজারিণীর প্রতীক্ষা, কিন্তু দেবতার করুণা নেমে' আসে না! এত সহজ যে ছিল, সে আজ এমন দুর্ল্লভ হয়ে' উ'ঠ্‌ল কেমন করে'? জ্যোৎস্না আড়ালে বসে' কাঁদে, নির্ব্বাক্ দেবতার সম্মুখে এসে' বন্দনা-গীত গায়—বুঝি কণ্ঠস্বর আর বেশীদিন শ্রবণ-গোচর হবে না, এমনই ক্ষীণ কণ্ঠ!

ব্রতচারিণীর ন্যায় জীবন, মূর্ত্তি নির্ব্বাক্-পাষাণময়ী। কিন্তু ইহা বেদনাহীনের মর্ম্মর-মূর্ত্তি নয়—বেদনা জমাট হয়ে' গিয়ে' সাড়া-শূন্য নিথর ব্যথারই আস্ত প্রস্তর-মূর্ত্তি। জ্যোৎস্না যেমন কাঁদে সকলের অলক্ষ্যে, হাসে লোক দেখিয়ে' মাধুরীহীন; তেমনই রঞ্জনও বোধ হয়, কেঁদে' আসে বাহিরে, ঘরে তার স্থির প্রশান্ত মূর্ত্তি। দু'জনে ঘনীভূত ব্যথায় এমনই কঠিন শক্ত হয়ে' উঠেছিল, যে কোনদিন অসতর্ক ঠোকা-ঠুকীতে দু'জনেই বুঝি গুঁড়া হয়ে' যাবে—দু'-জনের অন্তর্য্যামী এই আতঙ্কে সতর্কও ছিল।

কিন্তু এমন করে' বেশীদিন সংসার চলে না—জগৎ-সৃষ্টিও অচল হয়। হঠাৎ দুঃসংবাদ নিয়ে ভগ্নদূতের মত ছত্র সিং একখানা টেলিগ্রাম ঘরের মেঝেয় ফেলে' দিয়ে গেল। রঞ্জন তখন খেতে বসেছিল, আগেকার মতই জ্যোস্নাকে সম্মুখে রেখে'। জ্যোৎস্নার হাতে পাখা চল্'ছিল ধীরে-মন্থরে। কিন্তু সে বাতাস অন্তরের রসে সিক্ত নয়, স্নিগ্ধ নয়—এই দুটো যন্ত্র-পুত্তলিকার আচার-আচরণে বিধাতারও বুঝি দম বন্ধ হয়ে' যাচ্ছিল।

রঞ্জন ভারী গলায় ব'ল্‌ল, "দেখি টেলিগ্রামটা।"

"খাওয়া শেষ কর, তারপরে দেখো।"

"প্রত্যেক কথায় তোমার আপত্তি!"

ব্যথার ভারে অবসন্ন হয়ে' পড়ে জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নার হাত থেকে পাখাটা ঠক্ করে' পড়ে' গেল মেঝের উপর—তার হাতখানাও যেন বিশুষ্ক দারুমূর্ত্তি। টেলিগ্রামের খামখানা চিম্‌টী কেটে' তুলে' নিয়ে'

রঞ্জনের আড়ষ্ট বাম হাতের উপর সে ছুঁড়ে' ফেলে' দিল। ডাণ হাতে সে অন্নমুষ্টি তু'লছিল মুখে, বাঁ-হাতেই খাম ছিঁড়ে', চোখের সাম্‌নে লাল কাগজখানা তুলে' ধর্‌তেই হাতের ভাত পাতে ফেলে'ই সে উঠে' দাঁড়া'ল কস্ত্রের মত শক্ত হয়ে।

"কি হ'ল—কি খবর?"

উৎকণ্ঠিত জ্যোৎস্নার গায়ের উপর টেলিগ্রাম-খানা ছুঁড়ে' দিয়ে' রঞ্জন সক্‌ড়ি হাতেই সোফার উপর বসে' প'ড়ল।

জ্যোৎস্না দে'খল, স্পষ্ট স্পষ্ট হরফে লেখা আছে—"**Brother expired start immediately Tunu.**" স্তম্ভিত পাষাণ-মূর্ত্তি দু'জনেরই; এই দুঃসংবাদের আঘাতে মানুষের হিয়ায় যে করুণার প্রস্রবণ আছে, তা' মুক্ত দুয়ার খুলে' বেরিয়ে এল এক সঙ্গে। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস!

দু'জনে আজ কত কথা—সারা অপরাহ্ন টুনুর ভায়ের স্ত্রী-পুত্র নিয়ে' কত আলোচনা! টুনুর ভবিষ্যৎ নিয়ে দু'জনেই ভেবে' সারা। সহানুভূতির তারে দু'জনের হৃদয়-যন্ত্র এক সঙ্গে সাড়া দিয়ে' ওঠে। অপরাহ্নে, জ্যোৎস্না সব গুছিয়ে' দিল পরিপাটী করে' পাটনা-যাত্রার উপযোগী দ্রব্য-সামগ্রী দিয়ে'; স্বামীর পাশে বসে' হাওড়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়েই সে সান্ত্বনা পেল না, প্লাটফর্ম্মে গিয়ে বোম্বে মেলে রঞ্জনকে তুলে' দিয়ে এল—গাড়ী 'কুক্' দিতেই পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে', জ্যোৎস্না সজল-নয়নে ব'লল, "গিয়েই খবর দিও অবস্থার কথা।" রঞ্জনের হৃদয়ে আবর্জ্জনারাশী ধুয়ে-মুছে' গিয়েছিল; প্রেম-প্রফুল্ল দৃষ্টিতে সে জ্যোৎস্নার পানে চেয়ে' ব'লল, "গিয়েই ফি'রব—সাবধানে থেকো।"

এমন মধুর দৃষ্টি-বিনিময় অনেক দিন ধরে'ই উভয়ের মধ্যে বন্ধ ছিল। আজ দুঃসংবাদ বহন করে' প্রেমের দূতই কি হাজির হ'ল?

একদিন, দুইদিন, তিনদিন, উদ্বিগ্ন জীবন-যাপনের পর, রঞ্জনের তার এল জ্যোৎস্নার নামে। তারের মর্ম্ম—"টুনু নিরাশ্রয়, সর্ব্বনাশ তারই হয়েছে—তাকে সঙ্গে নিয়ে ফি'রছি।"

ধীরে ধীরে আকাশের বজ্র যেন নেমে' এল জ্যোৎস্নার মাথার উপর। ধীরে ধীরে স্তূপীকৃত ভস্ম বিদীর্ণ করে' বহ্নি-শিখা আবার দেখা দিল তার হৃদয়ে। ধীরে ধীরে তার স্নিগ্ধ চক্ষের দৃষ্টিতে ফুটে' উ'ঠ্‌ল প্রচণ্ড অগ্নিশিখা। সে যেন এখনই উন্মাদ হয়ে' যাবে। টুনু নিরাশ্রয়া, এখানে তার আশ্রয় কোথায়? কার কাছে সে আশ্রয় নেবে? টুনুর বিধবা ভ্রাতৃবধূ কার আশ্রয় নিল? টুনু আ'সবে এই বাড়ীতে, এই ঘরে, এই বিছানার একপ্রান্তে যদি সে এসে' বসে, বারণ ক'রবার উপায় নেই—সবচুড় টুনু, সর্ব্বত্র গমনে বাধাহীন তার স্বাধীন চরণ; বেড়া'বে তার স্বামীকে নিয়ে' গড়ের মাঠে, ছু'টবে সিনেমায়, হল-ঘরে অর্গ্যান বাজিয়ে গান গাইবে—তার স্বামীর মাথা কোলে নিয়ে' আবার সে সোহাগ ক'রবে তারই চক্ষের সম্মুখে! ইস্‌, ঘরে-দোরে আগুন ধরিয়ে' দেবে না জ্যোৎস্না? সে ছুটে' গেল তার মায়ের ঘরে। কাদুর সঙ্গে বকাবকি জুড়ে' দিয়েছেন তিনি—কথা আর বলা হ'ল না। ঘরের মেঝেয় বজ্রাহতের ন্যায় সে শুয়ে' পড়ে' কাৎরাতে লা'গল। কিন্তু অস্থির সে, এখুনি উত্তর দিতে হবে তারে, টুনুকে এখানে আনা হবে না; আবার মায়ের ঘরে গিয়ে সে দাঁড়া'ল থম্‌কে'।

"কি মা? ছুটে' এসেছিলে আর একবার না?"

জ্যোৎস্নার মনে হ'ল—মায়ের চরণের উপর আছাড় খেয়ে' সে চেঁচিয়ে বলে—ওগো, রক্ষা করো আজ এই দায় থেকে—টুনু, টুনু, টুনু—

কাল-সাপ সে, এত যে সর্ব্বনাশ যার নামে—সে সর্ব্বনাশী যদি এসে' হাজির হয়, ধূ-ধূ করে' জ্বলে' যাবে সব! কিন্তু মনের কথা মুখে সব সময়ে বলা যায় না।

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে' জ্যোৎস্না ব'ল্‌ল, "সেই টুনু আস্‌ছে!"

"কে আস্‌ছে?"

"ওই ওঁর বন্ধু, তার বোন টুনু—"

"আহা, ছেলেবেলা থেকেই ভাই-বোনের আনাগোনা ছিল আমাদের বাড়ীতে; ভাই তো নয়, যেন কৃষ্ণ-ঠাকুরটী; বোনটীও তেমনি সুন্দরী, সুশীলা। আমি তাকে সুভদ্রা ব'লতাম। আহা, অদিনে রঞ্জন তাদের দে'খবে বৈ কি!"

ইহার উপর আর কথা চলে না। বিষণ্ণ-চিত্তে সে নিজের ঘরে এসে' খিল দিয়ে' অনেক চিন্তা ক'রল। টুনু এ বাড়ীতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই সে নিশ্চয় গলায় দড়ি দিয়ে' ঝু'লবে। পাগলের মতই গালে মুখে চড়িয়ে', সে একান্ত অসহায়-ভাবে ফুঁপিয়ে' ফুঁপিয়ে' সারা দিন কেঁদে' কাটা'ল।

সন্ধ্যার আলো পথে পথে জ্বলে' উ'ঠ্‌ল। কাল সকালেই টুনুকে নিয়ে' স্বামী তার বাড়ী ঢু'কবে। কি ক'রবে সে—সারাদিনের উৎকণ্ঠায় অবসন্ন মন অনেকটা দোরস্ত হয়ে' উঠেছিল। রুক্ষতা, উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে' পড়েছিল। রাত্রি যত গভীর হয়, অবসাদে সে ততই ম্রিয়মাণ হয়ে' পড়ে। রাত্রি-প্রভাতে জহ্লাদ যেন ফাঁসীর রজ্জু তার গলায় পরিয়ে' দেবে—এমনই অসহায় প্রতীক্ষায় মিনিটের পর মিনিট তার আর কাট্‌'ছিল না। দরজায় ঠুক্-ঠুক্ করে' আঘাতের শব্দ শোনা গেল।

গলা বাহির হয় না, তবুও দীন কণ্ঠে সে ব'লল, "কে?"

উত্তর এল, "আমি জ্যোৎস্না, আমি।"

দরজা খুলে' জ্যোৎস্না ব'লল, "তুমি!"

"হাঁ, আমি—আজ যদি অনুরোধ উপেক্ষা কর, দস্যু-বৃত্তি ক'রব।" এই বলে' সে ঘরের ভিতর ঢুকে' দরজা চেপে' দাঁড়াল। হাতে তার একখানা ছোরা ঝক্-ঝক্ করে' উ'ঠ্‌ল।

জ্যোৎস্না নির্ভয়েই ব'লল, "গলায় ছুরী দেবে, আঃ বাঁচি!"

এ আর কেহ নয়, নিধুবাবু। সে ব'লল, "পাগল হয়েছিস্, তোর গলায় ছুরী দোব—মায়ের পেটের বোন্ না তুই! বড় বিপদে না প'ড়লে আসি না—সে দিন তু'-শ টাকা দিলে, এ বিপদ্ আ'সত না। ওয়ারেণ্ট বেরিয়ে গেল, দেশ ছেড়ে' যাচ্ছি—কিছু টাকা দে।"

"কোথায় যাবে?"

"তার কি ঠিক আছে?"

"আমায় সঙ্গে নাও না—"

"ঠাট্টার সময় নয়। শেষ ট্রেণে চম্পট দোব—শীগ্‌গীর বা'র কর।"

"আমি সত্যি ব'লছি—আমি তোমার সঙ্গে যাব! একটা কথা বলি: ঘরে এসে' ঢুকেছ, লুট ক'রতে পার; কিন্তু শোন, এ সংসারের অকল্যাণ আমি বেঁচে' থাকতে ক'রতে পা'রবে না। আমার মায়ের দেওয়া বাজু, বালা, ঠাকুর-মার সীঁথী, কয়েকখানা গহনা আছে—আমায় যদি সঙ্গে নাও, এইগুলো তোমায় দিতে পারি।"

"নগদ টাকা কিছু নেই?"

"সত্যি ব'লতে, এক কড়ার অধিকারও আমার নেই; তবে কয় মাসের হাত খরচের টাকা বাঁচিয়ে শ'-দেড়েক টাকা হাতে আছে—কিন্তু আমায় সঙ্গে না নিলে এক পয়সাও পাবে না। তোমার ছোরা দেখে' আমি ভয় পাই নে, আমারও ড্যাগার আছে।"

এই বলে' ফস্ করে' সে বালিসের তলা থেকে চামড়ার খাপে মোড়া রূপার মত উজ্জ্বল একখানা ধারাল ছোরা মুঠা করে' দাঁড়াল।

নিধুবাবু অবাক্, ব'লল, "সত্যি ব'লছিস্—গহনাগুলোর দাম কত হ'বে?"

"পাঁচ-সাত শ' টাকা—"

"আচ্ছা আয়—কোথায় যাবি?"

"উপস্থিত আমায় বাড়ী-ছাড়া কর—পথে বেরিয়ে' সব কথা হ'বে।'

নিধুবাবুর কাণ্ড-জ্ঞান ছিল না—সে হাত বাড়িয়ে টাকা-গহনা চাইল। জ্যোৎস্না ব'লল, "এখন এসব আমার হাতেই থা'কবে, পথে বেরিয়ে তোমার হাতে দোব।"

"তাই ভাল। খিড়কীর দরজা খোলা আছে—ঐ দিক্‌টা নিরাপদ্।"

দু'জনে নিঃশব্দে বাড়ী ছেড়ে' বেরিয়ে গেল।

জ্যোৎস্না গ্রহচক্রে বিহ্বলা—আজও কেউ তাকে রক্ষা ক'রল না!

— নয় —

বিপদ্ সব চেয়ে বড় হয়ে উ'ঠ্‌ল, হাওড়া ষ্টেশনে পৌছে। বাড়ী ছেড়ে' বাহির হওয়ার সময়ে খিড়কীর বাগানে অন্ধকার ঝোঁপের ভিতর থেকে একটা কাল-পেঁচা বিকট চীৎকার করে' উঠেছিল। আর বাড়ীর সব টিক্‌টিকিগুলো একত্র হয়ে বাড়ীর বাহিরে পা বাড়াতে মানা করেছিল সমস্বরে। ধরিত্রীও বাধা দিয়েছিল চরণে গুরুতর আঘাত দিয়ে; কিন্তু জ্যোৎস্নাকে কে যেন জোর করে' টেনে নিয়ে' গেল বাড়ীর বাহিরে। রাত্রি তখন বেশী নয়, তবুও কলিকাতার উত্তর অঞ্চলের লোক-বিরল পথ, নিঃশব্দে গ্যাস্‌পোষ্টগুলি আলোক বিতরণ কর'ছিল, একটা ঠিকা গাড়ীও সাম্‌নে জুটে' গেল—যেন বিধাতা সব জুটিয়ে' রেখেছিলেন থরে থরে জ্যোৎস্নাকে দুঃখ দিতে। ভাগ্যচক্র এমন করে'ই বুঝি ঘোরে!

নিধুবাবু গাড়ীতে চড়ে'ই বলে' উ'ঠ্‌ল, "গহনার বাক্সটা আমার হাতে দে, আর টাকা-গুলো এনেছিস্ ত?"

জ্যোৎস্নার সর্ব্বশরীর থর্‌-থর্‌ করে' কাঁপ্'ছিল। প্রতি নিঃশ্বাসে তার বুকের পাঁজরা-গুলো গুঁড়িয়ে' যাচ্ছিল নিদারুণ ব্যথায়, নিঃশ্বাস নেওয়ার চেয়ে হু-হু করে' বুকের শ্বাস ছুঁড়ে' বা'র করে' দিচ্ছিল সশব্দে। সর্ব্বশরীর অবশ, যন্ত্র-চালিতের ন্যায় গহনার বাক্স সে নিধুবাবুর হাতে তুলে' দিল।

"টাকা?"

জ্যোৎস্নার মুখে কথা নাই। চক্ষে অন্ধকার ঘনিয়ে' এসেছিল—চক্ষু নিমীলিত কি উন্মীলিত, সে বোধও তার ছিল না। কোথায়

চলেছে সে? একটু পরেই স্নেহময়ী শ্বশ্রূঠাকুরাণী তাকে যখন খুঁজে' পাবেন না—কি বজ্র তাঁর মাথায় ভেঙ্গে' প'ড়বে! ঘরের আলমারী, বিছানা, প্রত্যেক দ্রব্য-সামগ্রীটীর স্মৃতি রোরুদ্যমান হয়ে' তাকে যেন খিম্‌চি কা'টতে লা'গল—জ্বালায় তার সর্ব্বশরীর পুড়ে' যায়—কাণে মেঘমন্দ্রে বিকট আওয়াজ—"টাকা?"

গাড়ী ছুটে' চলেছে। কোচ-বক্সে বসে' গাড়োয়ান পা-দানীতে পা ঘ'ষছে। ঘোড়ার পিঠে চাবুকের শব্দ শোনা যাচ্ছে। পথের ধারে খিলির দোকানে গ্রামোফোন বা'জছে। বড় করুণ সুর! ভাষা বোঝা গেল না—গাড়ীর চাকার শব্দে একটা গোলযোগই কাণে যায়। জ্যোৎস্না রুদ্ধকণ্ঠে ব'লল, "ও বাক্সতেই সব আছে।"

"চাবী?"

"বাক্সয় লাগান আছে।"

নিধুবাবু হাঁফ ছেড়ে' বাঁ'চল। পথের আলোয় ছোট গহনার বাক্সের ডালা খুলে' সে দেখে' নিল—সব ঠিক-ঠিক আছে কি না। তারপর ব'লল, "কোথায় যাবি?"

আকাশ থেকে যেন জ্যোৎস্না ধড়াস্ করে' মাটির বুকে পড়ে' গেল। নিধুবাবুর কথা শুনে'ই তার মনে হ'ল, তবে সে সত্যই চলেছে—এটা স্বপ্ন নয়। স্বপ্ন যদি হ'ত, ঘুম ভেঙ্গে' ফিরে' পেত তার সবখানিকে, ফিরে' পেত মায়ের স্নেহ, দাস-দাসীদের সম্মান, আর ফিরে' পেত তার হারানিধিকে—বুক পেতে' নিতে পা'রত আপনাকে ধুয়ে মুছে' দেবতার বিগ্রহকে অতি যত্নে, পরম সমাদরে। ইচ্ছা হ'ল—ফিরে' যেতে। গহনা, টাকা সব যাক—তাকে ফিরিয়ে' দিয়ে' আসুক বড় সাধের সেই গৃহখানিতে। শূন্য গৃহ; কিন্তু দেওয়ালে দেওয়ালে আছে জুড়ে' বসে' তার সর্ব্বস্ব-ধন—রঞ্জন। কত ছবি—কত ভঙ্গীতে, জ্যোৎস্নাকে নিয়ে'

বসে' থাকা, দাঁড়িয়ে থাকা, কোলে মাথা দিয়ে' শুয়ে' থাকা—আসুক না টুনু, জ্যোৎস্নার নিজের ধনে কে তাকে বঞ্চনা কর্‌তে পারে? ফিরে'ই সে যাবে—এই দস্যু তস্করের সঙ্গে সর্ব্বহারা অবলা কোথায় যাবে? কিন্তু মুখ দিয়ে' কথা ফু'ট্‌ল না। বাঁ-দিকে কৃষ্ণদাস পালের প্রস্তর-মূর্ত্তি রেখে', হ্যারিসন্ রোড ধরে' গাড়ী ছুটে' চলেছে হাওড়া ষ্টেশনের দিকে। বড় বাজারের মোড়ে ভীড়ে আর গাড়ী চলে না; দরজার ফাঁকে মশালের মত বাতি জ্বেলে' কৃষ্ণবর্ণের পোযাক-পরিহিত, শ্মশ্রুগুম্ফে বদনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন, এক বিকট মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে' ব'লল—"মুস্কিল আসান!"

নিধুবাবু বিকট মুখ-ভঙ্গীতে কি ব'লতে যাচ্ছিল—শপাং করে' ঘোড়ার পিঠে চাবুক প'ড়তেই গাড়ী ছু'ট্‌ল সবেগে। 'মুস্কিল আসান' বিড়্-বিড়্ করে' গালি দিয়ে' গেল। জ্যোৎস্না শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে

"কই ব'ল্‌লি না—কোথায় যাবি?"

"কোথায় যাব, যমের বাড়ী!"

"তামাসা নয়—চল্ তোকে 'বাণীবনে' রেখে' আসি।"

"না—বাণীবনে নয়; প্রথমেই সন্ধান পাবে। আমায় নিয়ে চল তোমার সঙ্গে।"

জ্যোৎস্না স্তম্ভিত হয়ে' চুপ ক'রল—কি ব'লতে যেন কি বলা হয়েছে! তাকে বাড়ী পৌছে দেওয়ার কথাটা যেন কে ব'লতে দিল না। গাড়ী এসে' পড়েছে হাওড়া-পুলের উপর।

"বাণী-বনে নয় তো কোন চুলোয় যাবি?"

"তোমার কোন চুলো নেই!"

"তা' আছে। কিন্তু তোকে সেখানে কেমন করে' নিয়ে' যাই! সে সব চোর ডাকাতের আড্ডা। আজ যে আমি ফেরার আসামী তোরই দায়ে, তা' জানিস্?"

জ্যোৎস্নার উদ্ধত প্রকৃতি ধমক দিয়ে উ'ঠ্‌ছিল। কিন্তু গর্ব্ব তার শেষ হয়ে' গেছে। এখুনি যদি তাকে গাড়ীতে বসিয়ে' রেখে', গহনার বাক্স নিয়ে' রাস্তায় লাফিয়ে' পড়ে' নিধুবাবু চম্পট দেন, তার অবস্থা যে কি হবে—ভেবে'ই বুক হু-হু করে' ওঠে—চোখে জল গড়িয়ে' পড়ে। গালে মুখে চড়িয়ে' তখনও মনে হ'ল, যেন সে চীৎকার করে' বলে, "আমায় ফিরিয়ে রেখে এস—বাড়ীতে।"

জ্যোৎস্নাকে চুপ করে' থা'কতে দেখে' নিধুবাবু ব্যস্ত হয়ে' ব'লল, "এখুনি যে টিকিট কি'নতে হবে! কোথায় যাবি, শীগ্‌গির বল্ না?"

"বেশ লোক তো তুমি? ভায়ের সঙ্গে বাড়ী ছেড়ে' বেরিয়েছি—তোমায় ছেড়ে' কোথায় যাব? বোনকে দু'টী ভাত দিতে পা'রবে না তুমি? চাল-চুলা না থাকে—কোন জায়গায় গিয়ে' একটা কুঁড়ে ঘরও তো বাঁধতে পার!"

নিধুবাবু দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফে'লল। ষ্টেশনের টাওয়ার-ক্লকে দশটা বেজে' পনর মিনিট্ হয়েছে।

"দশটা চব্বিশে গাড়ী, শেষ গাড়ী; চল্, এখন বর্দ্ধমানেই নিয়ে' যাই।"

"সেখানে তোমার কে আছে?"

নিধুবাবু অত্যন্ত বিষণ্ণ মনে, অত্যন্ত করুণস্বরে ব'ল্‌ল, "কে থা'কবে আমার, জ্যোৎস্না? চোর, ডাকাত, গাঁট-কাটা—আমার আর কে থা'কবে? বাড়ী যাবি? চল্, রেখে' আসি। টাকা আর এই গহনা—ঘরে বসে'ই এই সাহায্যটুকু যদি ক'রতিস্, তোকে ঘাড়ে নিয়ে ফ্যাঁসাদে প'ড়তে হ'ত না। কি বলিস্—বাড়ী ফি'রবি?"

"না।"

কার কণ্ঠস্বর!—জ্যোৎস্না নিজেই অবাক্ হয়ে' গেল।

গাড়ী তখন ষ্টেশনের ফটকে দাঁড়িয়ে' পড়েছে। কথা কওয়ার আর সময় নেই—ভাই বোনে গাড়ী ছেড়ে' নেমে' প'ড়ল।

"তবে বর্দ্ধমানেরই টিকিট কাটি! আমার এক বন্ধুর বাড়ী—এক সঙ্গে জেল খেটেছি। তার বউ-ছেলে আছে—দু'দিন সেখানেই থা'কবি; তারপর, কপালে যা' আছে!"

প্রকাণ্ড হল। আলোগুলো যেন কটমটিয়ে চেয়ে' আছে জ্যোৎস্নার পানে—সে হতভম্ব। টিকিট কিনে' তিন নম্বর প্ল্যাটফর্ম্মের গেটের অদূরে নিধুবাবু থমকে' দাঁড়া'ল। গলার আওয়াজ গলা ছেড়ে' বেরোয় না—ভয়ে ভয়ে সে ব'লল, "জ্যোৎস্না, মাটী করেছে! তুই এই টিকিটখানা নে—এগিয়ে গিয়ে ঐ যে তিন নম্বর প্ল্যাট-ফর্ম্মে প্রকাণ্ড একটা কেন্নাই-এর মত গাড়ীখানা দাঁড়িয়ে, মেয়েদের গাড়ীতে গিয়ে উঠে' পড়্। আমি ঐ পাশ দিয়ে' রেল ডিঙ্গিয়ে' তোকে ধরে' নোব।"

"সে কি গো? হঠাৎ এমন কথা?"

"আরে, সর্ব্বনাশ হবে এখুনি, যা' বলি শোন—ঐ গোয়েন্দা বেটা দাঁড়িয়ে একেবারে গেটের মুখে, চোখে প'ড়লেই ঘ্যাঁপ্ করে' ধরা আর সঙ্গে সঙ্গে চালান!"

থর্-থর্ করে' তার হাতটা কাঁপ্‌ছিল—টিকিটখানা জ্যোৎস্নার হাতে গুঁজে' দিয়ে সে সরে' প'ড়ল ভীড়ের মধ্যে।

পৃথিবী তখনও সরে' গেল না জ্যোৎস্নার পায়ের তলা থেকে। কে যেন তাকে ধাক্কা দিয়ে' দিয়ে' নিয়ে' গেল প্ল্যাট-ফর্ম্মের ভিতর। চক্ষের জল শুকিয়ে' গেছে। প্রস্তর-মূর্ত্তি জ্যোৎস্না ট'লতে ট'লতে এগিয়ে চ'লল। সাম্‌নে ছিল মেয়েদের গাড়ী, দরজা কে যেন খুলে'ই রেখেছিল তার জন্যে—সে উঠে' ব'সল বেঞ্চের উপর। ঢং-ঢং করে' ঘণ্টা

বা'জল—কর্কশ ঝিল বাঁশী ফুঁকে' দিল গার্ড-সাহেব সবুজ নিশান উড়িয়ে'। গাড়ী ছু'ট্‌ল—বিকট শব্দে রাজনগরী কলিকাতা ছেড়ে'। জ্যোৎস্না নিরাশ্রয়া, নিধুবাবু এসে' তার খবরও নিল না! বিশ্বের বুকে সে আজ একা। আজ আর কেহই নাই তার সঙ্গী।

অনেক ক্ষণ জ্যোৎস্না চুপ করে' বসে' রইল গাড়ীতে। মনে হ'ল, এই অবস্থায় মৃত্যু যদি আসে, সে হাসি-মুখেই তাকে বরণ করে' নেয়। চেতনা হারালেও নিশ্চিন্ত হয় খানিক ক্ষণের জন্য। নিদ্রাও তো আসে না চোখে! আচ্ছা, মানুষ যে পাগল হয়, তার তো আর কোন জ্ঞানই থাকে না। বিধাতা কি তার কপালে এই আশীর্ব্বাদের রেখাটীও টেনে' রাখেন নি?

লিলুয়া—

চম্‌কে' জ্যোৎস্না ফিরে' তাকায় প্ল্যাটফর্ম্মের দিকে। গাড়ী ছোটে, থমকে' দাঁড়ায়, আবার ছোটে; গাড়ীতে সে একা, জানালা গলে' লাফিয়ে' পড়ার মত তো ভরসা তার হয় না! এত দুঃখেও বেঁচে' থাকার মমতা কিসের জন্য? জীবনের সবখানি নিঙ্‌ড়ে' কে যেন উত্তর দেয়—কিন্তু আবার কে যেন সে উত্তরে জ্বলে' পুড়ে' ওঠে! অনির্দ্দিষ্ট কোথাও ছুটে' চলে' যেতেই স্পর্দ্ধা বাড়ে। যাকে ভুলে' যাওয়ার জন্য এত বিপদ্ ডেকে আনা, সর্ব্বনাশের পর সর্ব্বনাশকে বরণ করে' নেওয়া —তবুও তাকে ভোলে না যে মন, সে মনেরও কি মরণ নেই? গাড়ীতে একা বসে' বসে' চিন্তার জাল মাথার মধ্যে যেন মাকড়সা টেনে' যায়। সে অন্যমনস্ক হওয়ার জন্য গাড়ীর প্রত্যেক স্থানটী নিরীক্ষণ করে' দেখে—কাঠের ফাটলে ফাটলে ধূলি-কণাও আজ যেন দর্শনের সামগ্রী হয়ে উঠেছে।

গাড়ী দাঁড়া'ল—সঙ্গে সঙ্গে এক বর্ষীয়সী নারী পুঁটুলী কাঁকে প্রবেশ ক'রল তার কামরায়। স্থূল-কায়া, পরিধানে সাদা ধুতি। এক ব্যক্তি তাকে গাড়ীতে উঠিয়ে' পায়ের ধুলো নিয়ে বলে' গেল, "পৌঁছেই চিঠি দেবেন কিন্তু"; আর সেই অসভ্য লোকটা যত ক্ষণ গাড়ী দাঁড়িয়ে' রইল প্ল্যাটফর্ম্মে, জ্যোৎস্নার দিকে এমন ভঙ্গীতে চেয়ে' রইল, যে তার মনে হ'ল, নখে করে' তার চোখদুটো উপ্‌ড়ে দিলে তার প্রায়শ্চিত্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের অন্ধকার-মূর্ত্তি দেখে' তার সর্ব্বশরীর শিউরে' উঠল। গাড়ী ছা'ড়ল ঢিকুতে ঢিকুতে।

"ও মা, তুমিও যে একলা গো? তা' ভাল হ'ল, কত দূর যাবে বাছা, তুমি?"

কথা বলে'ই সে অবাক্ হয়ে চেয়ে' রইল জ্যোৎস্নার দিকে মুখ তুলে'। দৃষ্টি আর ফেরে না—এমনই রূপ!

জ্যোৎস্না ব'লল, "বর্দ্ধমান।"

"ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়—ঐ যে তুলে' দিয়ে' গেল আমায় গাড়ীতে উনি আমার জামাই। হীরের টুকুরো—বলে, 'মা—এত রাত্রে একলা যাবে?' কিন্তু কি ক'রব, আজ বাদে কাল লক্ষ্মী-পূজা, ভিটে ছেড়ে' তো জামাইবাড়ী থা'কতে পারি না! কি বল, মা—"

"তা' বৈ কি!"

"বর্দ্ধমানে তো আমিও যাচ্ছি—কোন্ ঠিকানায় যাবে?"

জ্যোৎস্না নিরুত্তর রহিল। সে রমণী ভ্রূকুটী-কটাক্ষে অনেক ক্ষণ চেয়ে' রইল; তারপর নিজেই ব'লতে লা'গল, "ব'লতে ভরসা হচ্ছে না, বাপু—মাথায় তো সিঁদূর, অন্য গাড়ীতে সোয়ামী আছে বুঝি?"

"না।"

"বাপ্—"

"কেউ না।"

"ওমা, সে কি? বর্দ্ধমানে গাড়ী গিয়ে পৌঁছবে ভোর রাত্রে—একলা যাচ্ছ, ষ্টেশনে আপনার লোক কেউ আস্‌বে বুঝি!"

"তাও না—"

বিস্মিত হয়ে' সে ব্যক্তি আর কিছু ব'লতে ভরসা ক'রল না। গাড়ী তখন ব্যাণ্ডেল ষ্টেশন পার হয়ে এসেছে।

জ্যোৎস্না তার কাছে গিয়ে ব'লল, "ঠিক আমার মায়ের মতই তোমায় দে'খতে; আমি বড় বিপদে পড়েছি, মা, এ দায় থেকে আমায় উদ্ধার ক'রতে হবে। সোয়ামী আমার ভাল নয়—বড় জ্বালা দেয়, তাই ভায়ের সঙ্গে আস্‌ছিলুম পালিয়ে। কি জানি, ষ্টেশনে তাকে আর খুঁজে পেলুম না! কোথায় যাব মা, আমি?"

করুণ অনুনয় সে মানুষটীর অন্তরে করুণার সঞ্চার ক'রল। আশ্চর্য্য হ'য়েই সে ব'লল, "ভয় কি তোমার! বর্দ্ধমানে বাপের বাড়ী তো, যে ঠিকানায় ব'লবে—পৌঁছে দিয়ে আ'সব।"

"আমার আর কেউ নেই, মা। ভাই আমার কোথায় নিয়ে গে' তা' আমি জানি না। এখন তুমি যদি আশ্রয় দাও, তবেই রক্ষা পাই।"

সে লোকটীর চোখ উজ্জ্বল হয়ে' উ'ঠল। জ্যোৎস্নার দিকে অনেক ক্ষণ চেয়ে' থেকে ব'লল, "হুঁঃ, বুঝেছি। ঠিক লোকই ধরেছ তুমি যে পাখী খায় চিনি, চিনি যোগান তার চিন্তামণি। কোন ভয় নেই তোমার—বলি, কাজকর্ম্ম কিছু জান ত?"

"কি কাজ?"

"মুড়ি ভাজা, গরু বাছুরকে জাব্ দেওয়া। সংসারে থা'কতে গেলে যা' সব করতে হয়। বসে' বসে' কেউ তো ভাত দেবে না, মা—তাই জিজ্ঞাসা করে' নিচ্ছি।"

"ওসব পা'রব ; তবে বামুনের মেয়ে এঁটো বাসন-কোষণ মা'জতে পা'রব না, মা—"

"জল তু'লতে ? কাপড় কা'চতে ?"

"ছাড়া কাপড় কা'চতে পা'রব না।"

প্রথমে যে সম্ভ্রমের সহিত এই স্ত্রীলোকটী জ্যোৎস্নাকে দেখেছিল, তাকে নিরাশ্রয়া জেনে' এবং তারই সে আশ্রয়প্রার্থিনী বুঝে', তার গলার স্বরে তার পরিবর্ত্তে এইবার প্রভুত্বের আমেজ পাওয়া গেল। কিন্তু জ্যোৎস্নার দিকে সে যত বার চায়—তত বারই কি অপরূপ প্রভাবে তার মাথা ও মন যেন নত হয়ে পড়ে। শেষ পর্য্যন্ত এই কথাই ঠিক হ'ল—জ্যোৎস্নাকে সে নিজের ঘরেই রা'খবে। ঘরে এক বিধবা মেয়ে আছে ; আর এক মেয়ে সধবা—জামাই ঘরে থাকে। গরু, ছাগল খোঁয়াড়-ভরা—আপনার মত যদি গতর খাটায়, ভাতের অভাব হবে না। দুর্দ্দিনের এই উপায় ঈশ্বরের করুণা বলে'ই জ্যোৎস্না যেন বর্ত্তে' গেল ; কিন্তু যে ব্যথার শিহরণে তার বুক ভেঙ্গে' পড়'ছিল প্রতি মুহূর্ত্তে, দমকা নিঃশ্বাস নিয়েও হৃদয়ে সে সান্ত্বনা পেল না। সারা পথ সমস্ত অতীতটা যেন পূর্ব্ব জন্মের স্বপ্নের মতই তার মনে হ'তে লা'গল। কিন্তু সেটা স্বপ্ন তো নয়—বুক পুড়ে' ছাই হ'তে লা'গল।

গাড়ী এসে' দাঁড়া'ল বর্দ্ধমানের ষ্টেশনে। রাত্রি তখন দেড়টা। পথে জন-মানব নেই। এই মাত্র এক পশলা বৃষ্টি হয়ে' গেছে। জ্যোৎস্নালোকে দু'জনে পায়ে হেঁটে'ই গন্তব্য পথে চলেছে। জ্যোৎস্না স্তব্ধ বিমূঢ়; সঙ্গিনীর কত পরিচয় ! কথার স্রোতঃ আর বন্ধ হয় না। সব কথা তার কাণেও পৌঁছাচ্ছিল না।

সকালে উঠে'ই জ্যোৎস্নার দৃষ্টি প'ড়ল তার আশ্রয়দাত্রীর সংসারটীর উপর।

ষ্টেশন থেকে অনেক দূর, একটী ক্ষুদ্র আঁকা-বাঁকা নদীর উপর এই বাড়ীটী। বড় রাস্তা থেকে একটী ক্ষুদ্র পথে কিছু দূর গিয়েই দক্ষিণ দিকে দ্বিতল অট্টালিকা। প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। মধ্যস্থলে পাকা ইঁদারা। উঠানের দক্ষিণ দিকে চালা-ঘরে সারি সারি কয়েকটী গাভী রোমন্থন কর্‌ছিল; আর তারই এক পাশে আগড় দেওয়া খোঁয়াড়ে কয়েকটা ছাগলের বিকট চীৎকার শুনা যাচ্ছিল।

গৃহকর্ত্রীর কন্যা দু'টীরও সাক্ষাৎকার পাওয়া গেল। তারা দু'জনেই প্রথমে অবাক্ হয়ে' তার মুখের দিকে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের মা আড়ালে ডেকে' নিয়ে' গিয়ে' মেয়েদের সব কথা বোধ হয় বুঝিয়ে' দিল, তখন থেকেই তারা বেশ সহজ-ভাবেই জ্যোৎস্নার সঙ্গে কথা কইতে সুরু ক'রল।

সধবা মেয়েটী গৃহিণীর মেজ-মেয়ে। নাম চটকবালা। বড় বোন তাকে 'চুটকী' 'চুটকী' করে' ডাকে। প্রত্যুত্তরে বোনেরও নামের সঙ্গে দিদি-শব্দ যোগ দিয়ে' সে জ্যেষ্ঠত্বের সম্মান রক্ষা করে। বড় মেয়ে বিধবা, নাম ফটিকবালা। গিন্নী দুই মেয়ের পরিচয় দিয়ে' জ্যোৎস্নাকে ব'লল, "আমার ছোট মেয়ে থাকে শ্রীরামপুরে, তার নাম মটুকমালা। এই তিন মেয়ে নিয়ে' কপাল গেল পুড়ে'—কি করি, গতরের চেয়ে বন্ধু নেই। গরু-ছাগল, ধানভানা, মুড়িভাজা—মেয়েদের সাহায্যে পেটের সংস্থান হ'ল। বড় মেয়ের বিয়েও দিলুম ধুম করে', পাঁচ-শ' টাকা খরচ করে'। কপাল যায় সঙ্গে, ওরও বরাৎ পু'ড়ল বছর না ঘু'রতে। তারপর, একজন পুরুষ-মানুষ না হ'লে তো চলে না, মা—মেজ মেয়ের বিয়ে দিলুম, ঘর-জামাই দেখে'। আর ছোট'র বিয়ে হয়েছে শ্রীরামপুরে, সে কথা তুমি আগেই শুনেছ।"

জ্যোৎস্না সায় দিয়ে' গেল গিন্নীর কথায়। তারপর ব'লল, এই

কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েটীকে নিয়ে' আজ তোমার কন্যার সংখ্যা হ'ল চারটী, কেমন মা ?”

চটকবালা ও ফটিকবালা দাঁত খিঁচিয়ে' কেমন এক প্রকার মুখ-ভঙ্গী ক'রল। হাওয়া ভাল বলে' মনে হ'ল না।

ফটিকবালা বলে'ই ফে'লল স্পষ্ট করে', ঠিক যেন ভাঙ্গা কাঁসরের বাদ্য—“আভাগ্যির দশা, উড়ে' এসে' জুড়ে' বসে ! এ বাজারে ভাত ছড়া'লে কাকের অভাব হয় না—মেয়ে বলে' অঙ্গ দোলাবে, না, তা' হবে না কিন্তু বলে' দিচ্ছি। গতর পিষে' তবে ভাত !”

গৃহিণী বড় মেয়ের দিকে ভ্রূকুটী-শাসনে বুঝিয়ে' দিতে চেষ্টা ক'রল—কথাটা রূঢ় বলা হয়েছে। কিন্তু চটকবালার মুখ চাপা দেওয়া গেল না। সে বলে' ফে'লল, “বামনের মেয়ে হেঁসেলের দায় তোমার ঘাড়েই প'ড়ল, কি বল ফটিক-দি ?”

দুই বোনে হি-হি করে' হেসে' উ'ঠল। মা মেয়েদের কথা শুনে' খুব যে অপ্রস্তুত হ'ল তা' নয় ; বরং নিজেই ব'লল, “তা' তোমায় আগেই বলে' এনেছি, গতর চাই। আমরা তিন মা-মেয়েতে সংসার চালাই—আপনার মত করে' নিলে কোন ভাবনাই নেই তোমার।”

জ্যোৎস্নার মনে প'ড়ল—শ্বেত-প্রস্তর-মণ্ডিত তার সুরম্য কক্ষ ; মনে প'ড়ল—কানু, সুশীলা প্রভৃতি দাসীগণের সেবা-সম্মান। মনে হ'ল—রাজরাণী, পরাশ্রয়ে প্রতিদিন ভিখারিণীর ন্যায় অবজ্ঞা মাথায় নিয়ে' এই আশ্রয়ে দিন গুণে' যেতে হবে। চোখে তার জল এল ; কিন্তু চক্ষের জল চক্ষে মেরে' নিয়ে'ই, সে হেসে' ব'লল, “গতর খাটাতে হবে বৈ কি, মা ! বসে' বসে' ভাত খাব কোন মুখে ? কিন্তু কাজ-গুলো আমায় জানিয়ে দিও।”

কথা এত মিষ্ট, মুখে এমন অপূর্ব্ব লাবণ্য, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নবনীতের ন্যায় এমন কমনীয়—মা ও মেয়ে কারও ভরসা হ'ল না, তাকে কোন কাজের কথা ব'লতে।

গৃহিণী কেবল এইমাত্র বল'ল, "এখনই কাজ ক'রতে ব'লছি না। দু'-দশ দিন থাক, ধাং বোঝ—কাজ কি আর ব'লতে হবে তোমায়? নিজেই টেনে' নিয়ে' ক'রবে।"

কিন্তু ফটিকবালা—হঠাৎ জ্যোৎস্নার হাতখানা ধরে' হিঁচড়ে' টেনে নিয়ে' গেল গোয়ালের দিকে। তাড়াতাড়ি সে গোঁজ থেকে দড়ি খুলে', উঠানে বার করে' দিল গরুগুলোকে; আগড় সরিয়ে' নিতেই ব্যা-ব্যা ক'রতে ক'রতে এক পাল ছাগল বেরিয়ে' প'ড়ল উঠানে।

ফটিকবালার মাথায় গোঁজ-খোঁপা। রাত্রে দোক্তা দিয়ে পান খেয়েছে, দু'কষ বেয়ে' দু'দিকে ইঞ্চিখানিক তার ছোপ্। রক্ত-মুখী রাক্ষসীর মতই কর্কশ কণ্ঠে সে বলে' উ'ঠল, "আজ আমার মুড়ি-ভাজার পালা, তাড়াতাড়ি গোয়ালটাকে পরিষ্কার করে' ফেল। গোবর, ছাগল-নাদি সব, ঝাঁটিয়ে' পরিষ্কার ক'রবে—নোঙরা রেখো না কোথাও একবিন্দু, বুঝেছ?"

দুর্গন্ধে জ্যোৎস্নার মাথা ঘুরে' গেল; সে বসে' প'ড়ল গোয়াল-ঘরে। ব্যথার সাথী চক্ষের জল—এত সান্ত্বনা বুঝি আর কেউ দেয় না! কত ক্ষণ সে চুপ করে' বসে' ছিল, কে জানে—চটকবালার গলা শোনা গেল; সে গোয়াল-ঘরে উঁকি মেরে' চেঁচিয়ে' বলে' উ'ঠল, "ও ফটিক-দিদি, যা' ভেবেছি তাই—আতসী ফুল, উনি আবার গতর খাটিয়ে' খাবেন! যেমন এসেছে—ঠায় বসে' আছে—কুটো ভেঙ্গে' দু'খানা করে নি—মা-গো মা, খুব কুঁড়ে' তো তুমি!"

দুঃখের হয়তো সীমা থা'কত না। চটকের মা এসে' ব'লল,

"লোকটাকে একটু থিতুতে দে। তোরা যে ঘোড়া দে'খলে খোঁড়া হ'স! যা, জামাই উঠেছে, চা করে' দে-গে।"

"ইস্, মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ যে বেশী দে'খছি গো! বলে—'মা না বিইয়ে' বেয়াল মাসী, ঝাল খেয়ে ম'ল পাড়া-প্রতিবাসী'। দে'খব গো দে'খব, সোহাগ কত দিন থাকে!"

অতি কষ্টে জ্যোৎস্না ফটিকের মায়ের গোয়াল-পরিষ্করণ কার্য্যে কিছু কিছু সাহায্য ক'রল। একটা মুড়ো খেঙরা জ্যোৎস্নার হাতে তুলে' দিয়ে', গৃহকর্ত্রী ব'লল, "ছাগলের খোঁয়াড়টা ঝাঁট দিয়ে ফেল—নাদি-গুলো ঐ মালসাটায় তুলে' নিয়ে' পথের ধারে ওঁচ্‌লার গাদায় ফেলে' দিয়ে' এস।"

ফটিক ও চটক তাড়না করে' যে কাজ না আদায় করে, এই মা-টী মিষ্ট কথায় জ্যোৎস্নাকে দিয়ে তার চেয়ে অনেক বেশী কাজই করিয়ে নেয়। দশ দিন যেতে না যেতে, জ্যোৎস্নার ঘাড়ে হেঁসেলেরই ভার প'ড়ল। শুধু রন্ধন নয়—গঞ্জনা খেতে খেতে তার প্রাণান্ত হওয়ার উপক্রম হ'স।

জ্যোৎস্নার চন্দ্রমণী লাবণ্যচ্ছটা কালিমায় ঢেকে' গেল ; এক মাসেই কণ্ঠাস্থি আধ হাত উঁচু হয়ে' উ'ঠল। গ্রীবাদেশ ভেঙ্গে' ভারে ; শীর্ণ কলেবর উদয়াস্ত পরিশ্রমে কোন দিন ভেঙ্গে' পড়ে ঠিক নেই। অশোক-কাননে সীতাকে রাবণের চেড়ীরাও এত নির্য্যাতন করে নি—চটক ও ফটিকের তাড়নায় সে অতিষ্ঠ হয়ে' উ'ঠল। কোনদিন ভাত ধরে' গেছে, ডালে নুন দেওয়া হয় নি—মাছে আঁশ যেমন তেমনই আছে, মাছ-বাছা ভাল হয় নি—এমন কত অভিযোগ! দুই মেয়ের অত্যাচারে একান্ত অসহায়ার মত, জ্যোৎস্নার চক্ষে যখন অশ্রুসাগর উথলে' উঠে, তখন গৃহিণী এসে' সান্ত্বনা দেয় ; কিন্তু সে আরও

পীড়াদায়ক—মিছরীর ছুরীর মত হৃদয়কেই খণ্ড খণ্ড করে। সে সান্ত্বনা কার্য্যতঃ জ্যোৎস্নার দুঃখ-লাঘব করে না; বরং মেয়েদের পীড়নকেই সমর্থন করে।

এক জন কিন্তু জ্যোৎস্নার প্রতি দরদ দেখায়; আর উহা শাণিত অস্ত্রের ন্যায় জ্যোৎস্নাকে আরও অধিকতর পীড়াই দেয়—কাটা ঘায়ে নুন ছড়িয়ে' দিলেও এত যন্ত্রণা হয় না, এমনই দুঃসহ ক্লেশে সে অভিভূত হয়। এই দরদী মানুষটী আর কেহ নয়, বাড়ীর জামাইবাবু—নাম রাধানাথ। আদরের তার সীমা নাই—কাজের মধ্যে স্ত্রী ও শালীর সঙ্গে ফুক্কুরী করা। জ্যোৎস্নাকে দেখে' তার কৌতুক-ক্রীড়া উপছে' এই নবাগতাকেও স্পর্শ ক'রতে চায়—সে অতি সতর্ক হয়ে আত্মরক্ষা করে।

সেদিন মধ্যাহ্নে প্রকাণ্ড হৈ-চৈ জুড়ে' দিল চটকবালা। ফটিকবালাও তাকে সমর্থন করে' বলে' উ'ঠল, "চাই না ও-ছুঁড়ীকে আর এ বাড়ীতে একদণ্ড। কুলো বাজিয়ে' বিদেয় করে' দেওয়া হোক এখুনি।"

গৃহিণী উঠানে বসে' জ্যোৎস্নাকে দিয়ে' চুল কুলিয়ে' নিচ্ছিল। জ্যোৎস্না এই বর্ষীয়সী নারীর দুর্গন্ধ কেশপাশ কুলিয়ে' কুলিয়ে' প্রতি নিঃশ্বাসে পূর্ব্বস্মৃতির দহনে তিলে-তিলে পুড়ে' মর্‌ছিল। ঘরের মধ্যে দুই মেয়ের গলা শুনে' মা চেঁচিয়ে' ব'লল, "কি হ'ল তোদের? অত বাড় ভাল নয় তা' বলে' দিচ্ছি।"

চটক ডালের বাটি হাতে ক'রে, ঘর ছেড়ে' বেরিয়ে' মায়ের দিকে কটমটিয়ে' চেয়ে' চীৎকার করে' ব'লল, "সখের চাকরাণী তুমি নিয়ে থাক—আমরা দুই বোনে এখুনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাব। বলি—এত টান কিসের! ও মা, সহরের মেয়ে, আমরা চলি যদি ডালে, উনি চলেছেন পাতার শিরে শিরে!"

"চুপ কর্—গলা ফেঁড়ে' চেঁচাতে হবে না। কি হয়েছে শুনি!"

"তুমি একটু মুখে দিয়ে' দেখ, মা—যদি এক ফোঁটা নুন দিয়েছে এতে!"

"তাই ভাল—এর জন্যে ডাকাত-পড়া-পড়ি কেন? কাজে কর্ম্মে অমন ভুল-চুক তোদেরও হয়।"

ফটিকবালা তর্জ্জন করে' উ'ঠল, "ভুল-চুক হবে না কেন? কিন্তু—'

"কিন্তু আবার কি?"

"জামাইবাবু যে হাপুস্-হুফুস্ খেয়ে' উঠে' গেল, তার মানে কি?"

"তার আবার মানে কি থা'কবে? তোদের মত কুঁদুলে নয়।"

"হ্যাঁ, কুঁদুলে নয়? বুড়ো হয়েছ, কিছু বোঝ না!"

"এতে আর কি বোঝাবুঝি আছে বল্?"

"চোখের মাথা খেয়েছ, দে'খতে পাও না"—ফটিকবালা উপরের দিকে দৃষ্টি ফেরা'তেই সকলের দৃষ্টি দ্বিতলের বারান্দার উপরে গিয়ে প'ড়ল—রাধানাথ মুচকে' হাস'ছে, পিট্-পিট্ করে' চেয়ে আছে নির্লজ্জের ন্যায় জ্যোৎস্নার দিকে, মুখে একমুখ সিগারেটের ধোঁওয়া ছাড়্ছে ধীরে ধীরে।

চটকবালা বুকে দু'-ঘা চাপড় মেরে' বলে' উ'ঠল, "ফটিকদিদি মিথ্যা বলে নি—দুধ দিয়ে কাল-সাপ পুষেছ, মা—তোমার জামাইকেও ও-মাগী গিলে' খেয়েছে!"

কি সর্ব্বনাশ! পেছনে গোঁ-গোঁ শব্দ শুনে' চটকের মা ফিরে' চাইতেই দে'খল—জ্যোৎস্না অজ্ঞান হয়ে' পড়ে' গেছে।

মুখে-মুখে অনেক কথাই পাড়ায় ছড়িয়ে' প'ড়ল। নারুর মা, বামুন-পিসী নবী-ঠাকুরঝি, নূতন গিন্নী চটক ফটিকের বাড়ী

আনা-গোনা জুড়ে' দিল। দুই বোনের সঙ্গে ইশারায় ইঙ্গিতে কত কথা—"মাগীকে নিশ্চয়ই বশ করেছে। জামাই-এর দোষ কি—জোয়ান ছেলে, এখন কত পিপাসা! সোণার ঘটী করে' সামনে জল রেখে' দিলে—ওর আর দোষ কি মা!" ইত্যাদি

বড় বোন কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বামন-পিসীর পায়ে ধরে' বলে, "দোহাই পিসি, চুটকীকে একটা মাদুলী-টাদুলী দাও, জামাইবাবু না পর হয়। মা আর আমাদের কথা শোনে না।"

অহল্যা পাষাণ মূর্ত্তি ধরেছিল পুরাণে আছে—জ্যোৎস্নার শরীরে আজ আর রক্ত-মাংসের সাড়া পাওয়া যায় না। সে যেন কি হয়ে' গেছে! কত কাঁদবে—এই ক্ষুদ্র চোখ দুটোয় কত অশ্রু থা'কতে পারে? এই রক্ত-মাংসের বুকে কত যাতনা সয়? সে আর ভা'বতে পারে না! কাঁদারও শক্তি গেছে। এক মুঠা ভাতও পেটে যায় না—তবুও বেঁচে' থাকে কেমন করে', কে জানে? কোথায় গেল তার মুখের ভাষা, কোথায় গেল সে অভিমানের গর্ব্বোন্নত গ্রীবা-ভঙ্গী—দম্ভ, মান, অহঙ্কার, কার আশ্রয়ে এমন করে' উন্নত শির তুলে' উ'ঠত, আজ ফণা তুলে' ধরার শক্তিও কেড়ে' নিল কে? মরণ শ্রেয়ঃ। পাপ কে করেছে, তার স্বামী রঞ্জন? না—না—এমন সর্পের দংশন, দুঃসহ বিষের জ্বালা—সে কেন সইবে, সে যে স্বর্গের দেবতা! সংশয়ের ক্রিমি সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে' ধরে' তাকে নরকে টেনে' নিয়ে এসেছে—প্রায়শ্চিত্তের শেষ একদিন হবেই। কিন্তু সে দিন—না! সে সৌভাগ্য এ-জীবনে আর আ'সবে না। অহল্যার পাষাণ প্রাণেও জীবনের মন্দাকিনী-ধারা নেমে' এসেছিল—এই মরু-প্রাণ জ্বলে' জ্বলে'ই শেষ হবে। দেবতার দেখা আর পাওয়া যাবে না।

ভোরে আর কেউ উ'ঠে না—জ্যোৎস্নার প্রেতমূর্ত্তি ঘুরে' বেড়ায়

উঠান ঝাঁট দিয়ে'—গোয়ালের গোবর কুড়িয়ে', ছাগল-নাদি ঝাঁটিয়ে', চটক-দিদির ছাড়া কাপড় পরে' তাকে বাসনও মা'জতে হয়, ঘর-দুয়ার ধু'তে হয়। সংসারের ছেঁড়া-ফোঁড়া কাপড় গুছিয়ে' লজ্জা নিবারণ ক'রতে হয়। ভাত বেড়ে' ডাকাডাকি ক'রতে হয়—সবাইকেই নত মুখে দীন-কণ্ঠে। কেন? জ্যোৎস্না নিজেই উত্তর দেয়, স্বামীকে সংশয় করেছি—তার প্রায়শ্চিত্ত!

কুয়াশায় ভরে' গেছে উঠান—দৃষ্টি চলে না। গোয়ালঘরের সাম্‌নেই পুরুষ-মূর্ত্তি—জামাই রাধানাথ।

জ্যোৎস্না হেসে'ই ব'লল, "জামাইবাবু, কি আছে আমার! এই শুক্‌নো হাড়-মাংসের লোভ, শকুনীও করে না—আপনি পুরুষ, দুঃখের মাত্রা আর বাড়া'বেন না।"

দুয়ারে শব্দ শোনা গেল। রাধানাথের মুখে উত্তর নেই—সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে' পালা'ল।

জ্যোৎস্নার আর লজ্জা নেই! এমন কত দিন রাধানাথ তার সম্মুখে প'ড়েছে! আড়াল পেলেই সে এসে' হাজির হয়; কিন্তু এ-কথা বলার উপায় নেই—দোষের মাত্রা-বৃদ্ধি হবে তার নিজেরই। কাকুতি-মিনতি ছাড়া আত্মরক্ষার আর দ্বিতীয় উপায় ছিল না তার। বাড়ীতে এমন আশ্রয় কিছু নেই যে সে সান্ত্বনা পায়, ভবিষ্যতের আলো নিরীক্ষণ করে। বন্দিনীর চেয়েও তার অবস্থা অধিক শোচনীয়!

এসে' পর্য্যন্ত সে বাড়ীর বাহির হয় নি—পথে বেরিয়ে' আরও কি বিপদ্ বা'ড়বে, কে জানে! কিন্তু সব চেয়ে নিরাপদ্ মরণ—সে আহ্বান দিন রাত আসে, সে কাণ দেয় না। দুই দিন, তিন দিন উপবাসের পর প্রাণ যখন হাঁপিয়ে' উঠে' বাহির হ'বার উপক্রম হয়, সে নিজেই অনশন-ভঙ্গ করে। শত সাধ্য-সাধনায় দুই তিন দিন সে অন্নজল গ্রহণ করে না।

কিন্তু শেষে প্রাণের তাগিদ যখন বড় হয়ে ওঠে, এক কথায় এক ঘটী জল গলায় ঢেলে' দেয়। আঃ, তবু আশা—পরজন্ম আছে কিনা, জানে না, এই চক্ষু দু'টী দিয়ে যে রূপ এঁকে' উঠেছে বুকে, নয়ন-পল্লব মুদিত হওয়ার আগে আর একবার সে রূপের সাক্ষাৎ পাবে না কি? এই আশা—এই আশায় বেঁচে' থাকা!

ভাগ্য-দেবতার লীলা অচিন্ত্যনীয়। এক রাত্রের দুর্ঘটনায় জ্যোৎস্নার জীবন-চক্র ঘুরে' গেল এক নিমিষে। আগে তাকে শুতে দেওয়া হয়েছিল সিঁড়ির পাশে একটী ছোট ঘরে। রাধানাথবাবুর অনুগ্রহদৃষ্টি প্রকাশ হওয়া মাত্র, শয়নের পর দুই বোনে শিকল তুলে' দিয়ে' চাবী দিয়ে' যাবার ব্যবস্থা হ'ল। অদৃষ্টের পরিহাস, জ্যোৎস্নার কপালে এত দুঃখও ছিল! সমুদ্রে যে শয়ন করে, শিশিরের ভয় তাকে ছা'ড়তেই হয়—জ্যোৎস্নার অবস্থা ক্রমে এমনি নির্ব্বিকার হয়ে' উঠেছিল। কিন্তু এ ব্যবস্থা চলার পথে সংসারেরই ক্ষতি দেখা গেল। ঘোড়া দে'খলে খোঁড়া হওয়ার মত মা এই দাসীটীকে বিনা-মূল্যে খরিদ করে' আনার পর থেকেই গৃহবাসীদের শয্যাত্যাগে প্রতিদিনই বিলম্ব হওয়ায়, জোৎস্নারও শুয়ে থাকার মাত্রাটা বেড়ে' উঠেছিল। এ তাদের সহ্য হ'ল না—শেষে স্থির হ'ল, জ্যোৎস্না মায়ের কাছেই শোবে।

অগ্রহায়ণ মাসের ঠাণ্ডা রাত। জ্যোৎস্না একখানা ছেঁড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে' আছে—চট্ পেতে' মেঝের উপর। চটকের মা নাক ডাকিয়ে' ঘুমোচ্ছে তক্তপোষে নিশ্চিন্তে। গভীর রাত্রিতে যেন মনে হ'ল, ঘরের খিল কে খুল্ছে; তারপর ধীরে ধীরে দরজা ফাঁক হ'তেই এক ঝলক হিম ঘরে ঢুকে' প'ড়ল—সঙ্গে সঙ্গে এক পুরুষ-মূর্ত্তি!

জ্যোৎস্নার পায়ের তলা থেকে মাথার কেশাগ্রভাগ পর্য্যন্ত ভয়ে শিউরে' উ'ঠল। সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হ'ল বটে; কিন্তু বাহির থেকেও

চটক ও ফটিকের গলা শোনা গেল—তারা দুয়ারে ধাক্কা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হৈ-চৈ জুড়ে' দিয়েছে। চোর ডাকাত পড়ার চেয়েও গোল-যোগ! লোকটা এক মুহূর্ত্তে দরজা খুলে', দুই বোনকে ধাক্কা দিয়ে' ঘর থেকে বেরিয়ে' গেল।

গোল-মালে গৃহিণীর নিদ্রাভঙ্গ হ'ল। রাক্ষসীর মত মেয়ে দুটো ঘরে ঢুকে', একজন ধ'রল জ্যোৎস্নার চুলের মুঠি, আর একজন লাথী মা'রতে মা'রতে তাকে নিয়ে' এল ঘরের বাইরে। তাড়াতাড়ি মা বারান্দায় এসে' সত্রাসে ব'লল, "ছেড়ে' দে, ছেড়ে' দে; একটা খুন হবে যে রে, কি কাণ্ড তোদের!"

চটকবালা গলা ফেঁড়ে' চেঁচিয়ে' উ'ঠল, "খুনই তো ক'রব, ওর রক্তে আল্‌তা প'রব, তবে আমার নাম চটকবালা। মাগী নাক ডাকিয়ে' ঘুমোচ্ছে—কি কাণ্ড! হুঁস্‌ আছে তোমার?"

চটাপট্‌ চটির শব্দ ক'রতে ক'রতে জামাইবাবু এসে' হাজির। এতদিন কোন আস্ফালন তার মুখে শোনা যায় নি—পৌরুষের কোন নিদর্শনই কারও চক্ষে পড়ে নি। আজ প্রচণ্ড-মূর্ত্তি ধরে' হাঁকুনি দিয়ে সে বলে' উ'ঠল, "হারামজাদি, মেরে পস্তা উড়িয়ে দোব—ছেড়ে' দে বল্‌ছি ওকে—কিছু বলি না বলে' না—"

মেষপালের মধ্যে হঠাৎ ব্যাঘ্র লম্ফ দিয়ে প'ড়লে, যেমন তারা ছত্র-ভঙ্গ হয়, দুই বোনে জ্যোৎস্নাকে ছেড়ে' দিয়ে তেমনি সরে' দাঁড়া'ল। তারা নিজেদের সাম্‌লে নিতে না নিতেই রাধানাথ বাবু সদম্ভে বলে' উ'ঠল, "তোরা সাপের পাঁচ পা দেখেছিস্‌ না! কালই ওকে নিয়ে আমি কলকাতায় যাচ্ছি—দেখি, কার বাবা আমায় ঠেকাতে পারে?"

ফটিকবালা রণে ভঙ্গ দেওয়ার উপক্রম ক'রল। জামাই বাবুর এমন

রুদ্র-মূর্ত্তি সে কোনদিন দেখে নি। কিন্তু চটকবালা ছা'ড়বার পাত্রী নয়; সে ব'লল, "দেখ, পথে হেগে' চোখ রাঙ্গালে চ'লবে না। তুমি ঘরে ঢোক নি?"

"ঢুকেছি—তোর বাবার কি?"

"ও তোমায় খিল খুলে' দেয় নি? যার শিল তার নোড়া—বসে' বসে' ভাঙ্গ্‌বেন আমারই দাঁতের গোড়া—বড় মজা নয়!"

"চোপ্‌রাও শূয়ার! মিথ্যা কথা বলিস্ নে বল্‌ছি, চুট্‌কি—খিল আমি নিজেই খুলেছি।"

"মিথ্যে কথা আমি ব'লছি! চোর মিথ্যবাদী কোথাকার! তুমি খিল খু'ললে, আস্‌মান থেকে নয়?"

"হ্যাঁ। দেখাচ্ছি—আমি ব'লছি, দোষ যদি কিছু হয়ে থাকে সে, আমার—ওর নয়।"

এই বলে' রাধানাথ শ্বাশুড়ীকে ঠেলে' ঘরে ঢুকিয়ে' দিয়ে' ব'লল, "দাও ত মা খিল তুমি!"

সে রমণী হতভম্ব হয়ে' ঘরে ঢুকে' খিল তুলে' দিল। সকলে বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে হ্যারিকেনের আলোয় দে'খল—দুয়ারের সরু গর্ত্ত গলিয়ে' একটা কালো তাসার স্যুতো ঝুল্‌ছে; সেটা খিলের সঙ্গে এমন করে' উপরের গর্ত্ত দিয়ে বাহিরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে যে, রাধানাথ সেটা ধরে' ধীরে ধীরে টান দিতেই খিল্‌টা খুলে' গেল ঝনাৎ করে'। দুর্দ্দশার সীমা-প্রান্তে দাঁড়িয়েও জ্যোৎস্না হেসে' ফে'লল—ফিক্ করে'। ফটিকবালা অবাক্ হয়ে, তাড়কা-রাক্ষুসীর মত চেয়ে' রইল জামাইবাবুর দিকে। চটকবালা কিন্তু জবাব দিতে ছা'ড়ল না, "এমন চুরি করে' ঘরে ঢুকেছিলে—কি মতলবে শুনি?"

"কিন্তু এ-কথা ঘরে গিয়ে ব'লব, শুন্‌বি আয়। এই কথাটা জেনে

রাখ্‌—ও-মানুষটীর কোন অপরাধ নেই। তোদের চেয়ে হাজার গুণ ওর রূপ আছে, গুণেরও সীমা নেই—শাপ-ভ্রষ্টা দেবী!"

এক ঘণ্টা পরেই আবার নিশুত রাত্রের স্তব্ধতা! জ্যোৎস্নার আর ঘুম হ'ল না। তার মনে হ'ল সতী-ধর্ম্মের বর্ম্ম পুরুষ, নারী নয়। নারীর মর্য্যাদা নারী রক্ষা করে না—স্বয়ং ভগবানই যেন আজ তার রক্ষাকর্ত্তা। জ্যোৎস্নার হৃদয়ে আজ কার ভাস্বরমূর্ত্তি ফুটে' উ'ঠল—রাধানাথের কণ্ঠ দিয়ে তারই যেন দৈববাণী শোনা গেল!

ঝিম্‌-ঝিম্‌-ঝিম্‌! অন্ধকার রাত্রি নিশাচর পক্ষীর ন্যায় ঝিমিয়ে পড়েছে। চটকের মা আবোল-তাবোল ব'লতে ব'লতে অনেক ক্ষণ হ'ল ঘুমিয়ে পড়েছে; তার আর সাড়া নেই। ঘরে বাহিরে গভীর স্তব্ধতা - নিস্পন্দ গভীর রাত্রি।

জ্যোৎস্না ধীরে ধীরে খিল খুলে' দরজা ভেজিয়ে' দিল। আজ সে একা। উঠানে এসে' দাঁড়িয়ে দে'খল, যেন কোন ঘটনাই ঘটে নি কয়েক দণ্ড পূর্ব্বে। চায়ের বাটি নিয়ে' কাল সকালেই জামাইবাবুর কাছে যেতে হবে, লজ্জা-সরমের মাথা খেয়ে'; আর গোয়াল ঝাঁট দিয়ে' রাঁধতে ব'সবে সে খুর্‌সি-পিঁড়ে পেতে দাসীর মত—এই উঞ্ছ সংসারে। কেন? কি পাপ করেছে সে? হাতখানা তিনকড়ি একবার ছুঁয়েছিল বলে' সে দেবতার চরণে করপল্লব স্থাপন করে' পূজার অধিকার হারিয়েছে—ততোধিক পাপে জীবনের সেবা কোথায় অর্ঘ্য দিয়ে চলে—কার আসনের সাম্‌নে ভাতের থালা ধরে' দিতে হয়—কিসের জন্যে এই লাঞ্ছনা এই অত্যাচার সে মাথা পেতে' নেবে! ফিরে' যাবে সে আবার নিজের ঘরে—যদি দাসী-বৃত্তি ক'রতে হয়, কাদু-সুশীলার সে সহকারিণী হবে—প্রত্যক্ষে না হোক, সে সেবা তার পতি-দেবতার চরণতলেই গিয়ে পৌঁছাবে।

স্বামী! স্বামী!! অব্যক্ত আর্ত্তনাদ; কিন্তু বুক যেন সাহসে ভরে' গেল।

গলিপথ ছাড়িয়ে', বড় রাস্তা ধরে', জ্যোৎস্না এগিয়ে চ'লল দ্রুতপদে। দক্ষিণে পড়ে' রইল রাজ-কলেজ, রেলিং দেওয়া রাজবাটীর ফটকে দাঁড়িয়ে' দাঁড়িয়ে' বন্দুক কাঁধে সিপাইটা ঝিমুচ্ছে অঘোরে। বড়বাজারের এখনও সব দোকান বন্ধ হয় নি; লোক-সমাগম আছে—কিন্তু কেউ ফিরে'ও চাইল না তার দিকে। সে সোজা পথে গিয়ে' উ'ঠল বর্দ্ধমান ষ্টেশনে। গাড়ী ছাড়ার শেষ ঘণ্টা তার কাণে গেল। সামনেই একখানা গাড়ী। দরজা খুলে' ভিতরে প্রবেশ ক'রতেই, কুক্ দিয়ে, গাড়ী ছেড়ে' দিল—ফোঁসাতে ফোঁসাতে।

কামরার মেঝের উপর এক ব্যক্তি কম্বল পেতে' শুয়ে' ছিল; সে বিরক্ত হয়ে বলে' উ'ঠল, "কোন্ হ্যায়! ডবল ভাড়া, উতার্ যাও।"

গাড়ী চলেছে সবেগে—প্ল্যাটফর্ম্মের আলোগুলো যেন দ্রুত বিদায় নিতে পা'রলে বাঁচে; জ্যোৎস্না গাড়ীর দরজার পাশে কাঠ হয়ে' দাঁড়িয়ে রইল। সুইচ্ টিপে' সে ব্যক্তি দে'খল—এক রমণী-মূর্ত্তি! সেকেণ্ড ক্লাসের কামরায় গদীর উপর যে ব্যক্তি শুয়েছিল, সে বলে' উ'ঠল "রহেনা দেও।"

— দশ —

রঞ্জনের মন হাল্কা হয়ে গেল টুনুর গানে। মা বসে' শুন্‌ছিলেন টুনুর গান। ঘরের বাহিরে বারান্দায় বসে' ছিল কাদু ও আরও অনেকে। গান থাম্‌তেই, সে বলে' উ'ঠল, "দিদিমণি, থেমো না—গান যখন গাও, কোথায় যেন যাই; আর যেমনি থাম, ধফাস্ করে' সেই পৃথিবীতে আছ্‌ড়ে পড়ি!"

মা'ও টুনুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্‌লেন, "এ গান শুন্‌লে বনের পশু-পক্ষীও মোহিত হয়, এমন গলা পেলে কোথায়? এমন গান তোমায় শেখালে কে?"

রঞ্জন বল্‌ল, "কেন, মা? টুনুর গান তুমি তো আগেও শুনেছ অনেক বার, আর হাতে ব্যাঞ্জো বাজ্‌ত যেন সরস্বতীর বীণার ঝঙ্কার! ও গান-বাজনায় সকলের সেরা ছিল।"

"সে গান, বাজনা—এর সঙ্গে তুলনা কর্‌ছিস্ তুই? কাদু ঠিকই বলেছে—গান শুন্‌লে জ্ঞান হারাতে হয়—যেন কোথায় নিয়ে যায়, সংসার-ধর্ম্মের কথা আর মনে থাকে না!"

রঞ্জন টুনুর মুখের দিকে চাইতেই, টুনুও তার দিকে চেয়ে' হেসে' ফেল্‌ল। প্রশংসায় তার মুখখানি ঈষৎ রক্তাভ হয়ে উঠেছিল। কেশপাশ মুক্ত; কপালে, চিবুকে, পৃষ্ঠে ঢেউ তুলে' ছড়িয়ে পড়েছে। ললাটের স্বেদবিন্দু চাঁপার কলির মত আঙ্গুল দিয়ে মুছে' ফেলে', কোলের উপর সেতারখানি তুলে' নিয়ে, সে আবার গান ধর্‌ল—

ধেনু সঙে আওত নন্দলালা।
গোধূলি ধূসর শ্যাম কলেবর
আজানুলম্বিত বনমালা॥

ঘন ঘন শিঙা রেণুরব শুনইতে
ব্রজবাসিগণ ধায়—
মঙ্গল থারী দীপ করে বধূগণ
মন্দির-দ্বারে দাঁড়ায়।

গান গমকে গমকে সুরের মূর্চ্ছনা তুলে' ছুটেছে উধাও হ'য়ে, ঝন্-ঝন্-ঝন্ তারের ঝঙ্কার সুরের সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে তালে পা ফেলে' চলেছে। হৃদয়ের পর্দ্দায় নৃত্যস্পন্দন, মধুময় অনুভূতি শ্রোতাদের মাতিয়ে তুলেছে। অপরাহ্নের অবসাদ মুক্ত করে', গৃহের রুদ্ধ বাতাসে মীড়ে মীড়ে সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি—

ব্রজবাসিগণ বাল-বৃদ্ধ জন
অনিমেষে মুখশশী হেরি।
ভুলিল চকোর চাঁদ যনু পাওয়োল
মন্দিরে নাচয়ে ভেরী॥

রঞ্জন অনিমিষে টুনুর মুখের দিকে চেয়েছিল। টুনুর চক্ষে জল; ভারী গলায়, কাঁপা স্বরে গদ-গদ কণ্ঠে সে গাইছে—

গোপন নবহুঁ গোঠে পরবেশল
মন্দির চলু নন্দলাল।

'নন্দলাল' কথার সঙ্গে তার বাণী যেন আর বাহির হয় না—কণ্ঠেই সুর মিশিয়ে যায়, শিথিল হাতখানি যন্ত্রবাদনে শেষে অচল হয়ে প'ড়ল। কি আশ্চর্য্য, টুনু নীরব নিস্পন্দ—কি গম্ভীর প্রতিমূর্ত্তি তার! রঞ্জন অসহায়ের মত একবার মায়ের দিকে ফিরে' চাইল—মায়েরও ধ্যানমূর্ত্তি। বাহিরের দিকে চেয়ে', কাতুর সঙ্গে আরও দুই চারি জনকে নিস্তব্ধ হয়ে

বসে’ থাক্‌তে দেখে’, নিজের অবস্থাই তার একান্ত অস্বাভাবিক বলে’ মনে হ’ল। সবাই টুনুর গানে বিভোর—কিন্তু রঞ্জনের মন-চকোর চঞ্চল অস্থির। টুনুর রূপরাশি ঘিরে’ই সে উড়ে’ বেড়ায়। ঘরের স্তব্ধতা যত ঘন হয়ে ওঠে, ততই তার অস্বস্তি বোধ হয়। সোফায় সে বসেছিল—উঠে’ দাঁড়াল; হঠাৎ টুনুর দিকে দৃষ্টি প’ড়তেই তারও আবেগ-বিভোর সদ্যপ্রস্ফুটিত কমলবিকাশের ন্যায় দৃষ্টি ফুটে’ উঠ্‌ল মধুবৃষ্টি করে’। টুনুর ঠোঁটে হাঁসি; কিন্তু রঞ্জন সে সুধারাশি সোয়াস্তির সহিত অনুভব ক’রতে পা’রল না, যেন মনে হ’ল—টুনুর গান, টুনুর সঙ্গ, টুনুর রূপ সবই ক্রমে তাকে অপরাধী করে’ তুল্‌ছে। সে ক্রমেই লঘু হয়ে পড়ে। টুনুর ঔদার্য্যের সে সীমা খুঁজে’ পায় না; কিন্তু তখনই হৃদয় গুরুভাবে নুয়ে’ পড়ে অকারণে।

এই ভাবেই রোজ অপরাহ্ণ কাটে, আজ নূতন নয়; টুনু সারাদিন গান গায়, সন্ধ্যার পর নৈশভোজনের থালি নিয়ে আসে, চায়ের পেয়ালা প্রাতরাশের সঙ্গে টুনুই বহন করে’ আনে—যেন স্বর্গ থেকে অমৃত এনেছে টুনু এই ক্ষুদ্র সংসারটীর মাঝে। দিন শুধু তারই স্বচ্ছন্দে কাটে না; প্রত্যেকে ভুলে গেছে দুর্ঘটনার ইতিহাস। জ্যোৎস্না বলে’ কেউ যেন এ-সংসারে ছিল না, এমনই হয়েছে সংসারের অবস্থা।

আজ গানের শেষে টুনুর দৃষ্টি-মধুটুকু যেন সহজে সে হজম ক’রতে পা’রল না, লঘু হৃদয় বিকল হয়ে প’ড়ল; তার মুখের দিকে সে চেয়ে’ রইল অনেক ক্ষণ। হাসি সম্বরণ করতে গিয়ে, প্রথম বিদ্যুৎ-চমক যেমন বিনা গর্জ্জনে মেঘের কোলে মিশিয়ে যায়, তেমনি নিঃশব্দে টুনু হাসির রেখাটী রাঙা ঠোঁটে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা ক’রলেও, রঞ্জনের অপলক দৃষ্টির তাড়নায় আর স্থির থাকা গেল না—গুড়্‌-গুড়্‌ করে’ হাসির ধ্বনি উ’ঠল ঘরখানি মুখরিত করে’। শ্রোতারা সচকিত হয়ে’

দে'খল—টুনু মানুষ নয়, আপনহারা, আত্মভোলা ব্রজের গোপী—স্বর্গের দীপ্তি তার মুখে।

॥

মাস ছয় আগের কথা। টুনুকে নিয়ে বাড়ী ফি'রতেই, রঞ্জনের মাথায় বজ্রপতন হ'ল। কালবৈশাখীর ঝড়ে এক ফোঁটা মেঘ আকাশে যেমন অন্ধকার ঘনিয়ে দেয়, সেইরূপ জ্যোৎস্নার নিরুদ্দেশে তার মনে সংশয়ের কণাটুকু কালির আঁচড় টেনে' দিল তার সবখানিতে। সে ধৈর্য্যহারা হয়ে মার কাছে চীৎকার করে' বলে' উ'ঠল, "পাঁড়াগেঁয়ে একটা পেত্নীকে ধরে' আনার বিষময় পরিণাম! আত্মহত্যায় এ জ্বালার নিবারণ হয় না। খুন ক'রব—ফাঁসী যাব!"

মা ছেলের মুখের দিকে ভ্রূকুটী-কটাক্ষে একবার চেয়ে' ব'ললেন, "তুই কি মনে করিস্, বৌমা কুল-ত্যাগিনী হয়েছে?"

অব্যক্ত বেদনার ভাষা ছিল না। কথার প্রত্যুত্তরে হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ উঠ্‌ল, "কোন সংশয় নেই, মা—বিষ দাও, বিষ খাই। মা হয়ে' গলায় ছুরী বসিয়ে দিয়েছ!"

মা এই কথায় বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। কিন্তু সন্তানের মনোব্যথার নিরসন কথায় হবে না বুঝে'ই, এই বিষয় নিয়ে কোন কথা আর উত্থাপন করেন নি।

টুনুর আগমন প্রথমে তাঁর অসহ্য মনে হয়েছিল; পরে তার অমায়িক দিব্য স্বভাব-গুণে তিনি ইহা ঈশ্বরের দান বলে'ই গ্রহণ ক'রলেন—এই অবস্থায় টুনুই হ'ল একমাত্র উপায়। রঞ্জনের ভগ্ন মনে মায়ের স্নেহ-বচন স্থান পেতে পারে না। টুনুর অনুরাগ-লেপনে অন্তর-জ্বালার লাঘব হবে, এই বিশ্বাস তাঁর বৃথা হয় নি। ছেলের শুশ্রূষা ও সান্ত্বনার সকল ভার টুনুর হাতে ছেড়ে' দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন।

মায়ের চিকিৎসা ও ঔষধের ব্যবস্থা অকাট্য হ'ল—একপক্ষ কাল মধ্যেই রঞ্জনের কালিমাচ্ছন্ন অপ্রসন্ন মুখে হাসির রেখা ফুটে' উ'ঠল। "টুনু" "টুনু"—রঞ্জনের কণ্ঠে এ ডাক প্রতিনিয়ত শুনা যেতে লা'গল—রঞ্জন টুনুকে এক দণ্ড ছেড়ে' একা থাকে না। সন্তানের সান্ত্বনায় জননীর বুক জুড়িয়ে গেল। বাড়ীতে আগমন করে'ই টুনু যে আব্‌হাওয়ায় পড়েছিল, মায়ের উদাসীন ব্যবহারে যে ক্ষুণ্ণতায় সে কাতর হয়েছিল, রঞ্জনের হা-হুতাশে সে যেরূপ পীড়িত মনে করেছিল—ক্রমে সে সকলের পরিবর্ত্তন হওয়ায়, সে যেন এই অবস্থায় নিজের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করে' নিতে পেরেছিল।

ভোরে টুনুর গানে সংসার মুখরিত হয়—রঞ্জনেরও ঘুম ভাঙ্গে। গুন্‌-গুন্‌ করে' গান গাইতে গাইতে টুনু আসে প্রাতরাশ নিয়ে রঞ্জনের কাছে। ক্রোধ, অভিমান দুই একদিন রঞ্জনের খুবই ছিল। ভোজনে সে অপ্রবৃত্তি দেখাত, কোন দিন আধ-খাওয়া করে'ও উঠে' প'ড়ত। টুনু পীড়াপীড়ি কর্‌লে, হাত জোড় করে' সে ব'লত, "দোহাই তোমার—খাওয়ার কথা বলো না! এ অপমান বেঁচে' থেকে সওয়া যাবে না—আমায় ম'রতে দাও।" টুনু স্বভাব-সুন্দর কথায় ব'লত, "কিসের অপমান তোমার? বউদিদি লুকোচুরি খে'লছেন—আবার আ'সবেন। দুঃখের, অপমানের শেষ একদিন আছেই; তখন বুঝ্‌বে, টুনু মিথ্যা বলে নি।"

রঞ্জন অবাক্‌ হয়ে' যায় এই কথা শুনে'; বলে, "বল কি টুনু? জীবন-মরণ নিয়ে কথা—খেলা বলে' উড়িয়ে দাও! আমি কি কিছু জানি না! মা আছেন তাই, তা' না হ'লে দেখ্‌তে কি প্রতিশোধ নতুন। আজ আমি অসহায়।"

এইরূপ কথা প্রায় হয়। রঞ্জনকে হাতের মুঠায় এনে', টুনু একদিন অধর দংশন করে' চাপা গলায় ব'লল, "কি জান বলত—তুমি যদি

দশদিন কাকেও না বলে' বাড়ী ছেড়ে' যাও, তোমায় যারা জানে, তারা কি এমন মন্দ ধারণা তোমার উপর ক'রতে পারে? অবলা বলে' এই শাস্তি দেওয়ার প্রায়শ্চিত্ত আছে, তা' জান?"

রঞ্জন এই অনিন্দ্যসুন্দরীর দিকে ক্ষাণিক ক্ষণ চেয়ে' রইল। এমন কথা নূতন বটে! সে ব'লল, "তুমি অনেক যুক্তি শিখেছ, তর্কে পেরে' উঠ্‌ব না। কিন্তু আমি যা' জানি, কেউ তা' জানে না। আমার মন একেবারে ভেঙ্গে' গেছে, আর জোড়া যাবে না। এ জীবনই ব্যর্থ—এ মুখ দশ জনের সাম্‌নে বা'র করা যায় না।"

টুনু উত্তর দিল, "যে কথা তুমি জান, সে কথা আর কেউ যদি না জানে, না জানাও—তার বিচার নাই। সে কথা আর উচ্চারণ ক'রতে পা'রবে না—মনে মনে'ই সে কথা রেখো—"

সাম্‌নে অন্নের থালি ছিল—মুখের দিকে চেয়ে' ব'লল, "এখন খাও—দশ জনের মত স্বচ্ছন্দে বেড়িয়ে বেড়াও। বাজে কথা আর ব'লতে পাবে না—বলে' দিচ্ছি!"

রঞ্জন কথার জবাব দিল না। স্মৃতি যখন জাগে, মন পুড়ে' যায়, খাওয়া-দাওয়া যেন বিষ মনে হয়।

টুনু কিন্তু নাছোড়বান্দা। তাকে যথারীতি খেতেই হয়—শরীর ধারণের জন্য যত কিছু প্রয়োজন, টুনুর যত্নে তার কিছুই বাদ যায় না। ক্ষুব্ধচিত্ত, ক্ষতবিক্ষত মন প্রাণ নিয়ে রঞ্জন টুনুর চিকিৎসায় এমনভাবেই সুস্থ হয়ে উঠ্‌ছিল। কিন্তু জীবনের প্রশ্ন সে ভুলে' যেতে পারে না; মনে উঠে', মনেই তার লয় হয় না। সমস্যার সমাধান আছে; ইহাতে উদাসীন হওয়া রঞ্জনের পক্ষে সম্ভব নয়। একদিন এই নিয়ে কথায় টুনুর সঙ্গে তার ঝগড়া বেধে' গেল।

টুনু গান গায়, সকাল সন্ধ্যায় আসন-পীঁড়ি হয়ে' ছাদের এক কোণে

ধ্যানে বসে। গলায় তার তুলসীর মালা—পরিধানে বৃন্দাবনী শাড়ী। কেশগুচ্ছ চূড়া করে' সে কখন কখন মাথার সাম্‌নে বাঁধে—রঞ্জনের চক্ষে তা' কৌতূহল বাড়ায়, শ্রদ্ধা জাগায় না। টুনুর সে দিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। মায়ের আদেশে সে রঞ্জনের সেবার অধিকার যথারীতি পালন করে' যায়। রঞ্জনের হাসি-কথার সমান প্রত্যুত্তর দেয়, কিছুতেই মাথা নামায় না। কোন বিষয়ে সে আর ধরা প'ড়বে না—এমনই নিঃসঙ্কোচ প্রভাব ও মহিমায় তার সবখানি পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

রঞ্জনের প্রয়োজন সিদ্ধ হ'ত টুনুর সেবায়; কিন্তু টুনুর আচরণে গাম্ভীর্য্য ছিল—লঘুতার অবকাশ ছিল না। কাজেই সেবায় রঞ্জন তৃপ্তি পেত না, মধ্যে মধ্যে দম বন্ধ হয়ে প'ড়ত।

যেখানে হাসির কথা, টুনু সেখানে মুখ গম্ভীর করে' থাক্‌ত; যেখানে কাছে এসে' দাঁড়াবার কথা, সেখানে সে দূরে দূরে সরে' বেড়াত। যেখানে চেয়ে' থাকার দাবী, সেখানে সে দৃষ্টি নত করে' নিত। এ ক্ষোভ রঞ্জন ভাষায় প্রকাশ ক'রতে পারে না।

রঞ্জনের ক্ষত মর্ম্মে টুনুর এইরূপ সেবায় তৃপ্তির পরিবর্ত্তে অতৃপ্তির হাহাকার উঠ্‌তে লাগ্‌ল। এই অবস্থায় একান্ত অতিষ্ঠ হয়েই সে একদিন টুনুকে কাছে ডাক্‌ল; টুনুর সন্ত্রস্ত ভাব দেখে' সে বিরক্ত হয়ে বলে'ই ফেল্‌ল, "ঠিক সাপের মত আমায় দেখ—আমি যেন পিঁজরের জানোয়ার—খাদ্য দিতেই তোমার আসা! এমনই সতর্ক তুমি, তোমার এই চাঞ্চল্য আমায় দুঃখই অধিক দেয়। যদি এতই ভয় আমায়, তখন আমার কাজ করার লোকাভাব তো নেই—তুমি কেন এ বোঝা মাথায় তুলে' নিয়েছ?"

টুনু বক্র কটাক্ষে রঞ্জনের দিকে চেয়ে' কটু কণ্ঠে উত্তর দিল, "তুমি সাপও নও, জন্তু-জানোয়ার নও; ভয় আমার আত্মরক্ষার নয়—আত্মসম্মানের!"

"কি বল্‌লে ?"

"অপরাধ নিও না। আশ্রয় দিয়েছ, সত্য কথায় ভয় ক'রলে—অকৃতজ্ঞ হব।"

"আশ্রয় অনাশ্রয়ের কথা তু'লছ কেন ? কি বল্‌লে তুমি—আমার কাছে তোমার আত্মসম্মান নষ্ট হওয়ার ভয় ? আমি কি পশু ?"

"নিজেকে এবং আমাকেও এত ছোট করে' নিও না। আমি বলেছি, তুমি বাঘ ভাল্লুকের মত শ্বাপদ জন্তু নও—কিন্তু তবুও আত্ম-সম্মান বলে' যে ভয়, তোমার কাছে তার সমূহ সম্ভাবনা আছে।"

রঞ্জন নৈশ ভোজনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল—ভোজনের আসন ছেড়ে' সে উঠে' দাঁড়াল।

টুনু ব'লল, "তুচ্ছ কথা—সত্যই আমি তোমার আশ্রিতা। সত্য যদি বলি, রাগ করো না। খাও—"

"রাগের কথা নয়, টুনু—আমায় আর্ত্ত বলে'ই নিও। একজন পীড়িত ব্যক্তির আর্ত্তনাদ পীড়ারই লক্ষণ। তুমিও তাতে ক্ষুণ্ণ হয়ো না। কিন্তু আমার দ্বারা তোমার আত্মসম্মান-লাঘব হওয়ার কি কারণ আছে, টুনু ?"

"আগে খাও—তারপর বল্‌ছি।"

"অনুরোধ রা'খতে পা'রব না—এত বড় গুরুতর অভিযোগ অকারণে মাথা পেতে নেওয়া আমার সাধ্যে নেই, টুনু।"

রঞ্জন আসন ছেড়ে' ঘরের বাহির দিকে পা বাড়াতেই টুনু ব্যাকুল হয়ে, তার হাতখানা ধরে' ফিরিয়ে আনার জন্য হাত বাড়িয়েই অকস্মাৎ শিউরে' উ'ঠল। কিন্তু অমোঘ বজ্রধ্বনি উ'ঠল তার কণ্ঠে—"শুনুন রঞ্জনবাবু, খেতে বসুন—তা' না হ'লে রাত্রি-প্রভাতে বউদিদির মত আমিও অন্তর্হিত হব।"

কথায় কম্পন নাই—অবিচলিত কণ্ঠ। মন্ত্রমুগ্ধ রঞ্জন আসনে এসে' উপবিষ্ট হ'ল। করুণ কণ্ঠে অনুনয়-প্রার্থনা, "টুনু, দুঃখ দিও না, কত যে ব্যথিত আমি তা' কি জান না? আমার কাছে তোমার আত্ম-সম্মান যদি যায়—এ জীবনের মূল্য কতটুকু বল তো?"

দৃঢ়স্বর টুনুর কণ্ঠে—"রঞ্জন বাবু, আমি আপনার কেউ নই—আশ্রিতা বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা মহত্ত্বেরই গৌরব। কতটুকু আমি—আর যিনি আপনার গৃহলক্ষ্মী, যাঁর জীবন-যৌবন, তনুমনোপ্রাণের সকল সন্ধান আপনার কাছে সুবিদিত, কি কারণ আমি জানি না—কি নিষ্ঠুর দৈবের পীড়নে কুললক্ষ্মী আজ গৃহহারা—তাঁর প্রতি আপনার মুখে যে সংশয়োক্তি শুনেছি—আমি নারী, ভয় আমার পক্ষেও কি স্বাভাবিক নয়? এই সর্প আমায়ও তো দংশন কর্‌তে পারে!"

রঞ্জন নির্ব্বাক্‌—অনেক ক্ষণ নিশ্চল হয়ে' আসনে বসে' রইল। তারপর ভোজন সমাপন করে' সে রাত্রি নীরবেই তার কেটে' গেল।

টুনু মালা জপ্‌ছিল বিভোর হয়ে। ঝড়ের মতই রঞ্জন তার ঘরে ঢুকে' খান দুই কাগজ তার গায়ে ছুঁড়ে' দিল, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বল্‌ল, "এই দেখ, আমার মিথ্যা সংশয় নয়; আমি নিজেই যা' প্রত্যক্ষ করেছি, তা' ত' ভুল্‌তে পারি না তোমার কথায়!"

টুনু ফিরে'ও চাইল না; যেমন সে স্তব্ধ হয়ে' বসেছিল তেমনই বসে' মালা জ'প্‌তে লা'গল।

রঞ্জন এই সকল বাজে কাজে আস্থা রা'খত না। সে বিরক্ত হয়েই ব'লল, "কেন যে সময় নষ্ট কর মিছামিছি, বুঝি না। ও ছাই মালা ফিরিয়ে কি হয় বল ত'?"

টুনু কথার জবাব দিল না।

রঞ্জন খানিক ক্ষণ ঘরময় ছুটাছুটি করে' বারান্দায় এসে' দাঁড়াল। রাম ভকত এসে' তার হাতে একখানা ভিজিটিং-কার্ড দিতেই সে তর্-তর্ করে' নীচে নেমে' গেল।

অতিথি অমরবাবু রঞ্জনের একজন পুরাতন বন্ধু। রঞ্জনকে দেখে'ই সে আর্ত্তকণ্ঠে বলে' উঠল, "সব শুনেছি ভাই, মিসেস্ মুখার্জ্জি এমন কাণ্ড ক'রতে পারেন, ধারণায় ছিল না। কিন্তু কি আর করবে বল! মিষ্টার সেনকে জান তো? থার্ড্ ইয়ারে আমাদের কলেজে ভর্ত্তি হয়; সে এখন একজন আই, সি, এস্। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তার পত্নী একজন মুসলমান যুবকের সঙ্গে সরে' প'ড়ল—এর চেয়ে আশ্চর্য্য কি হ'তে পারে বল?"

রঞ্জনের মুখ কালো হয়ে' গেল। অতিশয় বিরক্তির সহিত সে ব'লল, "মিষ্টার রায়, দুর্ভাগ্য আমার—কিন্তু মিষ্টার সেনের দুর্ভাগ্যের কাহিনী আমার সান্ত্বনা নয়। এখন কি প্রয়োজন তাই বল।"

অমরবাবু অপ্রস্তুত হয়ে' প'ড়ল। কথাটা খুবই অপ্রিয় বলা হয়েছে। মুখখানি কাঁচু-মাচু করে' সে ব'লল, "অন্যায় বলে' ফেলেছি, আমারও মাথার ঠিক নেই—বোধ হয় শোন নি, আমার স্ত্রী সম্প্রতি পরলোক গমন করেছেন!"

"Sorry, খুব বিপদে পড়েছ তো!"

"হাঁ, ভাই—সেই জন্যেই ছুটে' এলুম। একেবারে নিরুপায়। সংসারে এমন কেহ নাই, আশ্রয় পাই। চাকরীটুকুও গেছে। আত্মীয়-স্বজনের কাছে আমার যদিও ঠাঁই হয়—কচি-কচি মেয়ে তিন্‌টের কি গতি হবে, সেই পরামর্শ নিতেই আসা।"

"এই দুর্ঘটনার জন্য আমি খুবই দুঃখিত। কিন্তু আমার অবস্থাও তো জান—বড় মনঃকষ্টেই আছি। এই অবস্থায় আমি একটু সমবেদনা-প্রকাশ ছাড়া কি আর ক'রতে পারি?"

"উপায় আছে—আমি শুনেছি, সুকুমারের মৃত্যুর পর টুনু তোমার কাছেই এসে' আছে। সে যে এই দুঃসংবাদ আমায় কেন জানা'ল না, ভেবে'ই পাই না। জান ত, খুব ঘনিষ্ঠভাবেই টুনুর সঙ্গে আমার আলাপ। সেদিন সংসার-সমাজের দায়ে এত বড় blunder না ক'রলে, টুনুই তো আমার পত্নীর আসন নিত! শুনেছি, সে বিয়ে-থা করে নি।"

"তাতে কি—এ খবর কি টুনুকে দিতে হবে?"

অমর বাবুর কুটিল দৃষ্টি রঞ্জনের দিকে প'ড়ল। পকেট থেকে রুমাল বা'র করে', মুখখানা মুছে' নিয়ে সে ব'লল, "মিষ্টার মুখার্জ্জি, যদি আর কারও সঙ্গে এন্‌গেজ্‌মেণ্ট্‌ না হয়ে' থাকে, আপত্তির কথা কিছু নেই।"

উত্তরের প্রতীক্ষায় রঞ্জনের মুখের দিকে সে কটাক্ষপাত ক'রল। রঞ্জন বিরক্তি-ব্যঞ্জক স্বরে ব'লল, "এই কথা যদি হয়, আমি টুনুকে জানাব—উত্তর সে নিজেই দেবে।"

পকেট থেকে সিগারেট-কেস বাহির করে', একটা সিগার ঠোঁটে চেপে', দেশলাই হাতে নিয়ে সে ব'লল, "ভাল কথা। কাল আমি আস্‌ব, গুড-বাঈ।"

রঞ্জন মুখখানায় অমাবস্যার অন্ধকার নিয়ে আবার টুনুর ঘরে এসে' ঢু'কল। টুনু তখন একমনে সেতার বাঁ'ধতে মন দিয়েছে। আসন্ন সুর গলায় গুন্‌-গুনিয়ে উঠেছে। রঞ্জনকে ঘরে ঢু'কতে দেখে'ই সে বলে' উ'ঠল, "এ কাগজগুলো আমায় দেখিয়ে তোমার মোকদ্দমা জিত হবে না। এ নিয়ে যত জিদ্‌ ক'রবে—হারের মাত্রাই বা'ড়বে।"

সেতার ঝঙ্কার দিয়ে উ'ঠল।

"থাম—কথা না শোন, যন্ত্রটা ভেঙ্গে' গুঁড়ো করে' দেব।"

টুনু হো-হো করে' হেসে' উ'ঠল।

"আজ তোমার হয়েছে কি!"

"আমার নূতন কিছু হয় নি, আর হবারও বিশেষ কিছু নেই—তোমার জন্য কিন্তু জবর খবর এনেছি।"

"বটে?"

সেতারের সঙ্গে গলার স্বরও বেজে' উ'ঠল—

হরি রহুঁ কাননে কামিনী লাগি'

রঞ্জন সেতারটা দুই হাতে ধরে' এক টানে হস্তগত ক'রল। টুনু অবাক্ হয়ে' চেয়ে' রইল তার পানে।

"ধ্যান আর জপ। না হয়তো গান!—খবরটা শুনিয়ে যাই। অমরবাবু এসেছিল—"

টুনু বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে' রইল। রঞ্জন বলে' গেল—একটানা, "অমর রায়—অমর রায়—মনে প'ড়ছে না? স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে, ফার্ষ্ট্ চান্সে হাতছাড়া হয়েছিলে— সেকেণ্ড্ চান্স দিতে চায়। কাল আসছে, রাজী থাক তো ভেবে' নিও।"

টুনু উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় আরক্তিম মুখে বলে' উ'ঠল, "রঞ্জনবাবু, সত্যই নারীর আশ্রয় নাই। এই অসম্মানের আশঙ্কাই আমার বড় আশঙ্কা—তোমার কাছে তা'ও বাদ গেল না—আমায় বিদায় করে' দাও।"

রঞ্জন কথা শুনে' স্তম্ভিত হয়ে' প'ড়ল—এমন কটু কথা, সে যেন জীবনে কাকেও বলে নি। তার মনের আগুন লক্-লক্ শিখা বের করে' মুখ দিয়ে যেন ফুটে' বেরিয়েছে। সে টুনুর কাছে বসে' প'ড়ল হাঁটু গেড়ে'—রুদ্ধকণ্ঠে হাঁফাতে হাঁফাতে ব'লল, "টুনু, বুকের আগুন

তুমি ছাই ঢাকা দিয়ে কতদিন রা'খবে? আমি পুড়ে' ম'রছি, আমায় রক্ষা করো—উপেক্ষা করো না। তুমি বল—ঐ কাগজগুলো পড়ে'ও জ্যোৎস্নার প্রতি আমার সংশয় হওয়া স্বাভাবিক কি না? কাগজ ক'খানা পড়েছ?"

"হাঁ, পড়েছি—মায়ের মুখেও সব শুনেছি। এখানা তোমার মাসীমার তার—লিখেছেন, তিনকড়ি বাড়ী ফেরে নি। তারপর এই পত্রখানায় তিনি জানাচ্ছেন, তোমাকে তিনুর খবর নিতে; সেও নিরুদ্দেশ—"

"গভীর ষড়যন্ত্র, টুনু—তুমি সব কথা শু'নবে?"

"না—তুমি যা' বলবে তা' আমি জানি। আমার একটা কথা, রঞ্জনবাবু, যাকে তুমি স্ত্রী বলে' গ্রহণ করেছ, তাকে সংশয় করা আমি যুক্তিসঙ্গত মনে করি না—কেন না, বিনা পরিচয়ে গ্রহণ করা তোমার মত মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। পরিচয় যেখানে, সেখানে সংশয় কত বড় অন্যায়, তা' আমি ভা'বতেও পারি না। আর যদি বল, পরিচয় হয় নি, তা' হ'লে তোমাকে পশুর চেয়েও হেয় মনে ক'রতে হয়। বিনা পরিচয়ে একজন নারীর সর্ব্বস্ব গ্রহণ করার অধিকারও কি প্রকারে হয়, তা'ও আমি বু'ঝতে পারি না। এইজন্য তোমার কথা আমার শ্রবণযোগ্য নয়।"

রঞ্জন আর কোন কথা উত্থাপন ক'রল না; সে ধীরে ধীরে উঠে' যাচ্ছিল, কিন্তু অমরবাবুর কথা মনে প'ড়তেই ফিরে' ব'লল, "অমর কাল আ'সবে, দেখা ক'রবে তো?"

"দেখা না করার কিছু নেই,"—

"ভাল"—এই বলে' রঞ্জন ঘর ছেড়ে' চলে' গেল।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর টুনু বিশ্রামের আশায় শয়নের উদ্যোগ

ক'রছিল, কাদু হাঁফাতে হাঁফাতে এসে' ব'লল, "দিদিমণি, শীগ্‌গীর আসুন মায়ের ঘরে। সংসারে যেন শনির দশা ধরেছে!" কাদু আর একদণ্ড দাঁড়া'ল না—কাজেই উৎকণ্ঠিত চিত্তে টুনু মায়ের ঘরের দিকে ছু'টল।

টুনুকে দেখে'ই মা বল্‌লেন, "সহজে রাগি না—ছেলেটার মনে কত ব্যথা তা' বুঝি, গ্রহচক্রের দুর্ঘটনা! কিন্তু সতীলক্ষ্মী বৌমার উপর প্রতি কথায় কালি ছুঁড়ে' দেওয়া সহ্য ক'রতে পা'রলুম না, টুনু—বড় কটুকথা বলে' এসেছি। রঞ্জন বড় অভিমানী, একটা অনর্থ বাধাবে, তাকে দেখো।"

টুনু আরও কিছু জিজ্ঞাসার জন্য 'হাঁ' করতেই, মা বল্‌লেন, "পরে সব কথা শুনো। বৌমা বাড়ী-ছাড়া, রঞ্জন যদি বাড়ীর বাহিরে পা বাড়ায়, সর্ব্বস্ব হারিয়ে আমি আর তেষ্ঠাতে পারব না। রঞ্জনের কাছে যাও।"

টুনু রঞ্জনের ঘরে এসে', দেখে, সে একদৃষ্টিতে শূন্যে চেয়ে' আছে। টুনুর পায়ের সাড়ায় এক মুহূর্ত্ত চম্‌কে' উঠে' সে ভাঙ্গাগলায় ব'লল, "টুনু, চিরদিনের মতই তোমাদের ছেড়ে' যাচ্ছি। মাকে দেখো! আমার আর কেউ নেই!"

কান্না সে আর চেপে' রা'খতে পা'রল না, বালকের মত কেঁদে' ফেল্‌ল ভেউ-ভেউ করে'।

টুনুর চক্ষে জল-সম্বরণ হ'ল না, কিন্তু সহানুভূতির অশ্রু সে মুছে' ফেল্‌ল এক নিমিষে। ব'লল, "তুমি কি পাগল হয়েছ?"

"তুমি অনেক কথা জান, টুনু! আর আমায় প্রবোধ দিতে চেষ্টা করো না। কালসর্পের দংশন-জ্বালায় আমি অস্থির—তোমার স্নেহে, অনুরাগে ভুলে' থাকি, সে নিদারুণ যন্ত্রণা। আজ মায়ের আশীর্ব্বাদ পেয়েছি

বজ্রের মত নিষ্ঠুর; কিন্তু তবুও তাঁর আশীর্ব্বাদ। আমি চলে' যাচ্ছি, মাকে দেখো।"

"কি হয়েছে বল তো?"

"কিছু হয় নি—অপরাধী আমি, আমি জ্যোৎস্নাকে গৃহত্যাগিনী করেছি—বেকার বসে' বসে' পিতৃধনের অপচয় ক'রছি—বংশের কলঙ্ক, মা আমায় বিদায় দিয়েছেন! আমি তাঁর নজর-ছাড়া হয়েই যাব—কিন্তু মাকে দেখো, টুনু! আমার আর কিছু বলার নেই।"

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে রঞ্জন ঘরের বাহির হওয়ার উদ্যোগ করল। টুনু দরজা আগ্‌লে' বল্‌ল, "তুমি পুরুষ মানুষ, এতখানি অধৈর্য্য হ'লে সংসার চলে না। মায়ের সঙ্গে তর্ক করেছ নিশ্চয়ই।"

"হাঁ, তর্ক করেছি; আমি আর বিশ্বাস রাখতে পারি না। যাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, সাধ করে' তার প্রতি অবিশ্বাস, সে কি কেউ করে, টুনু? এমন আত্মঘাতী হ'তে কেউ কি চায়? মনের সঙ্গে কত তর্ক, কত বিবাদ, আমি তা' ব্যক্ত ক'রতে পারি না। সংশয়ের বৃশ্চিক দংশনে আমি অস্থির হয়েছি। অতিশয় অত্যাচার করেছে সে আমার উপর—নির্ম্মম অবিচার! প্রায়শ্চিত্তের ভার আমিই নিচ্ছি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, সে যেখানেই থাক, সুখে থাক—আমি বিদায় হই, তুমি আমার মাকে দেখো।"

"আচ্ছা, তা' হবে এখন, তুমি একটু স্থির হয়ে' বস।"

এই বলে' টুনু তার অতি নিকটে গিয়ে চক্ষের সঙ্কেতে করুণ অনুনয় জ্ঞাপন করল। রঞ্জনের মনে হ'ল—বিনা স্পর্শে বিদ্যুতের অনিবার্য্য প্রভাব তাকে যেন জোর করে'ই বসিয়ে দিল বিছানার উপর।

টুনু বল্‌ল, "তোমার মুখে নূতন কথা শুন্‌লুম—তুমিও দেখছি,

ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, আর বৌদিদিকে ভালও বাস। সত্যই আজ মায়ের আশীর্ব্বাদ পেয়েছ।”

রঞ্জন স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে' রইল ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করে'।

টুনু বল্‌ল, “মানুষ একান্ত যখন অসহায় হয়, সে তার অলক্ষ্যে কোন এক মহাশক্তির আশ্রয় চায়। সান্ত্বনা পায় বলে'ই একান্ত অদৃষ্ট বস্তু হ'লেও, এই অনির্দ্দিষ্টের উপর তার প্রত্যয় দৃঢ় হয়। এই বিশ্বাসই তাকে ঈশ্বরের পথে নিয়ে চলে। এই পথের যাত্রী যে, তারই কণ্ঠে প্রেমের গান ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। আজ তোমার এই পরিবর্ত্তন দেখে' সুখী হলুম, রঞ্জনবাবু।”

যাদুমন্ত্রে যেমন উর্দ্ধফণা বিষধর মাথা নামায়, তেমনি রঞ্জনের ক্রোধ সম্বরিত হ'ল। মৃদুকণ্ঠে সে বল্‌ল, “বেদব্যাসের আসনে তোমায় বসাতে হয়। আমার সহজ কথার এমন ব্যাখ্যা হয়, কল্পনার অতীত। বেদের ভাষ্য যদি লেখ, ঋষির আখ্যা পাবে!”

হঠাৎ একটু হাসির রেখাও ফুটে' উ'ঠল রঞ্জনের মুখে। ঝড় থেমে' গেল। টুনুর চাপা ঠোঁটে হাসির সীমা আ'টকে' রইল না, কুন্দ দন্ত বিকশিত হয়ে উ'ঠল। রঞ্জন খাটের উপর, টুনু মেঝেতে বসে'। হা'সতে হা'সতে সে বল্‌ল, “বাঁচিয়ে দিয়েছেন শ্রীভগবান এ জন্ম তোমাদের পাল্লা থেকে! কি তোমরা বল তো, হাতে করে' চাঁদ দিতে এলেও ভরসা হয় না নিতে! গোঁজামিল দিয়ে, আমাদের সঙ্গে তোমাদের মিলনটা আর মোটেই খাপ খাচ্ছে না। স্বজাতি-প্রীতি-বশেই বৌদিদিকে যদি একবার পাই, তো এই পথেই টেনে' নিয়ে আসি।”

রঞ্জনের একটা দীর্ঘ নিশ্বাস প'ড়ল। ধীরে ধীরে সে ব'লল, “তোমার কাছে হাজার বার আমায় হা'রতে হয়, এমনই তুমি—তোমার কথায়, চোখের ভঙ্গীতে মরা মানুষও হেসে' ওঠে। সত্যি ব'লছি, টুনু—পৃথিবী

যদি একদিকে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্নার কলঙ্ক-কথা প্রমাণ ক'রতে দাঁড়াত, অস্বীকার ক'রতে ইতস্ততঃ করতুম না। কিন্তু জ্যোৎস্না যে নিজেকেই কলঙ্কিত করে' চক্ষের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলে—নারী অবিশ্বাসিনী, মুক্তি দিতে নেই তাদের, শিক্ষা স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে'ই রাখতে হয়, লোহার খাঁচায় বন্দী করে'। তুমি নারী, তোমার প্রত্যয় হ'বে না আমার কথায়; জ্যোৎস্নাকে মা নিজের চোখে দেখে' বরণ করে' ঘরে তুলেছেন —তিনিও বিশ্বাস ক'রবেন না আমার কথায়। বাহিরে গিয়ে মুখ তুলে' দাঁড়াবার উপায় নেই—শক্তি হারিয়েছি, বিশ্বাস হারিয়ে। যে চক্ষু মুহূর্ত্তের সংশয়ে বুজে' এসেছিল, জ্যোৎস্নার একবিন্দু প্রণয়-সঙ্কেতে তা' দূরে সরিয়ে দিয়েছি; আজ দৃষ্টিভরা অন্ধকার, ঘনিমায় হৃদয় হাঁফিয়ে ওঠে—মনে হয় উন্মাদ হয়ে যাব। বিশ্বাস কর, টুনু—এইটুকু সহানুভূতি দেখিয়ে আমায় বাঁচাও; বিশ্বাস কর, জ্যোৎস্না ব্যভিচারিণী। সে দোষ তার নয়, সে বিষ আমিই তারে হাতে করে' খাইয়েছি, কিন্তু সে তা' খেল কেন? আমি উন্মাদ হই, সে উন্মাদকে শাসন ক'রল না কেন? তার প্রেমের মূল্য দিয়ে, সে আমায় দুর্ব্বুদ্ধি থেকে মুক্তি দিল না কেন? কত ব্যথা, কত প্রশ্ন—আর কোন কথায় সান্ত্বনা পাই না, টুনু!"

টুনু ঘাড় হেঁট করে' কথাগুলি শুনে' যাচ্ছিল—কথা হয়তো ফুরাত না, যদি গলা ধরে' না আসত। সে মুখ তুলে' দেখল—রঞ্জনের চক্ষু দু'টী জলে ভরে' এসেছে। মমতায় বুক দুরু দুরু করে' উ'ঠল। কোমল করপল্লবে স্নেহের স্পর্শ দিয়ে, মনে হ'ল, চক্ষু দু'টী মুছিয়ে দিই। আকুল উদ্বেল হৃদয় মানা মানে না; কিন্তু বিচার এসে' শাসনবাণী ঘোষণা করে' গেল—পুরুষ এই পবিত্র করুণা বুদ্ধিদোষে অনাবিল করে' নেবে না। সে নেবে তা' নারীর উষ্ণ আসক্তি-রূপে। টুনু প্রস্তর-মূর্ত্তির মত

সেইখানে বসে', গ্রীবা উত্তোলন করে' ব'লল, "আমার একটা কথা শুন্‌বে ?"

"কি কথা, টুনু ?"

"সত্যি বল্‌ছি, আমার বড় কষ্ট হচ্ছে—রুমাল দিয়ে চক্ষের জল মুছে' ফেল। আমায় যে আর কাকেও ছুঁতে নেই! তা' না হ'লে আমিই মুছিয়ে দিতাম চক্ষের জল। নারীর ইহা দুর্ব্বলতা বলে'ই তোমরা গ্রহণ ক'রবে, মহিমার দিক্ লক্ষ্যে প'ড়বে না।"

প্রায় এক বৎসর কাল টুনু এ বাড়ীতে এসেছে—তার সুললিত কণ্ঠে বাড়ীখানি দিবারাত্রি মুখরিত। কত কবিতা, কত কথা! পালে-পার্ব্বণে ঘরের দরজায় দরজায় ফুলের মালা সে তুলিয়ে দিয়েছে। বাড়ী যেন করে' তুলেছে তীর্থ। টুনু রঞ্জনের কাছে কাছে ঘুরেছে, আসন পেতে খেতে দিয়েছে, পরিহাস করেছে কথার ছল ধরে'; কিন্তু আজিকার মত এমন করে' আপনাকে সে ব্যক্ত করে নি কোনদিন। নারী-গৌরবের অপরূপ আলোর ছটায় তার সরল অনিন্দ্য মুখখানি সুষমাময়। চেয়ে' রইল অনেক ক্ষণ রঞ্জন টুনুর দিকে, চোখের জল চোখেই শুকাল—ভাষা ছিল না কারও মুখে।

হঠাৎ কাদু এসে' বল্‌ল, "দারোয়ান বলে' গেল—অমরবাবু এসেছেন, আপনাকে খবর দিতে।"

"কে ?"

"কি জানি কে অমরবাবু!"

টুনু রঞ্জনের মুখের দিকে চাইল। রঞ্জন বল্‌ল, "টুনু, তোমার ডাক এসেছে। কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে' পড়েছিলাম তোমার কথা শুনে। মনে আমার প্রশ্ন উঠ্‌ছে, জবাব দিয়ে যাও।"

কাদু দাঁড়িয়েছিল দোরের সামনে। রঞ্জন ব'লল, "দারোয়ানকে

ল, বাবুকে অপেক্ষা ক'রতে, বাবু আ'সছেন।" কানু
লে' গেল।

"কি প্রশ্ন তোমার, বল?"

"তুমি যদি আমার কোন নিকট আত্মীয়া হ'তে, এমনই আমাকে কি তুমি অস্পৃশ্য করে' রা'খতে? আজ অনুভব ক'রছি এত কাছে কাছে, কিন্তু হাতে তুলে' একটা পানও তো দাও না! আমায় ছুঁতে নেই কেন, টুনু?"

টুনু ঘাড় হেঁট করে' হেসে' ফেল্‌ল। কথার জবাব দিল না।

রঞ্জনও অনেক ক্ষণ চুপ করে' রইল; কিন্তু তার ভিতরটা অস্থির হয়ে উঠেছিল। সে হঠাৎ বলে' উ'ঠল, "টুনু, অমর ব'লছিল—তোমার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয়, তুমি কি তাকে ভালবাস?"

টুনুর মুখ কালিমাময় হয়ে' গেল। রঞ্জন অপ্রস্তুত হয়ে' ব'লল, "হয় তো ব্যথা দিলাম, এমন বিবর্ণ মুখ তোমার কখনও দেখি নি—প্রশ্নটা অন্য রকম হয়ে' গেছে। আমার জিজ্ঞাস্য, তুমি কি পৃথিবীর কাউকে ভালবাস না?"

টুনু মুখ তুলে' চাইল, রঞ্জনের সজল আরক্ত চক্ষের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে' ব'লল, "প্রশ্নটা যদি উল্টে' জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি উত্তর দেবে?"

"আমি? আমি—আমি কাকে ভালবাসি, এই প্রশ্ন করছ? খুঁজ্‌তে হয়। এক বছর আগে প্রশ্ন ক'রলে, উত্তর দেওয়া সহজ হ'ত। আজ খুঁজ্‌তে হয়। কাকে ভালবাসি—কাউকে না..."

"কেন—আমাকে?"

ভুবনমোহন হাসি—মেঘ-ঢাকা চাঁদ হঠাৎ উদিত হ'লে ধরিত্রী যেমন জ্যোৎস্নায় ভেসে' যায়, তেমনি রূপের উচ্ছ্বাসে টুনুর মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে' গেল। রঞ্জন এই কথার উত্তর দিতে পারে না। সে বিহ্বল,

বিমূঢ়। টুনু তেমনই হেসে' হেসে'ই ব'লল, "নিশ্চয়ই তুমি আমায় ভালবাস, কি বল? নয়?"

কি জানি কেন—রঞ্জনের অধর, ওষ্ঠ, চিবুক, দক্ষিণ চক্ষু নৃত্য জুড়ে' দিল—কথার উত্তর দিতেও বা'ধল—কেবল একটা বিকৃত স্বর শোনা গেল—"হুঁ।"

উচ্চ হাসির রবে ঘর ভরে' গেল। হাসির শব্দে রঞ্জনের এক ফোঁটা মুখের শব্দ তলিয়ে গেল হাওয়ায়। চাঁচা গলায় টুনু বলে' উ'ঠল, "আজ তুমি ধরা পড়েছ—আঠে-পিঠে! হারিয়েছ তোমার মন তোমারই মনের দোষে—ঠিক না, রঞ্জনবাবু?"

"কি ব'লছ, বু'ঝতে পা'রছি না"—

"অতি স্পষ্ট কথা, তুমি আমায় ভালবাস। খুব ভালবাস—আমায় দে'খতে ভালবাস, আমার কথা শু'নতে ভালবাস, আমার সেবায় তোমার তৃপ্তি, আমার ছোঁওয়া পেলেও তোমার আনন্দ হয়, কি বল রঞ্জনবাবু?"

কথাগুলি ভাল লাগ্‌ল না রঞ্জনের কাছে। মধু-প্রবাহে কে যেন বিষ ঢেলে' দিল, ছুঁচের মত বি'ধতে লাগ্‌ল টুনুর কথা। কথায় অগ্নির উত্তাপ ছিল, আঁচে বিহ্বলতার নেশা তখন ছুটে' গেছে রঞ্জনের। কথাগুলি তেমন ভাবে-রসে প্রীতিপ্রদ নয়। সে আশ্চর্য্য হয়েই টুনুর মুখের দিকে চেয়ে' রইল। পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে তার মুখ, চক্ষু স্থির, চিত্রকরের আঁকা ছবির ন্যায় নিস্পন্দ! কয়েকটী কথা কিন্তু তার কণ্ঠ থেকেই বাহির হয়ে' এল—শেলের মত রঞ্জনকে যন্ত্রণা দিতে।

"দেখ রঞ্জনবাবু—অবিশ্বাসিনী আমার বৌদিদি নন, অবিশ্বাসী তুমি। ব্যভিচার-দোষ অবলার উপর চাপিয়ে তোমরা পুরুষ নির্ব্বিবাদে সাধু

হয়ে' প্রশংসিত হ'তে পার ; কিন্তু ব্যভিচার তোমরাই টেনে' আন নারীর কোমল হৃদয় কলঙ্কিত করে'।"

অতিশয় কটু কথা—এক মুহূর্ত্তের মূঢ়তায় প্রগল্ভা নারী এতখানি সুযোগ নিতে পারে পুরুষকে ছোট করে' দিতে, রঞ্জনের তা' কল্পনায় ছিল না। অতি দুঃখের পর ক্রোধে মানুষ জ্ঞানহারা হয়। রঞ্জন যেন বুদ্ধিহারা হয়ে' পড়ে, এমনই অবস্থায় উঠে দাঁড়িয়ে ব'লল, "হাঁ, আমি তোমায় ভালবাসি—ভালবাসি বলে'ই ছুটোছুটী করে' পাটনায় যেতে হয়েছে, ভালবাসি বলে'ই তোমার কটু কথা সহ্য করে' নিচ্ছি। ব্যভিচার আমার কোথায় দে'খলে—আমার যদি ছোট বোন থা'কত, তারেও এমনি ভালবাস্‌তুম!"

টুনু ঠোঁট উল্টে' হেসে' ফেল্‌ল, "তর্কে মীমাংসা নেই, রঞ্জন বাবু—অনুভবের বস্তু ; ঠিক বোনটার উপর যে ভালবাসা, তা' বোনের উপরই হয়, অন্যের উপরে নয়। মনের ছলনা এমনই করে' আমাদের প্রবঞ্চনা করে! তুমি বৌদিদিকে ভালবাস্‌তে, সে ভালবাসায় যদি স্বচ্ছতা থাক্‌বে, তবে সংশয়ে সে সম্বন্ধ এমন কদাকার হয়ে দেখা দেবে কেন?"

"তুমি কি বল—যাকে ভালবাসি, সে কখন সংশয়ভাজন হবে না?"

"না—ভালবাসার বিধানে এমন কথা লেখা নেই—"

"ছোঃ—সংসারে এক-শ'টা ঘটনায় নিরানব্বইটা প্রমাণ দেখাতে পারে।"

"সে প্রমাণ ভালবাসার নয়, ভালবাসার ভানের। রঞ্জনবাবু ভাল-বাস্‌তে শি'খতে হয়—ভালবাসার পাঠশালায় প'ড়তে হয়—যৌবনে চোখ রঙিয়ে উ'ঠলেই, ভালবাসার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। এ সংসারে এই দায়েই নারী প্রেমের বিকার হয়েই রইল। অহল্যার মত তার

পাষাণমূর্ত্তি প্রেমময়ের পদস্পর্শে বুঝি আর জীবনের সঙ্কেত পেল না—মরে' গেল সৃষ্টি, সংসার, সমাজ—তাতল সৈকত ঝল্‌সে' গেল, প্রেমের বর্ষণ হ'ল না!"

"কি তুমি বল্‌ছ?"

"শোন—উত্তর দিচ্ছি, তোমার প্রশ্নের উত্তর।"

"তুমিও যেমন ভালবেসেছ জ্যোৎস্নাকে, আমাকে, তাকে, অনেককে, সে ভালবাসার ব্যাধি আমায়ও ছাড়ে নি—আমিও পীড়িত, সে প্রণয়-বিকারে, কিন্তু রক্ষা পেয়েছি রঞ্জনবাবু, প্রেম-শিক্ষা পেয়ে। প্রেম বস্তু, জীবনের সব সৌরভ, সবখানি সৌন্দর্য্য সেইখানে; তা' উজাড় করে' দিতে হয় একই দেবতার চরণে, সে ভগবান ভিন্ন আর কেহ নয়।"

"Nonsense—Rubbish! জীবনের সহজ সরল ঘটনায় একটা উদ্ভট তত্ত্বকে টেনে' আনা! তুমি কি বল—স্বামী পত্নীকে ভালবাস্‌বে না, মাতা সন্তানকে, বন্ধু বন্ধুকে? তোমার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে' গেছে—চিকিৎসার দরকার।"

"ভালবাস্‌বে। ভালবাসার মন্ত্রেই তো মানুষ দেবতা হয়ে' জেগে ওঠে। পতির প্রেমেই তো সতীর অভ্যুদয়, সে মহাদেবী। পত্নীর প্রণয়-সুধায় পুরুষ হয় অমৃতের দেবতা! জননীর স্নেহে নন্দদুলালের পুষ্টি, সন্তানের শ্রদ্ধা জননীকে অন্নপূর্ণার আসনে তুলে' দেয়। আজ এই প্রেমের স্পর্শ যদি বৌদিদি পেতেন—এই দুর্ঘটনা কোন মতেই হ'ত না, রঞ্জনবাবু।"

"সে প্রেম তা' হ'লে কোথাও নেই—তোমার বৌদিদিতেও সে প্রেমের স্থান নেই—বল!"

"আগেই বলেছি—নারীর প্রেম অবিকৃত শুদ্ধ হয়, পুরুষের নিষ্ঠায়। যেখানে পতির সবখানি পাওয়ার পথে তার মনে অন্তরায় আসে, হয়

তা' জ্ঞানের আলোয় সরিয়ে দিতে হয়—নয় অন্তরায়ের কারণ আমূল উপ্‌ড়ে' ফেল্‌তে হয়। আমার মনে হয়, বৌদিদি পাওয়ার পথ রুদ্ধ দেখে' হাঁফিয়ে উঠেছিলেন—আপনার কাছে প্রতিকার পান নি এবং সে ধৈর্য্যও তিনি রক্ষা করেন নি। সে অপরাধ তাঁর একার নয়, সমস্ত নারীজাতিও তার মূল—কারণ সে আলোর জগতে বিচরণ করে না—অন্ধকারেই তার জন্ম। অন্ধকার হাত্‌ড়ে'ই তার জীবন কেটে' যায়—অন্ধকারেই তার অন্তিম নিদ্রা।"

রঞ্জন এই সব কথা শুনে' সবিস্ময়ে টুনুকে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "এ সব ভালবাসার বিজ্ঞান সাধারণ লোকের জন্য নয়। তোমায় এসব শেখালে কে?"

"আমার গুরু—আমার প্রণয়-বিকার মানুষের সাধ্যে দূর হওয়ার নয়, তাই গুরুর আশ্রয় নিয়েছি।"

"কে তিনি? কি নাম তাঁর?"

"শ্রীভগবান।"

রঞ্জন কি ব'লতে যাচ্ছিল—টুনু এক নিমিষে ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে' গেল, "অমরবাবু বসে' আছেন; কাজটা সেরে' আসি।"

— এগার —

অমরবাবু হল-ঘরে খোলা খড়খড়ির দিকে মুখ করে' বসেছিলেন। টুনু নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তার পশ্চাতে এসে' দাঁড়া'ল। অমরবাবু গৃহমধ্যে টুনুর আগমন অনুভব করে', ফিরে' তাকিয়েই বলে' উঠ্‌ল, "এই যে টুনু—খুব তুমি, আশ্চর্য্য তুমি!"

টুনুর নয়নে যেন অশ্রু-বিন্দুর আভাস।

অমরবাবু দাঁড়িয়ে উঠে' ব'লল, "আমি শুনেছি টুনু, সর্ব্বনাশের কথা; কিন্তু আমায় কি খবর দিতে নেই—আমি কি তোমার কেউ নই?"

টুনু চক্ষের জল বোধ হয় সামলে' নিল। কেন না, অতি স্বভাব-স্বরেই সে ব'লল, "দাঁড়ালেন কেন, বসুন।"

তার পর অমরবাবুর উপবেশনের সঙ্গে সঙ্গে সে সাম্‌নের একখানা কৌচে বসে' জিজ্ঞাসা ক'র্‌ল, "হঠাৎ এখানে এলেন যে? আমার খবর আপনাকে কে দিল?"

অমরবাবু সবিস্ময়ে দে'খল দৃষ্টিভ্রম, টুনু অশ্রুমুখী নয়—পরিষ্কার মুখশ্রী, শোকরাগ বিন্দুমাত্র নেই। সে কথার উত্তর দিল না।

টুনু ব'লল, "চুপ করে' রইলেন যে?"

"তোমার প্রশ্নের উত্তর নাই। হঠাৎ আসি নি—তোমার খবর পেয়ে'ই এসেছি। খবর কে দিল, এ কথা আমায় জিজ্ঞাসা করো না।"

টুনু নীরব হয়ে রইল। অমরবাবুই ব'লল, "নিজেই অপরাধী, তাই কোন কথা উত্থাপন ক'রতে ভরসা হয় না। কিন্তু আপনার জন কোন কারণে কি পর হয়, টুনু!"

টুনু মুখ তুলে' অমরবাবুর দিকে চাইল।

অমরবাবু ব'লল, "তুমি আমায় এতই পর ভেবেছ যে, সুকুমারের মৃত্যু-সংবাদ জানালে না, তোমার কলিকাতা-আসার সংবাদটুকুও দিলে না! আমার অবস্থা যাই হোক, তোমার উপর আমার সেই স্নেহ, সেই প্রেম সমানই আছে।"

চোখের কোণে জল, আবার ঠোঁটে বাঁকা হাসি—সে এক অপরূপ মূর্ত্তি। টুনুকে দেখে' অমরবাবুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়্‌ল কথা—"অদ্ভুত!"

এইবার টুনু ব'লল, "কেন বলুন দেখি!"

অমরবাবু টুনুর দিকে ভাল করে' চেয়ে' দে'খল। বলার মত কিছু নেই—বসন-ভূষণ কিছু বিচিত্র ধরণের, রূপের পরিবর্ত্তন ভাষায় ব্যক্ত হয় না। তার চক্ষে সে কমনীয়তা নেই, প্রখরতায় ঝল্‌সে' যাচ্ছে। ললাটে নারীত্বের চিহ্ন মুছে' গেছে, সংযম ও সঙ্কল্পের প্রলেপ পড়েছে; ললাট কঠিন প্রস্তরের মত গড়ে' উঠেছে। কেশের সে পারিপাট্য নেই—কিন্তু লীলায়িত স্বভাবসৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করেছে। টুনুর ওষ্ঠে গণ্ডে পূর্ব্বের ন্যায় কৃত্রিম বর্ণরাগ নাই—শোণিতের ঢেউয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে মুখমণ্ডল অসাধারণ লালিমায়। সে রূপ ভেঙ্গে' বিধাতা তাকে নূতন করে' গড়ে' তুলেছেন। টুনুকে দেখে' সেদিন মাদকতায় চিত্ত ভর্‌ত, লোলুপতা জাগ্‌ত; আজ এই রূপের ডালি অনবদ্য—ভোগের প্রবৃত্তি জাগায় না, পূজার প্রবৃত্তিই দেয়। অমরবাবুর দৃষ্টি ফি'রতে চায় না। সে চেয়ে' রইল টুনুর দিকে লক্ষ্য রেখে'।

নিস্তব্ধ গৃহ। সাড়া নাই দু'জনের মুখেই। কিন্তু টুনুর বক্ষ যেন কেঁপে' উ'ঠল অমরবাবুর অপলক স্থির দৃষ্টিতে। সে ধীরে ধীরে কম্পিত কণ্ঠে ব'লল, "অমরবাবু—"

"কেন? কেন—টুনু!" বিগলিত, বিহ্বল স্বর।

"আপনার প্রয়োজনের কথা বলুন। সময় নষ্ট হচ্ছে!"

"তা' একটু হবে, টুনু। আমার মত দারিদ্র্যপীড়িত সংসার রঞ্জনের নয়। তোমার অকাতর বিশ্রামে এ সংসারের কিছু আসে যায় না, তা' আমি জানি। আমার কথা হয় তো শু'নবে না। তোমায় সে কথা ব'লতেও আমার ভরসা হচ্ছে না।"

নিদাঘের অপরাহ্নে বৃক্ষপত্র অচল স্তব্ধ; হঠাৎ দক্ষিণ দুয়ার খুলে' ঝটকা বাতাসে প্রকৃতির সে নিথর ছন্দ ভেঙ্গে' যাওয়ার মত টুনু অকস্মাৎ হাসির তুফান তুলে' বলে' উ'ঠল, "বলুন অমরবাবু, যা' বল্‌তে এসেছেন বলুন! ভরসা দিচ্ছি বলুন। আমি সে কথা না শুন্‌লে আপনার আইন জারি অন্যায় হবে। বিনা বিচারে রায় যদি দেন, আপীল করব কোন নজিরে?"

টুনুর মুখশ্রীতে এতক্ষণ যে নিবিড়তা ও দৃঢ়তার ছায়া ছিল, এখন তার অনুমাত্র চিহ্ন দেখা গেল না। ভরা জ্যোৎস্নাপ্লাবিত তটিনীর মত উচ্ছল রূপের ঢেউ তার মুখখানিকে উদ্ভাসিত করে' দিয়েছে। ভরসা পেয়ে' অমরবাবু ব'লল, "তোমায় দেখে' সব ভুলে' যাই। যেন বলার কিছু থাকে না। হাঁ, প্রয়োজনের তাগিদেই আসা। একথা না ব'ললে, মিথ্যা বলা হবে। তবে হৃদয়ের পর্দ্দায় পর্দ্দায় যে-রূপ রেখায় রেখায় এঁকে' উঠেছিল, জীবনবিপ্লবে তা' মুছে যায় নি—আজ তা' ভাল করে'ই বু'ঝছি। বুঝি, মুছে' যাওয়ার নয়।"

উদ্বেল হৃদয়, স্পন্দিত ওষ্ঠপুট, কম্পিত আঁখিপল্লব; উত্তর দিতে কণ্ঠ শক্তিহীন হয়। এক উত্তর আসে, অন্য উত্তর তাকে বাধা দেয়। কণ্ঠস্বর এই বিপ্লবে আড়ষ্ট হয়ে' পড়ে। টুনু ব'লতে গিয়েও নিরুত্তর রইল।

অমরবাবুর ভরসা গেল বেড়ে'—সে টুনুর সর্ব্বাঙ্গে পূর্ব্বপরিচিত

পুলকস্পন্দনের সঙ্কেত যেন লক্ষ্য ক'রল। প্রেমের আকুলতায় উদ্‌গ্রীব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নীরবে পূর্ব্বের মত আত্মদানের প্রতীক্ষায়—এমনই মৌন স্থির-মূর্ত্তি টুনু তার বুকে ঝাঁপ দিয়ে প'ড়ত। আজও তার মনে হ'ল, প্রেমের প্রতিমা এখনই ঝাঁপিয়ে পড়্‌বে তার বুকে।

কিন্তু টুনু বসে' রইল স্থির অচঞ্চল। অন্তরে অন্তরে বোধ হয় তার কি এক অনির্ব্বচনীয় দ্বন্দ্ব উ'ঠল। শোণিতলহরী তারই চিহ্ন মসৃণ চর্ম্মের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে দিয়ে যায় যেন রেখায় রেখায় তার মুখে। ব্রীড়াবনতমুখী টুনুর উচ্ছল লাবণ্যশ্রী অমরবাবুকে মাতাল করে' দিল। সে নির্ভয়ে টুনুর কোলে তার জড়-করা হাত দু'খানি নিজের হাতের মধ্যে টেনে' নিয়ে গদগদ কণ্ঠে বলে' উঠ্‌ল, "টুনু শুনেছ বোধহয়, বিধাতার অভিসম্পাতে আমি নিরাশ্রয় - অসহায়। ভিখারীর শূন্য ঝুলি পূর্ণ করে' দিবে কি? যদি আলোয় ভরাও, চিরদিনের জন্য কৃতার্থ হই।"

হাত দু'খানি বরফের মত ঠাণ্ডা। ললাটে স্বেদবিন্দু। বেতস-লতার মত টুনু কাঁপ্‌ছিল থর-থর করে'। মুক্তাফলের ন্যায় বিন্দু-বিন্দু অশ্রু তার চোখের কোণে ফুটে' উ'ঠল। কণ্ঠে ভাষা নাই—নির্ব্বাক্ টুনু।

অমরবাবু টুনুর হাত দু'খানি অস্বাভাবিক জোরে নিজের হাতের মধ্যে টিপে ধরে' ব'লল, "টুনু, কথা কও। অনাঘ্রাত ফুল পূজার সামগ্রী, এ নির্ম্মাল্য আমি মাথায় তুলে' নেব—আমায় ব্যর্থ করো না।"

টুনু অমরবাবুর মুখের দিকে চেয়ে' দে'খল—তার দৃষ্টি প্রসন্ন, অচঞ্চল। কোন ক্ষুণ্ণতা তাতে নেই। কিন্তু বড় তীক্ষ্ণ। অমরবাবুর শিথিল নয়ন সে উত্তাপ-বহনে অসমর্থ, অসামাল হয়ে' পড়ে। সে চায়, আবার দৃষ্টি নত করে। যে চক্ষের সম্মুখে পলকহীন চেয়ে' থাকা ছিল তার একদিন অপরিসীম তৃপ্তি ও আনন্দ, আজ সামর্থ্য হারিয়ে কোথায় তার দুর্ব্বল

দৃষ্টি লুকাবে, পথ খুঁজে' পায় না। টুনু হাত দু'খানি ধীরে ধীরে টেনে' নিয়ে উঠে দাঁড়াল—যেন বিদ্যুন্মূর্ত্তি।

কণ্ঠে ঝঙ্কার উঠ্‌ল যেন বীণাধ্বনি—"অমরবাবু! আমি অবলা, প্রেমের লালসায় বুক দুলে' ওঠে, কিন্তু—"

অকস্মাৎ বজ্রপাতের আশঙ্কায় টুনুর মুখের দিকে অমরবাবু চেয়েছিল—সে দৃষ্টি বড় করুণ, বড় মিনতিপূর্ণ।

টুনু হঠাৎ অমরবাবুর একখানি হাত নিজের করপুটে ধরে' ব'লল, "কিন্তু আমায় মার্জ্জনা করুন।"

এই উত্তর বজ্রঘাতের চেয়ে নিষ্ঠুর। অমরবাবু করজোড়ে ব'লল, "আমায় রক্ষা কর, টুনু—আসন্ন মৃত্যুর কথা শুনিও না।"

"আমার কাছে এ প্রার্থনার আর যে কোন মূল্য নেই, অমরবাবু!"

"কোথায় তবে এ প্রার্থনা জানাব? আমি যে কত অসহায় তা' কি অনুভব কর্‌ছ না?"

"অসহায় বলে'ই তো ভাব্‌না, অমরবাবু। অবলার সহায় পুরুষ, নারীর গৌরব পুরুষের গৌরবে; তাই আপনার এই অসহায় অবস্থা ভারই বাড়াবে, সহায় তো হব না। বিদায় দিন। যে স্মৃতি মুছে' দিতে মুখ ফিরিয়েছি অনির্দ্দিষ্টের দিকে চেয়ে'—সে পথের শেষ কোথায়, জানি না; কিন্তু যে পথে হৃদয় ছুটেছিল ধেয়ে', তার সীমা খুঁজে' পেয়েছি—সে দিকে তো আর চলা যায় না। আমায় মার্জ্জনা করুন।"

অমরবাবুর মনে হ'ল চীৎকার করে' সে কেঁদে' ওঠে—পথ হারিয়ে গভীর অন্ধকারে পথিকের চক্ষে যে আলো ফুটে' উঠেছিল, তা' যেন এক নিমিষে নিভে' গেল। আকুল কণ্ঠে অমরবাবু ব'লল, "টুনু, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় বাঁচাও। তোমার আত্মদান আর কিছু না হোক,

একটা ভিক্ষুককে ঐশ্বর্য্যদানের মত পুণ্য কর্ম্মও হবে। নারী-জীবনের ইহাও তো একটা সুমঙ্গল সার্থকতা!"

অমরবাবুর হাতখানা ছেড়ে' দিয়ে টুনু ব'লল, "আপনার অসহায় অবস্থার উপর আমার পরিপূর্ণ সহানুভূতি রইল। তবে নারী-জীবনের এই সার্থকতার চেয়ে আজ বড় সার্থকতার সন্ধান পেয়েছি। কাজেই আর কথা বাড়িয়ে কাজ নেই, আমি বিদায় হই।"

টুনু পা বাড়াল বাহিরের দিকে।

ক্রুদ্ধ সর্পের মত অমরবাবু ফু'লতে লা'গল। কিন্তু আঘাত দেবার দাবী ছিল না—নির্বিষ সর্পের মত তার আস্ফালন টুনুকে স্পর্শ ক'রল না। ক্রুদ্ধস্বরে সে ব'লতে লা'গল, "দেখ টুনু, আঘাত দিয়েছি বটে, সংসার সমাজের অনুশাসনে তোমায় আমি গ্রহণ করতে পারি নি—কিন্তু পরিণীতা ভার্য্যা না হও—তুমি যে আমার স্ত্রী—এ কথা কোনদিন অস্বীকার ক'রতে পারবে না। আজ এই অবস্থা তোমার উত্তম অবস্থা নয়—প্রতিক্রিয়ার আগুন চিরস্থায়ী হয় না—এ কথা মনে রেখো।"

টুনু চলে' যাচ্ছিল—ফিরে' দাঁড়িয়ে' অমরবাবুর মুখের দিকে চেয়ে লঘু হাস্যে তাকে যেন অপমানের বেত্রাঘাত ক'রল।

অমরবাবু আরও রেগে' উঠে' ব'লল, "এ স্পর্দ্ধা আমার কাছেই দেখালে—যত ক্ষণ বেঁচে' আছ, টাট্‌কা রক্ত-মাংসের দাবী যত ক্ষণ মরেনি, সে দাবী উপেক্ষা করতে পারবে না—এ কথাটা মনে রেখো।"

কথা শুনে'ই টুনুর চক্ষে ক্রোধের বক্র আভাষ ফুটে' উ'ঠল, সে ব'লল, "আপনি তিরস্কার করতে পারেন—কিন্তু এ কথাটাও মনে রা'খবেন, নারী বু'ঝতে শিখেছে, রক্তমাংসের দাবীর চেয়ে আরও দাবী

তার আছে। রক্তমাংসের দাবী ফিরিয়ে দেওয়া যায়, সে দাবী ফেরান যায় না, অমরবাবু। কিন্তু সে কথা আপনার সঙ্গে নয়। আমি কেবল ভাব্‌ছি—রক্তমাংসের দাবীর দায়টা কোন্‌দিক থেকে আগে আসে, আর সে দাবী নারীকে কত ছলনাই না করে!"

টুনু হাসি সম্বরণ ক'রতে পার্‌ল না—হিঃ হিঃ করে' হেসে' আবার ব'লল, "আপনার পূর্ব্ব স্ত্রীর গর্ভে কোন সন্তানাদি হয় নি?"

কথায় কথায় এমনই বিষের জ্বালায় অমরবাবু অস্থির হয়ে' পড়্‌বে, এ আশা সে করে নি। টুনুর সঙ্গে তার যে নিবিড় সম্পর্ক সে তার মর্য্যাদা না রাখ্‌তে পার্‌লেও, টুনুর বিবাহ করে' না থাকাটা তার পৌরুষের জয় বলে'ই তার ধারণা ছিল—আজ এই প্রত্যাখ্যানে সে ভেঙ্গে' যেন গুঁড়া-নাড়া হয়ে' গেল। কাতরকণ্ঠে সে ব'লল, "বিপদ্‌ তো এইখানেই বেশী। তা' না হলে' এত দীনতা আমার কিসের জন্যে—কেনই বা আমার এ মিনতি!"

"বটেই তো, আর একটু সতর্ক হ'লে এ দায় থেকেও আপনি মুক্তি পেতে পার্‌তেন। তবে আসি, অমরবাবু। এখন বোঝা গেল—প্রেমের চেয়েও স্বার্থের দায়টাই আপনাকে টেনে' এনেছে আমার কাছে। সে কাজ আমি আনন্দ-সহকারেই বুক পেতে নিতুম—যদি আপনার সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ না থাকৃত!"

টুনু তখন দরজার কাছে পা বাড়িয়েছে। অমরবাবু প্রগল্‌ভের মত তার আঁচলখানা ধরে' দাবী জানিয়ে ব'লল, "মানে মানে কথা না শোন, তোমার সঙ্গে আমার গোপন সম্বন্ধের কথা তোমার আশ্রয়দাতার কর্ণেও পৌছবে।"

কাপড়খানা শ্লথ করে'ই ধরা হয়েছিল—হেঁচ্‌কা টানে তা' খসে' গেল তার হাত থেকে। বিদ্রূপের অট্টহাস্য তার কর্ণে প্রতিধ্বনি তু'লল।

ঘরে কেহ নাই, শূন্য দৃষ্টিতে অমরবাবু বসে' রইল অসহায়ের মত অবাক্ হয়ে।

এক ঝাঁকুনি খেয়ে' টুনুর গেল ধ্যান ভেঙ্গে'—"কি ব্যাপার?"

রঞ্জন হন্তে-মুখী হয়ে' বলে' উঠ্‌ল, "আরে এস, রেখে' দাও তোমার ধ্যান।"

এমন ধৈর্য্যহীন অবস্থা রঞ্জনের সে কোনদিন দেখে নি—যেন পাগলের মত তার মূর্ত্তি।

"তোমার কথাই সত্য টুনু, তোমার কথাই সত্য—অপরাধের মাত্রা আর সাম্‌লাতে পার্‌ছি না। ঠাকুর দেবতা সত্যই যদি মানো আর তার মধ্যে যদি কিছু বস্তু থাকে, তা' হ'লে এ হতভাগ্য বন্ধুটার আব একটু চক্ষু খুলে' দাও—দোঁহাই তোমার।"

"কি বল্‌ছ তুমি? নেশা-টেশা কর নি তো?"

"তা' হ'লেই হ'ত আর কি! ঝাঁকুনি খেয়ে' আর পার পেতে না—প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ হ'ত। সত্যিই বল্‌ছি, তোমার উপর আমার বিশ্বাস হচ্ছে। তোমার বৌদিদি নিষ্পাপ; কিন্তু ভাব্‌বার কূলকিনারা রইল না—এখন কি করি বল, দেখি?"

"আগে বল, কি এমন দিব্যদৃষ্টি পেলে, যে আমার উপর অস্বাভাবিক চড়াও হয়ে আমার নিয়ম-ভঙ্গ কর্‌লে—তোমার জ্বালায় সাধন-ভজন বুঝি ছাড়্‌তে হয়!"

"আঃ, তা' হ'লে বাঁচি। অমরবাবুর সঙ্গে দেখার পর, তোমার ধ্যান-ধারণার বাতিকে বাড়ীশুদ্ধ লোকের দম বন্ধ হয়ে' যায়, কোন খবরই তো আর রাখ্‌বে না? তিনু ফিরে' এসেছে, শুনেছ?"

"কে তিনু?"

'একেই বলে, সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে' এক বর্ণ জ্ঞান না হওয়া। তিনু, তিনু, আমার মাস্‌তুতো ভাই! মনের পাপ—ছোঁড়াটাকে অপরাধী করা।—আর জ্যোৎস্না! কোথায় গেল জ্যোৎস্না! টুনু, তুমি এস—"

রঞ্জন ছুটে' চলে' গেল ঘর ছেড়ে।

টুনু গত তিন দিন বাড়ীর খবর কিছুই রাখে নি—মায়ের অনুমতি নিয়ে একান্ত মনে ঠাকুর-ঘরেই থাক্‌ত। সন্ধ্যার পর নিজের হাতে হবিষ্যান্ন রেঁধে' খেত। যে আঘাত সে দুঃসাহসের সহিত অমরবাবুকে দিয়ে জয়ের অঞ্চল দুলিয়ে ফিরেছিল, তার প্রত্যাঘাত এমন অসহনীয় হবে, সে আগে বোঝে নি। সর্প দংশন করে মানুষকে, বিষের জ্বালায় মানুষই পুড়ে' মরে না—অবসন্নতার ঘোরে সর্পও নির্জ্জীব হয়ে' পড়ে। হাঁ—অমরবাবুকে সে অপমানের আঘাত দিয়ে, ফিরিয়ে দিয়েছে বিমুখ করে'! শাস্তি দিতে তার প্রবৃত্তি নেই—সে অধিকারও তার আছে বলে' সে মনে করে নি কোনদিন। কিন্তু অপরাধী নিজেই বিধাতার ইচ্ছায় বিচারকের আসনে তাকে যখন বসিয়ে দিল, তখন অপরাধের দণ্ডবিধান করতে হবে বৈকি! কি অত্যাচার! জাতি, ধর্ম্ম, সমাজ যখন পরিপন্থী, তখন নারীর হৃদয় নিয়ে পুরুষের খেলা, তার আনন্দ-লীলা হ'তে পারে; কিন্তু নারীর পক্ষে সে যে মৃত্যুদণ্ড! সে দিন ছিল তার রক্তমাংসের রাক্ষসী ক্ষুধা—আজও সে এসেছে দাবী নিয়ে হৃদয়ের নয়, স্বার্থের—তাকে ধাত্রী হয়ে' তার অতীতের জীবন-ক্ষেত্রের সেবা ক'রতে হবে। পুরুষের দাবী কত পাপে নিজেকে কত রকমেই না কলঙ্কিত করে! ভোগের লালসায় পুরুষের চাতুরী যেখানে সুযোগ পায়, সমাজের আশ্রয় লয়, কোথাও সমাজ অস্বীকার করে; ধর্ম্মে, শিক্ষায়, এমন কি বিজ্ঞানের গোলকধাঁধায় নারীকে ভোগের

ক্ষেত্র করাই পুরুষের প্ররোচনা। নারীর কল্যাণ পুরুষ দেখে না। কত চিন্তা, কত দুর্ভাবনা—প্রতিকারের কান্নায় বুকের শিরা কেঁপে' ওঠে। রুদ্ধ কণ্ঠে হাহাকার স্তম্ভিত হয়। সে কি উৎকট জ্বালা! প্রতিশোধের সঙ্গে করুণার সংমিশ্রণ, জ্বালার সঙ্গে সান্ত্বনা—বিষ ও অমৃতের মিশ্রণের এ দ্বন্দ্ব দূর না হ'লে টুনুর কণ্ঠে সুধাবিগলিত গানের ঝরণা যে ঝরে না—সে তিনদিন তাই ব্রতধারিণী তপস্বিনীর মত নির্জ্জন-বাসেই ছিল।

রঞ্জন সে মানা অস্বীকার করে'ই তার ধ্যানভঙ্গ করে' দিয়ে গেল। প্রথমে সে বিরক্ত হয়ে' উঠেছিল; কিন্তু রঞ্জনের শিশুর মত আচরণে তার কৌতূহল বেড়ে' উ'ঠল—আর কিছু না বুঝুক, জ্যোৎস্নার উপর রঞ্জনের মনে যে সংশয়-মেঘ ঘনিয়ে উঠেছিল, যে কোন কারণেই তা' যে অপসারিত হয়েছে, সে বিষয়ে তার সন্দেহ রইল না।

অপরাহ্নের শেষ রৌদ্রটুকু সম্মুখের নারিকেল-শাখায় ঝিলিক্ তুলেছিল; টুনুর গলায় গান এল সুড়সুড়িয়ে—

"মধুর মধুর তুয়া রূপ
জগজন-লোচন অমিয়-স্বরূপ।"

মায়ের দুয়ারে এসে' সে থম্‌কে' দাঁড়াল। অবাক্ হয়ে' রঞ্জন বসে' আছে মেঝের উপর—তার সম্মুখে গৈরিক-বসনধারী এক তরুণ। মা খাটের উপর পা ঝুলিয়ে হাস্‌ছেন—অপূর্ব্ব ঘটনার যেন শেষাঙ্কের অভিনয় হচ্ছে!

টুনুর গলা শু'নতেই রঞ্জন এক লম্ফে দরজার কাছে গিয়ে তার হাতখানা চেপে' ধরে' হিড়্-হিড়্ করে' ঘরের মধ্যে নিয়ে এল। ব'লল, "ব'স। তিনু, আর একবার সব কথা বল টুনুকে। তুই চিনিস্ না, ও চোখ বুজে' বুজে' সব দেখে! আমি কত অন্যায় ভেবেছি—তা'ও ওর দৃষ্টি এড়ায় নি।"

মা ব'ললেন, "টুনু, আমি ব'লছি, দে তুই তোর বন্ধুর কাণ দুটো মলে'—ছোঁড়া তোকেই শুধু মানে নি তা' নয়—আমার কথাও অবজ্ঞা ক'রেছে।"

"মায়ের কথা অবহেলা ক'র্‌তে পা'র্‌বে না—দিতেই হবে কাণ মলে'।"

রঞ্জন আজ বালকের চেয়েও লঘু। মায়ের অনুরোধে তিনু পূর্ব্বানুবৃত্তি করে' গেল—টুনু বুঝ্‌ল, কত তুচ্ছ ঘটনায় নারীত্বের মর্য্যাদাহানি অনুভব করে' জ্যোৎস্না শিবের ন্যায় স্বামী, সাক্ষাৎ ভগবতীর ন্যায় শাশুড়ী, এই ইন্দ্রভবন পরিত্যাগ করে' চলে' গেছে। তাকে ফিরিয়ে আন্‌তেই হবে পৃথিবী খুঁজে'। কিন্তু তার মনে হ'ল—হতভাগ্য নিধুবাবুর কথা; সে জিজ্ঞাসা ক'রল, "কোথায় সে রোগী নিধুবাবু?"

রঞ্জন অশেষ উৎসাহে টুনুর হাতখানা ধরে' হিচ্‌ড়ে' হিচ্‌ড়ে' নিয়ে ছুট্‌ল বারান্দার সীমান্তে একখানি ঘর লক্ষ্য করে'।

খাটের উপর শুয়ে' আছে নিধুবাবু—মানুষ বলে' তাকে চেনা যায় না। তার উপাধানের পাশে রুমালে বাঁধা একটা পুঁটুলী। রঞ্জনকে দেখে' তার চক্ষে উল্লাসের ঢেউ উ'ঠল—অতি ক্ষীণকণ্ঠে সে ব'লল, "এস ভাই, এস।"

রঞ্জন ব'লল, "এই জ্যোৎস্নার ভাই নিধুবাবু। এই পুঁটুলীতে জ্যোৎস্নার অলঙ্কার।"

তাড়াতাড়ি রুমালখানা খুলে', সীঁথি, শতনরী প্রভৃতি অলঙ্কারগুলি বের করে' সে টুনুর সম্মুখে ছড়িয়ে দিল, বল্‌ল, "বল তো নিধুবাবু—লাইন ক্রস করে' যাওয়ার সময়ে কেমন করে' গ্রেপ্তার হলে'। তার পর গয়নার পুঁটুলি দেখে', তোমায় পুলিশ কেমন করে' চালান

দিল—দাগী চোর, সঙ্গে সঙ্গে দুই বৎসর কারাদণ্ড—আর জ্যোৎস্না, সে একাকিনী ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল। কোথায় গেল—তার কি হ'ল—কেউ তো তা' জানে না। শুন্‌ছ, টুনু?"

টুনুর চোখে জল গড়িয়ে প'ড়ল। ঘটনা যেমনই করুণ, তেমনই মর্ম্মান্তিক। তিনকড়ি বাবু সম্পর্কে দেবর হ'লেও, রহস্যের মাত্রা এমনই বাড়িয়ে ফেলেছিলেন, যে সতীলক্ষ্মী বধূঠাকুরাণীর তা' পীড়নই মনে হয়েছিল। লুব্ধ ভ্রাতার প্ররোচনায় স্থানভ্রষ্টা জ্যোৎস্না—না জানি কোথায়, কত ব্যথায় তার দিন অতিবাহিত হচ্ছে! টুনুর চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়ে হঠাৎ রঞ্জন বলে' উঠ্‌ল, "টুনু, তুমি সব জান, বল্‌তে পার, সে বেঁচে' আছে কিনা? যদি বেঁচে' থাকে—কোথায় আছে বল্‌তে পার? কোথায় গেলে তার দেখা পাব? টুনু, তোমার দেবতাকে আমি স্বীকার করে' নেব—মানুষের এই উপকার স্বর্গের দেবতা কি করবেন না?"

ক্ষীণকণ্ঠে নিধুবাবু ব'লল, "আমায় গলা টিপে' মার—কত পাপ করেছি—এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। মায়ের পেটের বোনকে রাজার ঘর থেকে পথে দাঁড় করিয়ে দিলুম!"

তার অস্থিচর্ম্ম-সার গণ্ডের উপর দিয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়্‌ল।

"দুই বৎসর কেঁদে'ই কাটিয়েছি' জেলে—খালাসের দিন শুন্‌লুম, গহনাগুলো কেউ সনাক্ত করতে পারে নি, তা' আমারই আছে, তা'ই একে নিয়ে রুগ্নদেহে সেবাশ্রমেতেই আশ্রয় নিলুম। ঈশ্বর আছেন, রঞ্জনবাবু, ঈশ্বর আছেন,—তা' না হ'লে' সেখানে এমন আপনার জনের দেখা পাব কেন? ঐ তিনুবাবু রঞ্জনবাবুর মাস্‌তুতো ভাই।"

"শু'নছ টুনু? এই ছোঁড়াটার আক্কেল—বি-টি পাশ করে' সাত ঘাট ঘুরে' গৌহাটীতে খুলেছে সেবাশ্রম—যত ম্যালেরিয়া-রোগীর

আড্ডা—নিজেরও শরীর কালি হয়েছে! এখন সবই তো ফিরে' পেলাম—আমার হারানিধির সন্ধান কে দেবে, টুনু?"

টুনু নিধুবাবুর চক্ষের জল কাপড়ের খোঁটে মুছিয়ে দিয়ে মাথায় বাতাস করতে লাগ্‌ল—এমন করে' কোন পুরুষের কাছে সেবার আসন পেতে তাকে রঞ্জন বস্‌তে দেখে নি কোন দিন, রঞ্জনের বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টি টুনুকে যেন বিদ্ধ করতে লাগ্‌ল। টুনু হেসে' ব'লল, "আজ উৎসবের সূচনায়, মুক্তির আনন্দে আমারও প্রাণ ভরে' উঠেছে—আজ মাতৃত্বের জয়গান উঠ্‌ছে বুকে তরঙ্গ তুলে'। আজ পুরুষেরও সেবার অধিকার বিধাতা আমায় হাতে করে' দিচ্ছেন—আমার তপস্যা তিন দিনও পূর্ণ হতে' দিলেন না—"

"বাঁচিয়েছি তোমায়—তিন দিন তপস্যায় থাক্‌লে তোমায় কি আর খুঁজে' পেতুম? কিন্তু টুনু, সেবার অধিকার পরে হবে—জ্যোৎস্নাকে খুঁজে' বার করার ভার নাও।"

মা অনেক বুঝালেন, রঞ্জনের উপদেশেও কোন ফল হ'ল না—তিনকড়ি ব'লল, "যে পা ছুটিয়ে দিয়েছি তা' আর ফেরান যায় না—সংসার-ধর্ম্মে রুচি নেই।"

মা ব'লেন, "মায়ের প্রতিও তো একটা কর্ত্তব্য আছে—তোমার রুচি নিয়েই তো কথা নয়! এসব ধর্ম্ম কলির ধর্ম্ম, পাপ ছাড়া কিছু নয়।"

তিনকড়ি হেসে' উঠ'ল, ব'লল, "মায়ের প্রতি কর্ত্তব্য মানুষের বড় কর্ত্তব্য নয়, মাসীমা—তা' যদি হ'ত, শঙ্কর, নিমাই, বিবেকানন্দ এদেশে জন্মাত না, সকলেরই মা ছিল।"

"তুই কি শঙ্কর, বুদ্ধ হয়েছিস্? বড় বড় কথাই শিখেছিস্, ঘটে বুদ্ধি নেই কিন্তু এক ফোঁটা! বিয়ে-থা না কর, মায়ের অভাব অভিযোগের দিকে সন্তান যদি দৃষ্টি না রাখে—মায়ের অবলম্বন আর কি আছে?"

"আমি ভগবান মানি না, কাজেই এই সহজ দোহাই দিতে চাই না—যা' বিষয়সম্পত্তি আছে মাসীমা, মায়ের আমার ভাব্না নেই।"

"ভগবান মানিস্ না, সন্ন্যাসী হয়েছিস্—"

"সন্ন্যাসী আর হলুম কোথায়? শরীরটা আছে, নিজের পেটের খোরাকের জন্য কতটুকু আর খাটুনী! পরের সেবায় উৎসর্গ করেছি দেহটাকে। যে শান্তি ও আনন্দ পাই—তাতেই ভরে' আছি, মাসীমা। কাপড়খানা রঙিয়েছি, অনেক সুবিধা আছে।"

"কর্ত্তা বল্তেন, কলিযুগে ভণ্ড সন্ন্যাসীর সংখ্যাই বাড়্বে—তোকে দেখে' তাঁর কথাই সত্যি মনে হচ্ছে। যখন কথা শুন্বি না, তখন আর কি কর্ব—তবে মাকে একবার দেখা দিয়ে যাস্।"

তিনকড়ি প্রণাম করে' উঠে' গেল। রঞ্জনও তার হাত ধরে' তাকে নিজের ঘরে নিয়ে এসে' বসাল। যন্ত্রপুত্তলিকার মত সে এসে' বসল ঘরের মধ্যে একখানি সোফায়। যে টেবিলে বসে' জ্যোৎস্নাকে সে পড়াত, চা খেত, সেখানি তেমনই সেইখানে বসান আছে। আলমারিতে, আল্নায় পূর্ব্বের মত দ্রব্য-সামগ্রী সজ্জিত, কিন্তু তবুও শোভাহীন গৃহ। তিনকড়ি একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্ল।

টুনু এ'ল খাবারের থালা হাতে করে'। হেসে' ব'লল, "বৈরাগী মানুষদের আমি চিনি—যখন মায়ের কথার অবাধ্য, ভায়ের মানও রাখলেন না, তখন গরীবের অনুরোধ টি'কবে না, জানি—তবে যাওয়ার আগে একটু মিষ্টি মুখ করে' যান। আমি আপনার নূতন বন্ধু—একটু মনে রা'খবেন।"

এই কয় দিন টুন্নুর সঙ্গে তিনকড়ির যেটুকু আলাপ সম্ভব হয়েছিল, তাতে সে এই মেয়েটীকে অসাধারণ চরিত্রের বলে' ধারণা করে' নিয়েছিল। টুন্নুও খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করায়, তিনকড়ি বুঝেছিল—সে এমন এক জায়গায় আঘাত দিতে চায়, যেখানে তার গোপন ব্যথাটী বিষিয়ে আছে থর নিয়ে। সেও এসেছিল নিজেকে খালি করে' দিতে—যে ভার বুকে নিয়ে সে অতিষ্ঠ তা' থেকে। ঘরে আর কেউ ছিল না—রঞ্জন আর টুন্নু। যাওয়ার সময়ে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার সে করে' নিল।

তিনকড়ি বল্‌ল, "একটু মিষ্টি মুখ নয়, পেটভরা খাবার নিয়ে এসেছেন—কিন্তু খাওয়ার আগে আপনাকে সাক্ষ্য রেখে' দাদাকে কয়েকটা কথা বলে' যাব—আপনি রাজী আছেন তো?"

"আপত্তি নেই; কিন্তু শেষে বিচারকের সাম্‌নে না সাক্ষ্য দিতে হয়, এই সর্ত্ত করা রইল।"

"না মোকদ্দমা তত দূর গড়াবে না, নিজের অপরাধের বিচার নিজেই চুকিয়েছি। আমার কেবল জানিয়ে যাওয়া।"

তিনকড়ির মুখখানি গম্ভীর ও অপ্রসন্ন হয়ে পড়্‌ল। রঞ্জন ভেবে' কুল-কিনারা পেল না, কি সে ব'লতে চায় এমন করে' গোড়া বেঁধে'। টুন্নু ও রঞ্জন দু'জনই তার মুখের দিকে চেয়ে' রইল

"আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আপনি তো নারী—উচ্চশিক্ষিতা বল্‌তে যাদের বুঝায়, আপনিও তাদের একজন। বলুন দেখি, পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে ছেদ পড়ে' আছে চিরযুগ ধরে', তা' পূরণ করার বিজ্ঞান কি, সাধনা কি? শুধু ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট হ'লে এ প্রশ্ন আপনাকে কর্‌তুম না। আপনি চোখ বুজে' বসেন, মালা জপেন, যা' নেই, কোনদিন হবে না, এমন কিছুর কল্পনায় বেহুঁস্ হ

থাকেন ; তবুও আমার মনে হয়—এই ফাঁকের মধ্যে বস্তুতন্ত্র এমন কিছু খুঁজ্ছেন যা' নারীকে পূর্ণ করে' দেয়। ঠিক্ ব'লছি কি না, বলুন? আপনাকেই তাই জিজ্ঞাসা ক'রছি, আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন?"

টুনুকে উত্তর দিতে হ'ল না, আবেগ-ভরে তিনকড়িই একটানা বলে' যেতে লা'গল—"দাদার সংসারে এসেছিলাম লেখাপড়ার দায়ে, কিন্তু কত বড় প্রতারণা তা' কেউ বোঝে নি—আমিও না। আসলে ছিল পুরুষের বুকে যে ফাঁকটুকু তা' পূর্ণ করারই দুরাকাঙ্ক্ষা। শুন্ছেন আমার কথা?"

টুনু 'হাঁ' করে' চেয়েছিল। তিনকড়ি বল্ল, "প্রয়োজন হ'ল, দাদার চেয়ে বৌদিদিকে পড়াবার ভারটা বেশী করে' নেওয়া। আশ্চর্য্য এই, নিজের লেখাপড়ার মত বৌদিদিকে পড়ানটাও ছিল না আসল প্রয়োজন, কিন্তু কেউ কি সেদিন তা' টের পেয়েছিল! আমিও না, দাদাও না, বৌদিদিও না।"

কথাগুলো রঞ্জনের কাছে হেঁয়ালীর মত মনে হচ্ছিল্। সে ব'লল, "পাগলের মত কি বল্ছিস্ তুই?"

"সব কথা শুনে' যাও—মানুষের অতর্কিতে তার বুকের বুভুক্ষু ক্ষুধা এমন ভাবেই প্রবঞ্চনা করে! যা' প্রয়োজন নয়, তাই সে প্রয়োজন বলে' সাম্নে ধরে; তা' না হ'লে প্রবঞ্চনার দুর্ল্লঙ্ঘ্য মায়ার মাহাত্ম্য থাকে না। পড়াতে পড়াতে অতর্কিতে শূন্য হৃদয়ের পূর্ত্তি-কামনাই জেগে' উঠ্ল—কিন্তু যে বস্তু যার খাদ্য নয়, এমন বস্তু কেউ যদি গলাধঃকরণ করে, তা' উদ্গার করে'ই ফেল্তে হয়—আবার খাদ্যবস্তুর যদি চৈতন্য থাকে, সে আক্রমণকারীকে আঘাত দিয়ে বুঝায়, উহা তার অনধিকার-চর্চ্চা। আমার কথা বুঝেছেন কি?

টুনু হেসে' ব'লল, "খাদ্যাখাদ্য-বোধ যদি উভয় পক্ষেই ঘটে, সে বিশ্লেষণ বাদ দেবেন না—কিন্তু !"

"সে অভিজ্ঞতা আমার হয় নি, বোধ হয় সে কথা আপনি জানেন। আমি বল্‌ছি একপক্ষেরই কথা। আমার কথা শেষ হয়েছে, আর দুই ছত্র ব'লব—দাদাকেই শুনিয়ে যাই—যে ক্ষুধার্ত্ত, খাদ্য তার মুখের কাছে ধরে' দিতে নেই। এ সংসারে সেই অবস্থা আমার হয়েছিল। আমি—"

কণ্ঠস্বর কঠিন ও রুক্ষ হয়ে' এল। রঞ্জন ব'লল, "তিনু, আমি বুঝেছি, আর ব'লতে হবে না—"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তিনকড়ি বলে' উঠ্‌ল, "কি বুঝেছ তুমি, জানি না—আজ এই গৃহখানিতে যে হাহাকার, তার মূলে আমি ছাড়া আর কিছু আছে কি না!" খানিকক্ষণ চুপ করে' থেকে আবার সে বল্‌ল, "পুরুষের সঙ্গে নারীর সম্বন্ধে যে গুরুত্ব, সমাজে তা' যদি তরল ও লঘু করে' তোলা হয়, সম্বন্ধের ব্যভিচার অবশ্যম্ভাবী। এখানে প্রগতির নামে অধোগতির পথই প্রসারিত হয়। মনে পড়ে, দাদা পিক্‌চার-প্যালেসের দরজায় আমাদের প্রতীক্ষায় তোমার দাঁড়িয়ে থাকা—সেদিন মিথ্যা বলেছি।"

তিনকড়ির কণ্ঠ রুদ্ধ হ'ল—সে অস্থির হয়ে রঞ্জনের পা দুটো জড়িয়ে ধরে' বলে' উঠ্‌ল, "কিন্তু একটী মুহূর্ত্তের জন্য অপরাধী আমার বৌদিদি নন। সম্পর্কে আমি তাঁর দেবর, তিনি আমার পরমাত্মীয়া। আমার সাহচর্য্যে তিনি একদিনও নিজেকে কলঙ্কিত করেন নি। তাঁর একনিষ্ঠ স্বামিপরায়ণতা, বিশুদ্ধ স্বভাবের উত্তাপে আমিই পুড়ে' ছাই হয়ে গেছি—আমায় ক্ষমা কর, দাদা।"

রঞ্জন বিহ্বল হয়ে' প'ড়ল। তার মনে প'ড়ল একটী একটী করে' প্রতিদিনের ঘটনা। কোন প্রশ্ন করার প্রবৃত্তি তার ছিল না।

কিন্তু তিনকড়ি কোন ঘটনাই অন্ধকারে লুকিয়ে রাখ্‌ল না—জ্যোৎস্নার ব্যথা ও কাতরতার করুণ চিত্র সে চক্ষের জলে ফুটিয়ে তুল্‌ল জীবন্ত ক'রে'। রঞ্জনের চক্ষে জলধারা বর্ষিত হ'ল, টুনু কেঁদে' সারা হ'ল; কিন্তু এই অসম্ভব আলাপনের মধ্যে টুনু ও রঞ্জন যখন আত্মহারা, সেই ফাঁকে তিনকড়ি ঘর ছেড়ে' বেরিয়ে গেল—এমন অছিলায়, যে তাহাই যে তার প্রস্থান-পর্ব্ব, দু'জনেই একথা বুঝ্‌তে পার্‌ল না। পরে সহসা তিনকড়ির পুনরাগমনে বিলম্ব দেখে' দু'জনেই খোঁজাখুঁজি ক'রে' দেখ্‌ল, তখন তিনকড়ি চ'লে' গেছে অনেকক্ষণ।

উক্ত ঘটনার পর বাড়ীর অবস্থা আবার এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ ক'রল। টুনুর গানও গেছে থেমে—আর রঞ্জনের উচ্ছ্বসিত আকুলতা গেছে মুষ্‌ড়ে'। মা'ও দুশ্চিন্তায় শয্যাশায়িনী হয়েছেন। বাড়ীতে কারও মুখে বড় আর কথা নেই—সকলেই যন্ত্রের মত কাজ করে, কারও সহিত সম্পর্ক কেউ তেমন রাখে না। নিধুবাবু থাকেন রোগশয্যায় শুয়ে', যথারীতি তার ব্যবস্থা আছে—ঔষধ পায়, পথ্য পায়। মরণের প্রতীক্ষায় সে যেন দিন গুণে' যাচ্ছে। এখন সকলেরই মনে হয়েছে—জ্যোৎস্নার খোঁজ না পেলে, তাকে ফিরিয়ে আন্‌তে না পা'রলে এ সংসারে আর কোন গতি নেই—কারও প্রাণও আর যেন রক্ষা পায় না।

সকাল হয়, সকলেরই ঘুম ভাঙ্গে; কিন্তু কেউ কারও সঙ্গে কথা কওয়া প্রয়োজন মনে করে না। টুনু ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান করে—লক্ষ বার মন্ত্র জপ্‌লেও আর বাধা পায় না। তার ছিঁড়ে সেতারটা অনাদরে প'ড়ে' আছে ধূলাধূসরিত ঘরের এক কোণে, সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। বাহির থেকে সাধন তার জমে' উঠেছে ঘনিয়ে, কিন্তু অন্তরে তার এই সেতারের সুরটাই বেজে' ওঠে অনুক্ষণ, কোথায় জ্যোৎস্না, কোথায় এই

সোণার সংসারের লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী লুকিয়ে' আছেন সকলের দৃষ্টিকে আড়াল করে'। মা মনে করেন, বুঝি অভিমানে কোন নদীর বুকে সে প্রতিমা আত্ম-বিসর্জ্জন করেছে—অথবা কোন পাষণ্ডের হাতে সর্ব্বহারা হয়ে' তার ফিরে' আসার পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে' গেছে—এতদিন গেল, বেঁচে থাকার মত তার অবস্থা থাক্‌লে সে কি ফির্‌ত না—রঞ্জনের উপর তার রাগ থাকুক, মায়ের জন্য তার মন ছট্‌-ফট্‌ ক'রতই! সে যখন ফেরে নি, আর সে ফির্‌বে না। নৈরাশ্যের অন্ধকারে দুই চক্ষু ঝাঁপিয়ে জলধারা ঝরে। বুঝি এই শয্যাই তাঁর মরণশয্যা হ'ল!

রঞ্জন ঘরময় ছুটাছুটী করে—একবার মায়ের দরজায়, আর একবার টুনুর দরজায় উঁকি মেরে' ফেরে। মনে হয়, দু'দণ্ড তাঁদের সঙ্গে কথা করে' মন হাল্‌কা হবে। কিন্তু ব্যথার পাষাণভার যদি লঘু হয়, সে আর এখন তা' হ'লে দাঁড়িয়ে থা'কতে পা'রবে না—জ্যোৎস্নার জন্য চিন্তায় চিন্তায় ঘনীভূত বেদনার বোঝাই জীবনের যেন ভার রক্ষা করে। সে কাঁদে না, কথা কয় না, কারও মুখ পানে ফিরে' চায় না—দম বন্ধ করে' ছুটে' বেড়ায়। নিঃশ্বাস বন্ধ করে'ই সে দাঁড়িয়ে থাকে আকাশের দিকে চেয়ে'। কত রাত্রি অনিদ্রায় কেটে' যায়, তার হুঁস নেই—জীবন যেন জ্যোৎস্নাময়!

জীবনের ভার লঘু করে' দেয় টুনুর হাসি, টুনুর গান, টুনুর রূপ, টুনুর কথা; সে তাই নিজেই তাকে একদিন নিষেধ করে' দিয়েছে—খাওয়া-দাওয়া, সেবা-শুশ্রূষার ভার থেকে। টুনু অবস্থা বুঝে'ই আড়ালে দাঁড়িয়ে সকল সুব্যবস্থা করে—সেও তন্ময় হয়ে' ভাবে, এই ক্ষুদ্র সংসারটী মরুভূমির মত শুকিয়ে বালুময় হয়ে' যাবে, যদি গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ফিরে' না আসে, যদি তাকে ফিরে' না পাওয়া যায়।

এমনই করে' ঘোর সঙ্কটে রঞ্জনের ক্ষুদ্র সংসার থম্‌কে' থম্‌কে' মন্থর গতিতে চলেছিল।

মায়ের প্রাণে সোয়াস্তি ছিল না। নিজের শরীর সুস্থ নয়, কাদুর মুখেই তিনি সব খবর নেন। ঘরেই তিনি অধীর হয়ে কাদুকে ব'ললেন, "ডাক তো কাদু তোর নূতন দিদিকে, সাড়া-শব্দ যে আর কারুও পাই না; পুরী আমার অন্ধকার, রাম যেন বনবাসে গেছে!"

অনেকদিন পরে টুনু এসে' মায়ের চরণে প্রণতি জানাল—দু'জনেই দু'জনের মুখপানে চেয়ে' দে'খল—সংসারের হাওয়াই বিষিয়ে উঠেছে। শীর্ণ বিশীর্ণ মূর্ত্তি উভয়েরই। টুনু ব'লল, "মা তুমি রোগে ভুগ্‌ছ, চিকিৎসা-পত্র কিছু ক'রলে হয় না?"

মা ও ব'ললেন, "এ তোমার কেমন চেহারা হয়েছে? সে পদ্মকলির মত তোমার কাঁচা মুখখানি শুকিয়ে যে কালি হয়ে' গেছে! রঞ্জন বুঝি আর কিছু দেখে না?"

টুনুর মুখে ম্লান হাসি। মা চক্ষু মুদিত করে' ব'ললেন, "আর গানও তো গাও না, মা"! তারপর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে' ব'ললেন, "উৎকণ্ঠার দিনে তবুও মানুষ বাঁচে; কিন্তু আশার সূত্র ছিঁড়ে' গেলে, প্রাণ আর টেঁকে না। আমাদের এই অবস্থা। আচ্ছা, সত্যই কি বৌমাকে আর ফিরে' পাব না?"

কাদুর চোখে জল এল, টুনুও নিরুত্তর। গভীর নিস্তব্ধতায় ঘরখানি থম্-থম্ ক'রতে লা'গল।

দুম্-দুম্ করে হাঁফাতে হাঁফাতে রঞ্জন এসে' ব'লল, "ভগবান নিশ্চয়ই আছেন—আমাদের প্রার্থনা শুনেছেন। এই পেয়েছি তোমার বৌমার খবর।"

মা উঠে' ব'সলেন শয্যা ছেড়ে'। কাদুর পা দুটো থর্-থর্ করে' কাঁপতে লা'গল। টুনু ব'লল, "আঃ বাঁচালে—কোথায় তিনি?"

রঞ্জনের ঠোঁট দুটো বশে ছিল না—থর্-থর্ করে' কাঁপ্‌ছিল অস্থিরতায়। সে হাঁফাতে হাঁফাতেই ব'লল, "কি আশ্চর্য্য, আমরা মরছি কেঁদে-ককিয়ে, প্রাণ আমাদের বেরিয়ে যাচ্ছে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে, আর তিনি কি না মজা করে' গড়ে' তুলেছেন নয়াগড়ে দত্তাশ্রম? খবর কি করে' পাব, বল?"

মা বললেন, "কি রকম?

রঞ্জন একখানা চিঠি প'ড়তে লা'গল—তাতে লেখা আছে ঃ—

"প্রিয় রঞ্জনবাবু—

চোখের ভুল নয়—আপনার মাথায় ফেট্টি বাঁধা—হল-ঘরে শুয়েছিলেন, আমি ছিলুম মাথার কাছে বসে'। মিসেস্ মুখার্জ্জীর সঙ্গে সেইখানেই দেখা। আজ আবার দেখা হ'ল মানভূমের নয়াগড়ে দত্তাশ্রমে। দত্তাশ্রম আপনার পত্নীরই রচনা। তিনি এক সন্ন্যাসীর শিষ্যা হয়েছেন, নাম নিয়েছেন দত্তা। আশ্রমে এক শিশুবিভাগ খুলেছেন—আনন্দবাজারে তারই বিবরণ পড়ে' মাতৃহারা তিনটী শিশুকে নিয়ে সেইখানে উপস্থিত হই। দেখে' বিস্মিত হলুম—দত্তা আর কেউ নয়, রঞ্জনবাবুর পত্নী!

টুনুকে এই কথা জানিও—যে দায় নিয়ে তার কাছে গিয়েছিলুম, স্বার্থপর নারী তা' প্রত্যাখ্যান করায়, খুবই বিপদে পড়েছিলাম। কিন্তু Good luck— মেয়ে তিনটির প্রতিকার হ'ল—"

এই পর্য্যন্ত পড়ে', বিস্ময়ে, আনন্দে বিস্ফারিত চক্ষে টুনুর দিকে চেয়ে' রঞ্জন ব'লল, "আর পড়ব না, টুনু—তারপর শূয়ার ভারী ভারী মন্দ কথা লিখেছে!"

মা আনন্দে অধীর হয়ে ব'ললেন, "আমায় নিয়ে চল্ রঞ্জন, আমায় নিয়ে চল্। বৌমা শিশু-আশ্রম খুলেছে—আমিও তার কন্যা-স্থানীয়া, আমিও আশ্রয় পাব। আমায় নিয়ে চল্।"

"তুমি যাবে কি, মা—খবর যখন পেয়েছি, আর রক্ষে আছে? আজ রাত্রেই রওনা হচ্ছি। কি বল, টুনু?"

"কিন্তু তোমার যাওয়া হবে না—মাকে নিয়ে আমি যাব।"

"হুঁ, খুব বিদ্যে তোমার! তবে জোগাড় করি, মা? আজ রাত্রেই রওনা হচ্ছি।" দ্রুত সে ঘর থেকে যেমন বাহির হবে, টুনু হাতখানা ধরে' ব'লল, "বুঝেছি অমর বাবুর পত্র, চিঠিখানা আমায় দিয়ে যাও।"

"না—না।"

কিন্তু টুনু ছোঁ মেরে' চিঠিখানা কেড়ে' নিয়ে' নিজের ঘরের দিকে দৌ'ড়ল। একটা নূতন প্রাণ নেমে' এল মরা সংসারে। রঞ্জন লাফ দিতে দিতে টুনুর পশ্চাতে অনুসরণ ক'রল। টুনু কিন্তু ঘরে গিয়েই দোর বন্ধ করে' দিল ঝনাৎ করে'—রঞ্জনের কোন অনুনয় সে শুনল না।

আজ মধ্যাহ্নে অনেক দিন পরে অন্নথালা হাতে টুনু এসে' উপস্থিত হ'ল রঞ্জনের ঘরে। রঞ্জন উৎফুল্ল হয়ে' হেসে' ব'লল, "পৌনে ছটায় গাড়ী। পৌঁছব প্রায় দ্বিপ্রহর নিশিতে, দত্তাশ্রমের দরজা খোলা পাব তো?"

কিন্তু টুনু শুকিয়ে গেছে সূর্য্যোত্তাপে নলিনীর মত মলিন হয়ে। সে ব'লল, "এখন তো কারও কথা শুনবে না তুমি? ব'লছি, এই আনন্দের বোঝাটুকু বইতে আমায় অধিকার দাও—সে কথা কাণে নেবে কি?"

"খুব তুমি! যদি যাই, তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাব। রাজী আছ?"

'না—যদি যাই, মাকে নিয়ে যাব—তোমার সঙ্গে না।"

রঞ্জন ঘাড় নেড়ে' ব'লল, "তুমি ঠাট্টা করছ, দত্তাশ্রমে আমার প্রথম

পদার্পণ দরকার আছে, টুনু—কিন্তু ভুলে' গেছি কথাটা, চিঠিখানা কোথায়—?"

"ভয় নেই, এই নাও তোমার চিঠি। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—ভাতের থালা ইচ্ছে করে'ই বয়ে' এনেছি, আমার ছোঁওয়া অন্ন গ্রহণ করায় তোমার বাধ্‌বে না!"

"কি ব'লছ তুমি? তুমি কি মনে কর, ঐ শূয়ারটার কথায় আমি বিশ্বাস করেছি?"

"বিশ্বাস না করাটাই অন্যায়। অমরবাবু যা' লিখেছেন, তা' এক-বর্ণও মিথ্যা নয়।"

রঞ্জন চুপ করে' রইল।

টুনু ব'লল, "সে সত্য কথাই বলেছে। আমার দেহ মন সে কলঙ্কিত করেছে। দুঃখ আমার নেই তার জন্য এক বিন্দু। আমার বড় দুঃখ, সে তোমায় আমার হাতের জল ছুঁতে বারণ করেছে। আমি জানি, তুমি আমায় ভালবাস; যৌবনের অযাচিত দান যে এমন করে' অবহেলায় আবর্জ্জনার মত ঘৃণা করে, তাকে ক্ষমা নেই, রঞ্জনবাবু। আজ প্রতিশোধের আগুনে বুক জ্বলে' ওঠে; কিন্তু আমার কথাই কথা নয়—তোমার মনে কি ঘৃণা হয় না?"

"এক বিন্দু নয়, এক বিন্দু নয়! আমি চীৎকার করে' ব'লছি টুনু, একবিন্দু নয়। ও শূয়ারের কথা আমি বিশ্বাস করি নি, তুমি জোর করে' ব'ল্‌লেও আমি বিশ্বাস ক'রব না। আর কি লিখেছে, দেখেছ?—"

রঞ্জন টুনুর হাত থেকে চিঠিখানা কেড়ে' নিয়ে নিজেই পড়ে' গেল:—

"দত্তা নিজের পরিচয় দিতে চায় না—আমিও ছা'ড়বার ছেলে নয়। তাকে হল-ঘরে কখন কোন্ জায়গায় দেখেছিলাম তা' আমার

মনে ছিল—তোমার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছিল, এই কথা ব'লতেই তার চোখদু'টী উপছে' জল গড়িয়ে প'ড়ল, আর গোপন ক'রতে পা'রল না নিজেকে। আশ্চর্য্য, সে টুনুকে চেনে, চেন না তুমি, এই দুঃখ। টুনু তোমার কাছে আছে শুনে', তোমার খাওয়ায় দাওয়ায়, তোমার পরিচর্য্যা করে, শুনে' সে যে বেশ সুখী হ'ল না—তার মুখ দেখে'ই বুঝে' নিলুম। আমিও বল্‌তে ছাড়ি নি টুনুর কলঙ্ক-কথা! সে তোমার মাথা খেতেই ওখানে আছে—একথাও জানিয়ে দিলুম।"

টুনু ব'লল, "বাকীটুকু পড়, তোমার পায়ে পড়ি।"

"দত্তা দেবী, টুনু রাক্ষসী। আজ আমার সমাজ নাই, সংসার নাই; টুনুর আশ্রয় তুমি, তাই সে উপেক্ষা ক'রল অনায়াসে আমায়। এই কথাটা মনে রেখো—টুনু উচ্ছিষ্ট, আমার প্রসাদ মাত্র। রঞ্জন, তুমি আমার বন্ধু, এই অনুরোধ অনায়াসেই ক'রতে পারি—তার হাতের জলটুকু ছোঁয়াও পাপ, সাবধান হয়ো।"

Non-sense—চিঠিখানা সে টুক্‌রো টুক্‌রো করে' ছিঁড়ে' ফেল্‌তে যাচ্ছিল, টুনু কেড়ে' নিয়ে তা' আঁচলে বাঁধল। টুনুর বাক্ রুদ্ধ, কিন্তু কান্না প্রবোধ মান্‌ল না; আর্ত্তকণ্ঠে কেঁদে' সে ব'লল, "তোমার মত দেবতাকে পরীক্ষা করাও মহাপাপ। এ ভাত তোমায় খেতে দেব না আমি, আমি অস্পৃশ্যা। ঠাকুরকে নূতন করে' ভাত আনতে বলেছি, আমার এই ভাত তুমি খেয়ো না—"

"আল্‌বৎ খাব। টুনু যদি নরকের ক্রিমিও হয়, সে আমার বোন, সে আমার বন্ধু। তাকে আমি ভালবাসি—" এই বলে' সে বাঁ হাতে টুনুর দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধ মুঠিয়ে ধরে', দক্ষিণ হস্তে হাফ্‌স্-হুফ্‌স করে' অন্নাহারে প্রবৃত্ত হ'ল।

মা কড়ে আঙ্গুল কাম্ড়ে', ললাটে ফুৎকার দিলেন তিন বার—চন্দনের ফোঁটা কপালে লেপে' দিয়ে ব'ল্লেন, "আজই তোর জয়যাত্রা—বরণ-ডালা সাজিয়ে আমরা বসে' রইলুম। ঘরের লক্ষ্মী না ফেরা পর্য্যন্ত এ সংসার সংযম-ব্রত পালন ক'রবে।"

শাঁক বেজে' উঠ্‌ল অকস্মাৎ আকাশ-বাতাস মুখরিত করে'। দাস-দাসী, পরিজনবৃন্দ জটলা পাকিয়ে ফটক পর্য্যন্ত রঞ্জনকে পৌঁছে' দিয়ে এল। রঞ্জনের গাড়ী ছু'টল ফোঁসাতে ফোঁসাতে নক্ষত্রবেগে। উৎসবের প্রতীক্ষায় বাড়ীর নবশ্রী ফুটে' উঠল।

— বার —

তখন বেলা দশটা কি এগারটা হবে। ধন্যা ছুটে এসে' খবর দিল, কল্‌কাতা থেকে কে একজন বাবু এসেছে, তোমার খোঁজ কর্‌ছে।"

জ্যোৎস্না নিরাভরণা, বিদ্যুল্লতার ন্যায় ক্ষীণা, উজ্জ্বল-শ্রী; বিস্মিত হয়ে' বল্‌ল, "প্রভা, বিভার বাবা নয় তো?"

"না, না, এ একেবারে নূতন লোক, সঙ্গে কেউ নেই, একা; কি চেহারা দিদি, যেন রাজপুত্তুর!"

"তা'ও দেখা হয়েছে! তোর ঘুরে' বেড়ান রোগটা যাওয়ার নয়। ধূর্জ্জটী কোথায়?"

"সেই তো আমায় খবর দিতে বল্‌লে—ব'লছে দত্তাদেবীর সঙ্গে দেখা কর্‌ব।"

"ধূর্জ্জটীকে বল—এখন আমি খুব ব্যস্ত, অপরাহ্নে দেখা হবে। কল্‌কাতা থেকে যখন এসেছে, খাওয়া-দাওয়া নিশ্চয়ই হয় নি, ধূর্জ্জটীকে ব্যবস্থা করে' দিতে বল।"

ধন্যা ছুটে' বেরিয়ে গেল।

জ্যোৎস্না গোটাকয়েক ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে নিয়ে শিবস্তোত্র মুখস্থ করাচ্ছিল—প্রথম খবরটা শুনে' তেমন কিছু মনে হয় নি। ধন্যা চলে যাওয়ার পর বুকটা ছ্যাৎ করে' উঠ্‌ল। মনে হ'ল, কলিকাতা থেকে হঠাৎ কে আস্‌বে দত্তাদেবীকে দেখ্‌তে! অমরবাবুর কোন বন্ধু হবে কি? কপাল তার কুঁচকে' উঠ্‌ল। ভাব্‌বার অবসর হ'ল না। ধন্যা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে' বল্‌ল—"ও দিদি, এসব কি কথা শুন্‌ছি! দাদা বল্‌লে—খাওয়া-দাওয়া করুন, ও-বেলা দেখা-শুনা হবে;

বাবু বল্‌লে—খবর দাও দেবীকে, তার স্বামী রঞ্জন এসেছে—ওমা একি কথা গো ?"

জ্যোৎস্নার বুক দুরু দুরু করে' কেঁপে' উঠ্‌ল। অর্থহীন দৃষ্টিতে সে ধন্যার মুখের দিকে খানিক ক্ষণ চেয়ে' রইল—বোধ হয় তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে' গিয়েছিল। পরে একটা দম্‌কা নিঃশ্বাস নিয়ে বল্‌ল, "ডেকে' নিয়ে আয় তাঁকে এইখানে।"

ধন্যার মুখে কথা নেই। সে হতভম্ব—'হাঁ' ক'রে চেয়ে' রইল জ্যোৎস্নার দিকে। জ্যোৎস্না বল্‌ল, "চেয়ে রয়েছিস্ কি ফ্যাল্‌-ফ্যাল্ করে' ? শীগ্‌গীর ডেকে' আন্—তিনি ছাড়া এমন স্পর্দ্ধার কথা আর কেউ ব'লবে না।"

ধন্যা আধ হাত মুখ ফাঁক করে' ব'লল, "কও কি দিদি—তোমার আবার স্বামী আছে না কি ?"

জ্যোৎস্না হেসে' ফেল্‌ল, "তোর নেই, তাই হিংসে হচ্ছে বুঝি ? শীগ্‌গীর যা, তাঁকে ডেকে' নিয়ে আয়।"

ধন্যা উর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌ল একটা নূতন কৌতুকোপভোগের আশায়, কলিকাতার বাবুকে ডেকে' আন্‌তে। জ্যোৎস্না ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলিকে বিদায় দিয়ে, ঘরের একপাশে তক্তাপোষের উপর কম্বল পাতা ছিল, তার উপর তাড়াতাড়ি একখানি ফর্‌সা চাদর বিছিয়ে দিল। কাপড় ঢাকা দিয়ে, জড়সড় হয়ে বসে' রইল মেঝের উপর। কার পদ-শব্দ পাওয়া গেল ঘরের বাহিরে। জ্যোৎস্নার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে' উঠ্‌ল। কিন্তু সে ধুর্জ্জটীর গলা: সে ব'লল, "দিদিমণি, ধন্যা বলে কি ? তুমি ডেকেছ ঐ মুরদ্‌টাকে !"

"হাঁ ধুর্জ্জটী, উনি আমার স্বামী। বাহিরে দাঁড় করিয়ে রেখো না, শীগ্‌গীর নিয়ে এস আমার কাছে।"

ধন্যা হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে বলে' উঠ্‌ল, "কেমন মজা—দাদার কথা বাসি হলে' মিষ্টি হয়, নয় ?"

"চুপ কর্ পোড়ারমুখী—লাথিয়ে মুখ থেঁতলে' দোব।"—ধূর্জ্জটী উৎসাহে, আতঙ্কে এই কথা বলে' বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় মানুষের হৃদয় এমন করে' কাঁপে না—থর্-থর্ করে' জ্যোৎস্নার সর্ব্বশরীর শিউরে' উঠ্‌তে লাগ্‌ল। এইবার পরিচিত পদশব্দ—কতদিন এমন পদশব্দ কাণে তার প্রবেশ করে নি। শ্রুতিরও প্রাণ আছে, ক্ষুধা আছে, পিপাসা আছে; উপবাসী কর্ণযুগল আজ যেন উৎফুল্ল হয়ে' উঠ্‌ল খোরাক পেয়ে', চিরবাঞ্ছিতকে স্পর্শ করে'। জ্যোৎস্না আর মুখ তুল্‌তে পার্‌ল না—দোরের পাশেই সে বসেছিল প্রতীক্ষায়, তার আরাধ্যকে অন্তরে অন্তরে অভিনন্দন দিতে, কিন্তু সম্ভাষণের ভাষা নেই, সে নিঃশব্দে লুটিয়ে পড়্‌ল রঞ্জনের চরণে। সংযমের বাঁধ শত চেষ্টায় রক্ষা করা গেল না। সর্ব্বাঙ্গে প্লাবনের তরঙ্গ-হিল্লোল, চক্ষে অশ্রু, পুলকে শ্বাস বন্ধ হয়, অব্যক্ত বেদনার আনন্দে সে আজ উন্মাদিনী—বাণী শুধু নীরব, বুঝি উহা আনন্দের আতিশয্যে মূক হয়ে' পড়েছিল।

রঞ্জন এই অবস্থায় কি যে কর্‌বে তা' ঠিক কর্‌তে পার্‌ল না। ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' ঘরখানির সর্ব্বত্র পরিচয় নিতেই কেটে' গেল খানিক ক্ষণ; তাকে আর বল্‌তে হ'ল না আসন নিতে, সে তক্তাপোষের উপর বসে' পড়্‌ল বিহ্বল হয়ে'। পা দু'খানা জড়িয়ে কোলে নিয়ে, জ্যোৎস্না আড়ষ্ট হয়ে' বসে' রইল মেঝের উপর। দু'জনেরই কণ্ঠ রুদ্ধ হরিষে-বিষাদে। মাধবী ফুলের গন্ধে বাতাসের লুকোচুরী জ্যোৎস্নার মুখের অবগুণ্ঠন-বসন দুলিয়ে দুলিয়ে যেন বলে' যায়, "মুখ খোল, মুখ খোল, তোমার রুদ্ধ কণ্ঠে বনের পাখীও স্তব্ধ হয়ে' আছে!"

দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর মিলনের মধুরাগিণী দু'জনেরই কণ্ঠে আড়ষ্ট হয়ে রইল, মূর্চ্ছনার সুর তুল্‌ল না। দু'জনেরই বুকে গুম্‌রে' গুম্‌রে' করুণ বেদনাই ফুলে' উ'ঠতে লাগ্‌ল বক্ষ চূর্ণ করে'। জল-ঝরা চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি দু'জনকেই পাগল করে' দিল অনায়াসে। বিচ্ছেদের ব্যবধান এক নিমিষেই দূর হয়ে' গেল। রঞ্জন আর রাখ্‌তে পারে না ভাবের তরঙ্গ বুকে চেপে', সে হুম্‌ড়ি খেয়ে' জ্যোৎস্নার ঘাড়ে গিয়ে পড়্‌ত; কিন্তু জ্যোৎস্না তাকে ধীরে ধীরে পাশে বসিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "কখন বেরিয়েছ বাড়ী থেকে—আমার খবর তোমায় কে দিলে?"

কথা বলার সঙ্গে দর-বিগলিত নয়নের জলে গণ্ড তার ভেসে' গেল। রঞ্জনের কোলে সে মুখ গুঁজে' শুয়ে' পড়্‌ল অবসন্ন হয়ে'। চাপা কান্নার করুণ ধ্বনি শুন্‌তে শুন্‌তে রঞ্জনও আর স্থির থাক্‌তে পার্‌ল না। হৃদয়ে হৃদয়ে মিলনের সঙ্কেত তালে তালেই বেজে' উঠ্‌ল একই সঙ্গে। কান্না আজ আর ব্যথার নয়—এত সান্ত্বনা, এত সুখ দু'জনেই কোনদিন উপভোগ করে নি।

সঙ্গীত যতই মধুর হোক, মাঝে বিরাম-মুহূর্ত্ত না থাক্‌লে মাধুর্য্য-রক্ষা হয় না; কান্নারও বিরতি এল সুখের মাত্রা পূর্ণ করে'। জ্যোৎস্নার পিঠের উপর রঞ্জন হস্ত সঞ্চালন কর্‌তে কর্‌তে বল্‌ল, "এ কি হয়েছ তুমি, জ্যোৎস্না—অশোক-বনে বন্দিনী সীতার মত তোমার এই বিষণ্ণ মূর্ত্তি, আমি যে আর দেখ্‌তে পারি না। কেন এত অভিমান—তোমায় হারিয়ে আমার বেঁচে' থাকার সাধ্য কি? অমৃতের উৎস-হারা হয়ে আমার জীবন মরুভূমি হয়েই তো ক্ষান্ত হয় নি, তুমি নিজেও নিষ্ঠুরভাবে শুকিয়ে গেছ?"

কথা আর কণ্ঠ ছেড়ে' বাহির হয় না। ব্যথার আঁচড়ে দুরারোগ্য যত ক্ষত হৃদয় ছেয়ে' দিয়েছিল, সব মুছে' গেল এক নিমিষে। ধীরে

ধীরে জ্যোৎস্না মাথা তুলে' উঠে' বস্‌ল—মৃদু-কণ্ঠে বল্‌ল, "ছিঃ ছিঃ, একি তোমার মর্ম্মর-পাথরের মেঝে! ধূলির উপর এমন করে' বস্‌তে আছে? উঠে' বস।"

অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে সবখানি মুখ তার দেখার উপায় ছিল না—বর্ষণ-সিক্ত আঁখির দৃষ্টি রঞ্জনের উপর মধু বর্ষণ করছিল। সে তার হাত দুখানি জোর করে' টেনে নিয়ে' খাটের উপর উঠে' বস্‌ল—জ্যোৎস্না অর্দ্ধ উত্থিত, মেঝের উপর হাঁটু গেড়ে' রঞ্জনের কোলে মাথা গুঁজে' নুয়ে পড়্‌ল। হৃদয়ের উৎস-দ্বার আবার মুক্ত হ'ল; ঝলকে ঝলকে নয়ন-কোণে অশ্রু উদ্গীর্ণ হ'তে লাগ্‌ল—এ কান্নার সান্ত্বনা নেই, প্রবোধ দেওয়ার ভাষাও রঞ্জনের ছিল না। মাথার চুলগুলি আঙ্গুল দিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌তে কর্‌তে রঞ্জন দেখ্‌ল, জ্যোৎস্নার লাবণ্যময়ী স্বর্ণমূর্ত্তি অনুজ্জ্বল হয়ে' গেছে—মলিন-বসনা, রুক্ষকেশা, শীর্ণকায়া, কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত অপূর্ব্ব দীপ্তি তাকে সুষমাময়ী করেছে। এ এক অপূর্ব্ব কান্তি! জ্যোৎস্না একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে' বল্‌ল, "মা কেমন আছেন? তুমি ভাল আছ?"

রঞ্জন ঘাড় নেড়ে' উত্তর দিল, "সব ভাল।"

জ্যোৎস্না বল্‌ল, "তুমি এ কি হয়ে' গেছ! খাওয়া-দাওয়া কেউ দেখে না বুঝি আর! রাত্রে ঘুরে' বেড়াও বোধ হয় বাইরে বাইরে! তুমি যে উদাসীন মানুষ, আমি নেই, ভগবান রক্ষে করেছেন—নইলে তোমায় কি আর দেখ্‌তে পেতুম?"

"কিন্তু জ্যোৎস্না—এত নিষ্ঠুর তুমি! আমার হাহাকার তোমার মর্ম্মে পৌঁছায় নি। তুমি কেমন করে' আমায় ছেড়ে' রইলে এতদিন! এখন চল—স্বর্ণপুরী শূন্য, তোমায় বাড়ী নিয়ে ফির্‌লে, তবেই আমি ধন্য হব।"

জ্যোৎস্না একটু গম্ভীর হয়ে' পড়্‌ল। কি একটা অকল্যাণ-চিন্তায় তার মুখখানি ছায়াচ্ছন্ন হ'ল। কিন্তু তখনই সে সাম্‌লে' নিয়ে বল্‌ল, "আজই যেতে হবে? 'তার' করে' দাও, দু'দিন পরে ফির্‌ব। এখানে এক কাণ্ড বাধিয়েছি। তোমার পায়েই এই আশ্রম উৎসর্গ করে' নিশ্চিন্ত যে হ'ব, তা' আমি ঠাকুরকে জানিয়ে রেখেছি। অনেকখানি বেলা হ'ল—এসেছ সেই রাত্রের গাড়ীতে নিশ্চয়ই—ধানবাদ থেকে বাসে এলে বুঝি?"

উৎসাহে দু'কূল উপ্‌ছে-পড়া নদীর মত জ্যোৎস্না উচ্ছ্বসিত প্রাণে দাঁড়িয়ে উঠে' বল্‌ল, "আর দেরী করব না। এখানে তোমার অনেক কিছু কর্‌বার আছে, সারা রাত্রি আজ কথা কয়ে'ই কেটে' যাবে। আমি ধন্যাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, খুব ভাল দীঘি—স্নান করে' এস। অনেকদিন তোমায় সাম্‌নে বসে' খাওয়াই নি—আজ নিজেই রাঁধ্‌ব।"

জ্যোৎস্নার সেই সহজমূর্ত্তি, সেই সরল অনিন্দ্যশ্রী। রঞ্জন বল্‌ল, "রাঁধ্‌বে কি তুমি, দত্তাশ্রমে উড়ে বামন না থাকে, জয়া বিজয়া আছে নিশ্চয়ই!"

—"ঠাট্টা করো না। কিন্তু কি তুমি বল ত—সঙ্গে একটা চাকর, কি একটা দরোয়ানও আন্‌তে নেই?"

—"কি আশ্চর্য্য, আস্‌ছি দত্তাশ্রমে, তুমি হচ্ছ কর্ত্রী—এখানে কি গৌরব নিয়ে আস্‌তে আছে? আমি তো ভেবেছিলাম, ভূমিষ্ঠ হয়ে তোমার চরণযুগলে না মাথা ঠেকালে, কথাই কবে না তুমি!"

—"চুপ কর, ঠাট্টা তামাসার অনেক সময় আছে। একলা একটু এদিক্ ওদিক্ ঘুরে' বেড়াও; আমি আজ নিজে হাতে রাঁধ্‌ব, খাওয়াব, দত্তা তোমার চরণের দাসী।"

এই বলে' সে ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

সারারাত্রি কথা আর ফুরোয় না—কত কথা! গেরোর ফের, হঠাৎ জুটল হতভাগা দাদাটা, গহনার পুঁটুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হ'ল তাড়াতাড়ি, পথে বিপদ্, একা, এমন অসহায় অবস্থা মানুষের হয়! তারপর, বর্দ্ধমানে দাসীবৃত্তি। জ্যোৎস্না কাঁদে, হাসে, অনর্গল কথা বলে—রঞ্জন অবাক্ হয়ে শোনে, কপালের সাম্‌নে কুঁচো-কুঁচো রুক্ষ চুলগুলিকে দোরস্ত করে' দেয় আদর করে', তারা চুপ করে' নত হয় না—আদর পেতে সঙ্গে সঙ্গেই মাথা তোলে। বর্দ্ধমানে জামাইবাবু রাধানাথের কথা শুনে', রঞ্জন হো-হো করে' উঠ্‌ল হেসে'। জ্যোৎস্না বল্‌ল, "ভারী মজা, নয়—আমার তখন কি অবস্থাটা একবার বুঝে' দেখ-দেখি!"

"বুঝে' দেখার পথ রেখেছ কোথায়—শুন্‌তেই মজা লাগ্‌ছে—তারপর?"

"তারপর, চোঁচা দৌড়। আলোয় অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে বর্দ্ধমানের ষ্টেশন। বিনা টিকিটেই গাড়ীতে চড়্‌লুম, আমাতে কি আর আমি ছিলুম তখন?"

রঞ্জন গল্প শোনার মত নেশার ঘোরে বল্‌ল, "তারপর দত্তাশ্রমটী মাথায় চাপালে কে?"

"ধানবাদের বড় উকীল ব্রজবাবু, তাঁরই কামরায় উঠে' পড়েছিলুম তাড়াতাড়ি। সত্যি মিথ্যে যা' তা' বলে' তাঁর আশ্রয় নিলুম উপস্থিত রক্ষা পেতে। খুব ডাগর সংসার, দু'হাতে উপায় করেন—খরচে খুব। কিন্তু সেখানে আমার মন টিকল না—কত বার ইচ্ছে হয়েছে তোমার কাছে ছুটে' আসি, কিন্তু—"

"কিন্তু কি? আমায় ভাল করে' চড়্কি-নাচ নাচাবার ইচ্ছাটা আর সাম্লাতে পার্‌লে না বুঝি! তারপরই দত্তাশ্রমে, কেমন?"

"সে অনেক কথা। বড় দুঃখের কথা। কিন্তু ব্রজবাবুকে বল্লুম—আমায় একটা আশ্রম-টাশ্রমে যদি পাঠিয়ে দেন, বড় ভাল হয়, দশের সেবা কর্‌তে পারি। ব্রজবাবুর গুরু চরণদাস বাবাজী—আমায় পাঠিয়ে দিলেন ধানবাদ থেকে সোটান এখানে। তুমি তো সারাদিন ঘরের বা'র হ'লে না—সকাল হ'লে সব দেখাব, চমৎকার রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি! চরণদাস বাবাজী সন্ধ্যার সময়ে আরতি কর্‌তে কর্‌তে, স্বচক্ষে দেখেছি, জ্ঞান হারিয়ে ফেল্‌তেন। তাঁর মনের এক কণাও ঐ বিগ্রহটীর বাহিরে অন্য কিছুতে ছিল না। আমি কিছু সংস্কৃত জানি শুনে', আরতির পর ভাগবত পড়ার ভার পড়েছিল আমার উপর; পড়্‌তে আমিও আনন্দ পেতুম কম নয়। কিন্তু চরণদাস বাবাজীর চক্ষে অশ্রুসাগর যেন উথ্‌লে' উঠ্‌ত। এমন ভক্তি আমি কোথাও দেখিনি!"

রঞ্জন উদাসীনের মত বল্‌ল, "কৈ আজ তো আর ভাগবত পড়্‌লে না! আরতির সময়েও তো তুমি আমার কাছে বসে' রইলে!"

জ্যোৎস্না একটু চুপ করে' আবার বল্‌ল, "আমার কথা শেষ হ'তে দাও—তোমার উত্তর পরে দিব। বড় দুঃখের দিন গেছে আমার এখানে। কি চক্ষে যে তিনি দেখেছিলেন আমায়, তা' জানি নে! ঠিক গত বৎসর এমন দিনেই এই রকম মিষ্টি মিষ্টি হাওয়া বইছিল—আমার এই ঘরের পাশেই আমগাছে জড়িয়ে উঠেছে একটা মাধবী—আজ যেমন গন্ধ পাচ্ছ, এমনই সুবাস বয়েছিল সেদিনও—কিন্তু মনে আমার সুখ ছিল না এক বিন্দু।"

"কিন্তু আজ এখন?"

জ্যোৎস্নার উভয় গণ্ড টিপে' দিল রঞ্জন ; জ্যোৎস্নাও তৎক্ষণাৎ রঞ্জনের মুখ করপল্লবে চেপে' ধরে' বল্‌ল, "ধূর্জ্জটী এসে' ডাক্‌ল, দিদিমণি শীগ্‌গীর এস—গুরুজী কেমন কর্‌ছেন! তাড়াতাড়ি উঠে' গিয়ে' দেখ্‌লুম—বিগ্রহের সাম্‌নে মেঝের উপর চরণদাস বাবাজী মাথা গুঁজে' পড়েছেন ; ত্থ্‌কস্‌ বয়ে' ফেনা বেরুচ্ছে গড়গড়িয়ে। মাথাটা তাঁর কোলে তুলে' নিতেই তিনি ভেউ-ভেউ করে' কেঁদে উঠ্‌লেন। যা' শুন্‌লুম, মাথায় আমার আকাশ ভেঙ্গে' পড়্‌ল—বাবাজীর গলুয়ে সর্পাঘাত করেছিল।"

"ওরে বাবা—পথে আস্‌তে আস্‌তে শুন্‌লুম, বাঘের উপদ্রব আছে! সাঁপের ভয়ও তা' হলে কম নয় তো! তারপর বাবাজী পঞ্চত্ব লাভ করে' স্বর্গে গেলেন ত?"

জ্যোৎস্না রুদ্ধকণ্ঠে বল্‌ল, "তামাসা করো না—গুরু-জন তিনি আমার : ঠাকুর-দেবতা না মানি, কিন্তু তাঁর প্রতি আমার বিশ্বাস ভক্তি যেন মুছে' ফেলার নয়। সেদিন আবার আশ্রয়হীনা হলুম, ডুক্‌রে' কেঁদে' উঠলুম হাহাকার করে'। বাবাজী বল্‌লেন—'কেঁদ না মা, রাধাকৃষ্ণের চরণসেবা করো, তোমার ভয় নেই।' তারপর কাতরাতে কাতরাতে ভাগবতের দপ্তর খুলে', আমায় না জানিয়ে বাবাজী আশ্রমটী আমার লেখা-পড়া করে' দিয়েছিলেন, সেই নথিখানি দেখালেন। আমি তো অবাক্‌! সেদিনও মনে হ'ল—তোমায় খবর দি, এ বোঝা মাথায় নিয়ে কর্‌ব কি? কিন্তু গুরু-জনের কথা অবিশ্বাস কর্‌তে পারি নি। ঠাকুরের চরণ ধরে' জানিয়েছিলাম, দেবতা যদি সত্যি হও, এইখানে এনে' দিও তাঁকে, তোমার নাম করে' তাঁর চরণে যেন ফুল তুলসী দিয়ে ধন্য হই—ঠাকুর মিথ্যে নয়, সে কথা তাই মিথ্যে হয় নি—"

রঞ্জন বল্‌ল, "বাবাজী আর বাঁচ্‌লেন না বুঝি—?"

"না—অনেক ঝাড়ান-ঝোড়ান করে'ও কিছু হ'ল না। ঘর ছেড়ে' পরের জন্য এত ব্যথা পাব, স্বপ্নেও ভাবি নি!"

স্বচ্ছ জ্যোৎস্নাময়ী-রাত্রি। চাঁদটা ঘুরে' এসে' জানালার সোজা-সুজি দাঁড়িয়েছে। চাঁদের আলোয় বিছানা ভাসা। জ্যোৎস্নার মুখের দিকে চেয়ে' আছে রঞ্জন; আর জ্যোৎস্না কোমল করপল্লবে রঞ্জনের মুখখানির উপর স্নেহ-প্রলেপ মাখিয়ে বল্‌ল, "আর আমি কোথাও যাব না এখান ছেড়ে'। বল, তুমি কোথাও যাবে না আর?"

"মার কথা মনে নেই!"

"মনে নেই, কে বল্‌লে—তাঁর কথা তো আগেই জিজ্ঞাসা করেছি। তিনিও তো কাশী বৃন্দাবন যেতে চান; আমার এ বৃন্দাবনে তিনি শান্তি পাবেন, এ কথা নিশ্চয় করে'ই বল্‌তে পারি।"

"কিন্তু আমি এখানে শান্তি পাব না, জ্যোৎস্না"—

"কেন পাবে না, আমায় কি তোমার ভাল লাগে না আর, অপরাধ কি ক্ষমা কর নি?"

"ও সব কথা বলো না—পৃথিবীতে আর কিছু ভাল লাগে না বলে'ই ছুটে' এসেছি খবর পেয়ে'—ও সবের জন্য কিছু বল্‌ছি না—শান্তি না পাওয়ার বড় কারণ রয়েছে যে!"

"কি কারণ, শুনি?"

"বাঘ আর সাপ—ধূর্জ্জটী ধন্যার মত যদি সাম্‌নে পড়ে, ছোঁওয়া-ছুঁয়ি আর দরকার হবে না—হুতোশেই মারা পড়্‌ব, জ্যোৎস্না!"

"ছিঃ, যা' তা' কথা বল্‌তে নেই। ধূর্জ্জটী ও ধন্যার কথা তোমায় বলা হয় নি। আমাদের আশ্রমেই ওদের ঘর—জাতিতে সাঁওতাল। ওদের সব মরে' হেজে' গেলে চরণদাস বাবাজীই ওদের মানুষ

করেছেন। এমন কীর্ত্তন গায়, শুন্‌লে তুমি অবাক্ হবে! আমি এসে' ওদের লেখাপড়া শিখিয়েছি। মানুষ করে' তুল্‌ছি।"

•

রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। একটা কাঞ্চন-ফুলের ডালে কোকিল ডেকে' উঠ্‌ল পঞ্চমে। সঙ্গে সঙ্গে ধূর্জ্জটীর গলা শুনা গেল। প্রভাতী রাগিণীতে 'গা তোল, গা তোল কানু' বলে' গান ধরেছে। মিষ্ট আওয়াজ বটে! ভোরের বাতাসে রঞ্জনের শরীর এলিয়ে পড়্‌ল। তার নয়ন মুদে' আস্‌ছিল। জ্যোৎস্না দেখ্‌ল, ঘুম এসে' তাকে জড়িয়ে ধরেছে নিবিড়-ভাবে। সে নীরব হয়ে' রইল অনিমিখে তার পানে চেয়ে। রাত্রি এত শীঘ্র শেষ হয়! সে ধীরে ধীরে বাহিরে এসে' দাঁড়াল। আশ্রমের সকলেই তখন শয্যা ছেড়ে' মন্দিরের সাম্‌নে এসে' দাঁড়িয়েছে।

সারাদিন ঘুরে' ঘুরে' রঞ্জন দেখ্‌ল আশ্রমের দেবমন্দির, গোশালা, নূতন শিশুবিভাগের লম্বা হল্, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পর্ণকুটীর, ফুলের বাগিচা, শস্যক্ষেত্র, বিশেষ করে' আশ্রমের এক প্রান্তে এক প্রাচীন বটবৃক্ষের ডালে অসংখ্য প্রকার পাখীর মেলা, সম্মুখে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র, ফসল কাটা হয়েছে, মাঠের আলে আলে কৃষকেরা কেহ চলেছে বোঝা নিয়ে, কাজে অকাজে লোকের আনাগোনা—কলিকাতার কোলাহল শুনে মাথা হয়ে থাকে ভারী বোঝা, নীথর নীরবতার মাঝে যেন শ্বাসে শ্বাসে সে নূতন স্বাস্থ্য অনুভব করতে লাগল।

জ্যোৎস্নার কাজ আর ফুরোয় না—কিন্তু তার কাজের ঘটা যতখানি, ব্যাপারটা তত বড় কিছু নয়। গোটা দশ বার পল্লী-শিশু নিয়ে সারা দিন মেতে থাকা তার নেশা হয়ে' গেছে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র সংস্কার পশ্চাতে তার অনাবিল প্রাণ যদি ঢালা হয় এইরূপ নিরন্তর, ইহার বিপুল মূর্ত্তি গড়ে' ওঠা অসম্ভব নয়; দেশেরও অনেক আশা পূর্ণ হবে।

তার মনে হ'ল, বাঙালার বাপ-মা-মরা ছেলে-মেয়ে কুড়িয়ে খৃষ্টান মিশনরীরা স্থানে স্থানে কত বড়ই না প্রতিষ্ঠান গড়ে' তুলেছে। সেবা দিয়ে তাদের ধর্ম্মই পুষ্ট হচ্ছে দিন দিন অবাধে। আর আমরা মর্‌ছি ভোগে, বিলাসে, একদিকে ঝিমিয়ে—আর অন্যদিকে দারিদ্র্য-রাক্ষসী আমাদের চুষে' খাচ্ছে হাড়-মাস-চিবিয়ে। এই নৈরাশ্য-পীড়িত দেশের বুকে সেবার অধিকার নিয়ে এমন কাজ কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রচলিত হওয়ার দরকার আছে। জ্যোৎস্নার এই প্রতিষ্ঠান বৃহৎ করে' তোলার স্বপ্ন রঞ্জনকে পেয়ে' বস্‌ল। তার মনে হ'ল, কলিকাতার চেয়ে এই পল্লীবাসই ভাল; অন্ততঃ তার যে শক্তি ও সামর্থ্য আছে, জ্যোৎস্নার কাজে তা' যদি নিয়োগ করা যায়, দত্তাশ্রম বাঙালাদেশে একান্ত নগণ্য হ'বে না।

সন্ধ্যা হয়ে' গেছে। মন্দিরে শাঁখ-ঘণ্টা বেজে' উঠ্‌ল। জ্যোৎস্না ছুটে' এসে' বল্‌ল, "তোমার পাল্লায় পড়ে' ঠাকুর-দেবতা আমিও ভুলেছি। কিন্তু সব মানুষ তো তোমায় পায় নি—তাদের তো একটা আশ্রয় চাই! ঐ বিগ্রহ দু'টীকে ঘিরে' এতগুলি লোক জীবন নিয়ে ছুটেছে, তুমি যদি তা' উপেক্ষা কর, ওরা মনে কর্‌বে কি? চল, ঠাকুরের আরতি দেখ্‌বে।"

"ভণ্ডামী করে' লোকের মনে উৎসাহ দেওয়া আমার ধাতে নেই—আমি যা' বিশ্বাস করি না, তুমি কি তা' লোকতঃ আমায় দেখাতে বল?"

"বিশ্বাস কর না কি! ঠাকুর-দেবতাকে বিশ্বাস কর না; কিন্তু ঐ অতগুলি লোক ঠাকুর-দেবতাকে বিশ্বাস করে, তাদের ঐ বিশ্বাসের ভিত্তি ভাঙ্গা উচিত কি? ওদের বিশ্বাসের উপরও তো শ্রদ্ধা দেখাতে হবে! ও-কথা বলো না—আমি যে তোমায় বিশ্বাস করি। অন্যে যদি তোমায় এমন বিশ্বাস না করে, তারা কি বল্‌বে, আমি ভুল বিশ্বাস কর্‌ছি!"

সহজ কথার যুক্তি এমনই অকাট্য, রঞ্জন প্রত্যুত্তরে জ্যোৎস্নার কথা নাকচ করতে পারল না, বল্‌ল, "চল। হেরে' গেছি। যারা কিছু বিশ্বাস করে, সত্যই তারা ধন্য। আমি বিশ্বাস করি তোমায়, এই বিশ্বাস যত স্থির হয়, ধ্রুব হয়, ততই পাই শান্তি, ততই পাই আনন্দ। বিশ্বাসের ভিত্তি যদি টলে, ধৈর্য্যহীন হই, হৃদয় জ্বলে' যায় বৃশ্চিকের দংশনে। এ আমি বেশ অনুভব করছি, জ্যোৎস্না! আমি তোমাদের ঠাকুর-দেবতার মহিমা দেখ্‌তে যাচ্ছি না—যাচ্ছি, বিশ্বাসী মানুষের মূর্ত্তি দেখ্‌তে।"

জ্যোৎস্নার সঙ্গে রঞ্জন এসে' দাঁড়াল, দেবমন্দিরের সম্মুখে। ঘড়ি, ঘণ্টা, কাঁসরের মহারোলে কর্ণ বধির হয়। ধূপ, ধুনা, চন্দনের গন্ধে চিত্ত বিমোহিত হয়। মৃদঙ্গ করতালের ধ্বনি আর অনুচ্চ কণ্ঠের বন্দন-সঙ্গীতে এক অপূর্ব্ব ভাবের সমাবেশ। এক বাবাজী চামর ঢুলিয়ে বরণ কর্‌ল রাধাকৃষ্ণকে, আনন্দের আবেগে মাতালের মত। রঞ্জন জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে' দেখ্‌ল, সে পাশে দাঁড়িয়ে তারই পানে চেয়ে' আছে অনিমিষে। দেবমন্দিরে কথা বল্‌তে নেই—নতুবা সে জিজ্ঞাসা কর্‌ত, ঠাকুরের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে তার দিকে জ্যোৎস্নার চেয়ে' থাকা লোকের চক্ষে পড়্‌লে, তাদের বিশ্বাসের মর্য্যাদা-রক্ষা হ'বে কি? রঞ্জনেরও আরতি দেখা সম্ভব হ'ল না আর। জীবন্ত চক্ষের বঙ্কিম চাহনীর সম্মোহন ছেড়ে' অচল দারু-মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি আর তার ফির্‌ল না। সম্মুখের সিংহাসনে রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তি, আর মন্দির-চত্বারে এই দম্পতির যুগল-মাধুরী একজনের চক্ষু এড়াতে পার্‌ল না—সে ধন্যা। চেয়ে' চেয়ে' সে দু'জনকেই দেখ্‌ছিল। হঠাৎ শাঁখ বেজে' উঠ্‌তেই জ্যোৎস্না মন্দিরের দিকে চাইল, সম্মুখেই ধন্যার বিমোহিত-দৃষ্টি—সে লজ্জায় রঞ্জনের পাশ থেকে ছুটে' সরে' গিয়ে ধন্যার পিঠে বসিয়ে দিল এক

কিল। আরতির শেষে ভক্তকণ্ঠে রোল উঠ্‌ল—"জয় জয় রাধামাধবের জয়!"

দেখ্‌তে দেখ্‌তে এক দিন, দুই দিন, তিন দিন কেটে' গেল। বাড়ী ফেরার কথা উঠ্‌লেই জ্যোৎস্না এমন আশ্রমের কাজে ব্যস্ত হ'য়ে' পড়ে, যে রঞ্জনের কথা আর সেখানে থৈ পায় না। অবস্থা বুঝে' সে মাকে টেলিগ্রাম করে' দিয়েছিল, ফির্‌তে দুই চার দিন বিলম্ব হবে। কিন্তু ফেরার কথা জ্যোৎস্না আমলে আনে না দেখে', সে একটু চিন্তিত হ'য়ে পড়্‌ল। কাজ যে খুব বেশী তা' নয়—দশ বারটী অনাথ শিশু-সন্তানকে দেখার লোক নাই যে, তা'ও নয়। জ্যোৎস্নার উপর প্রধান দায়িত্ব পড়েছে, স্বেচ্ছায় সে ইহা মাথায় তুলে' নিয়েছে, একটা ব্যবস্থা যে না হয় তা'ও না—উপস্থিত কলিকাতায় রওনা হওয়া কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। রঞ্জন আজ কথাটা খোলাখুলি-ভাবেই জ্যোৎস্নার সঙ্গে আলোচনা কর্‌তে বসে' গেল। সে বল্‌ল, "তিন দিন কেটে' গেল, মা হয় তো এসে' পড়্‌বেন, আর দেরী করা চলে না, জ্যোৎস্না—চল, কালই কলিকাতায় রওনা হই।"

জ্যোৎস্নার প্রফুল্ল মুখখানি কলিকাতায় ফিরে' যাওয়ার কথা হ'লেই শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়—রঞ্জন ইহা অনেক বার লক্ষ্য করেছে। জ্যোৎস্না বাড়ী ছেড়ে' চলে' আসার পর, আবার ফিরে' যেতে হয়ত খুবই লজ্জা হবে, এই ভয় ও বাধায় বোধহয় সে বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। কথার উত্তর দিতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে' রঞ্জন আবার বল্‌ল, "কলিকাতার কথা তুল্‌লেই তুমি চুপ করে' থাক—হয় জবাব দাও না, নয় কথা বাঁচিয়ে কাজে ঝাঁপ দিয়ে পড়; কিন্তু আমি তো আর স্থির থাক্‌তে পার্‌ছি না।—আজই একটা হেস্তনেস্ত কর্‌তে হ'বে।"

জ্যোৎস্না ক্ষীণতর কণ্ঠে বলে' উঠ্‌ল, "আমার হয় তো ফেরা হবে না আর।"

লজ্জাবতী লতার ন্যায় তার বদনমণ্ডলের সুকোমল মসৃণ ত্বক কুঁচকে' গেল কথার সঙ্গে সঙ্গে।

রঞ্জন বল্‌ল, "ফেরা হবে না, মানে?"

"এই সব কার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে যাব! অদিনে যিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হব কি করে'?"

রঞ্জন একটু বিরক্ত হয়েই বল্‌ল, "অদিনের আশ্রয় আমার মা'ও তোমার, জ্যোৎস্না? তাঁর কথা তো তুমি মনে আন্‌ছ না?"

জ্যোৎস্নার মুখ পাণ্ডুর-মূর্ত্তি ধারণ কর্‌ল। উত্তর দেওয়ার জন্য গ্রীবা উত্তোলন করে'ই কি ভেবে' সে মাথা নীচু করে' নিল। তারপর ধীরে ধীরে ব'লল, "কলিকাতায় ফিরে' যাবার কথাই বল্‌ছ, এই আশ্রমকে রক্ষা করার কথা একবারও ভাব্‌ছ না। তুমি কি বল, তোমার সঙ্গে ফিরে' যদি যাই, এ আশ্রমের যে ক্ষতি হবে, তার জন্য ঈশ্বরের কাছে আমি দায়ী হব না?"

"আমার বিশ্বাস, তুমি কলিকাতায় বসে' দত্তাশ্রমকে আরও বড় করে' তুল্‌তে পার্‌বে। আমার বিশ্বাস, মা তোমার কাছে আশ্রমের কথা শুন্‌লে, তোমায় বুকে পেলে, তিনি সর্ব্বস্ব দিয়ে তোমার আশ্রম রক্ষা কর্‌বেন। এখন চল, বাড়ী যাই।"

জ্যোৎস্না চুপ করে' বসে' রইল। ফেরার পথ যেন বন্ধ হয়ে' গেছে! যে বাড়ীর সুখস্মৃতি মুছে' ফেলে' সে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে অকূলে, আর বুঝি সেখানে ফেরা যায় না। ঠাকুর মুখ তুলে' চেয়েছেন, অন্তর্যামী দয়া করেছেন, তাই সে তার আরাধ্যকে কাছে পেয়েছে—হৃদয়ের অর্ঘ্য দেওয়ার অবকাশ হয়েছে। আবার না হারাতে হয়, আবার না কাঁদতে হয় বিরহের জ্বালায়—এই আতঙ্কে তার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হয়ে' উঠ্‌ল! কেন যে তার আর বাড়ী ফেরার সাধ নেই, কেন যে সে আর সুখনীড়ে

স্বামিসঙ্গে সুখ পাবে না—সে-কথা মনের জগতে সাপের মত যতই ফণা তুলে' ফোঁস্-ফোঁস্ করে, ততই সে ব্যথায় দুঃখে অভিভূত হয়, সে অনির্ব্বচনীয় বেদনা-প্রকাশের ভাষা নেই। তার মনের এই গোপন ব্যথা, বিষের জ্বালা, যেন পুড়ে'ই সে ছাই হবে! হৃৎপিণ্ড দুলে' উঠ্‌ল—প্রাণের দেবতাকে পেয়ে' আবার বুঝি বিসর্জ্জন দিতে হয়! এই তিন দিনের যে উল্লাস-আনন্দ তাকে মাতিয়ে তুলেছিল, আজ কালিমায় সব যেন ঢাকা পড়ে' গেল। তার বাড়ী ফেরার অনিচ্ছা বেড়ে' গেল। তার বাড়ী ফেরার এই অনিচ্ছা অনুভব করে' রঞ্জন মনে মনে বেশ ক্ষুব্ধ হয়ে' উঠেছিল। জ্যোৎস্নার অবধিহীন প্রেমের পারাবারে সাঁতার কেটে' যে তৃপ্তি, তার চেয়ে তার পরম সুখ তাকে আপনার মত করে' পাওয়ায়। সে যে তার নাগাল ছাড়িয়ে তাকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াবে প্রেমের দাবীতে ইচ্ছামত, এটা সে আর সহ্য কর্‌তে পারে না। রঞ্জন জ্যোৎস্নাকে কিছু না বলে', ঘর ছেড়ে' বেড়িয়ে গেল আশ্রমের বাহিরে।

তখন সন্ধ্যার আব্-ছায়ায় পল্লীপথ ঢাকা পড়্‌ছিল—মাঠের গরু তাড়িয়ে রাখালেরা বাড়ী ফির্‌ছিল গান গেয়ে'। পাখীর রব থেকে থেকে বেজে' উঠ্‌ছিল—রাত্রির মত অবসর নিতে। সন্ধ্যার এই গোধূলি-ছায়ায় দাঁড়িয়ে রঞ্জন আজ গভীর চিন্তায় ডুবে' গেল জ্যোৎস্নার প্রতি ইতিকর্ত্তব্যতা-নির্দ্ধারণে। সে কি ফিরে' যাবে একা, জ্যোৎস্নাকে আশ্রমে রেখে'? জ্যোৎস্না যদি পতি-পত্নীর সম্বন্ধ অস্বীকার করে—হৃদয় ভেঙ্গে' গেলেও, সে আজ প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়েই ঘরে ফির্‌বে নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসীর মত। তার চিরতরল চিত্তখানি চিন্তায় ঘন পাথরের মত শক্ত হয়ে' পড়ল। ললাটে দৃঢ় রেখা-চিহ্ন ফুট্‌ল অন্তরের চিন্তা-চিহ্ন প্রকাশ করে'। কিন্তু সে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য। জ্যোৎস্নার সঙ্গে

সব কথা তো খুলে' বলা হয় নি—তিনুর কথা, নিধুবাবুর কথা, মায়ের কথা, টুনুর কথা—অবস্থার দায়ে মানুষ যে ভাবে গড়ে' ওঠে, তার মোড় ফেরাতে গেলে যে কৌশল ও বিজ্ঞান, তা' উপেক্ষা করা চলে না। এই আশ্রমের প্রতি জ্যোৎস্নার কর্ত্তব্যবোধের সত্য মূল্য নির্দ্ধারণ করে' তার সাম্‌নে ধর্‌তে হবে, তাকে বোঝাতে হবে বাড়ীর কথা—স্বামী—শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণীর কথা। রঞ্জন যদি হয় তার অন্তরের সবখানি সত্য—তবে তার আনুগত্যই তার সব ধর্ম্ম পূরণ কর্‌বে। রঞ্জনের মনে হ'ল, আশ্রমের চেয়ে, আশ্রম-বিগ্রহের চেয়ে সে-ই জ্যোৎস্নার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। জ্যোৎস্না আর যা'ই হোক, সে চাতুরী জানে না; তার মধ্যে সত্যের ভান নেই। রঞ্জনকে পেয়ে' সে যে বিহ্বল হয়ে' পড়েছিল, এই কয় দিন সে তা' লক্ষ্য করেছে—কিন্তু লোকতঃ, ধর্ম্মতঃ, এমন এক বাধা তার সাম্‌নে বড় হয়ে উঠেছে, যা' সে অতিক্রম কর্‌তে পার্‌ছে না কোন-মতে।

কাল তাকে বাড়ী ফির্‌তেই হবে জ্যোৎস্নাকে নিয়ে। জ্যোৎস্নার হৃদয়ের ধর্ম্ম এই লৌকিক বাধায় কোনমতেই মলিন হবে না। একদিকে সে, আর একদিকে এই আশ্রম। স্বামীর আজ্ঞাই অলঙ্ঘনীয় হবে।

রাত্রে আবার কথা আরম্ভ হ'ল। আশ্রম-ব্যবস্থার কথাই বড় হয়ে উঠ্‌ল। রঞ্জন যতই কলিকাতার কথা তোলে, জ্যোৎস্না ততই বলে, "আশ্রমের সুব্যবস্থা কর—আমি এখুনি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। তোমায় ছেড়ে' এখানে থাকা, সে যে কি নিষ্ঠুর মৃত্যু, তুমি আমার স্বামী, তা' কি বোঝ না?"

"বুঝি বলে'ই আর তোমায় চোখের আড়্ কর্‌ব না। বাড়ী চল, ব্যবস্থা হবে; আশ্রমের গৌরব বাড়্‌বে বৈ কম্‌বে না।"

"কিন্তু আশ্রম রক্ষা কর্‌বে কে?"

রঞ্জন দৃঢ়কণ্ঠে বল্‌ল "তুমি কি বল জ্যোৎস্না, রাজা ম'লে রাজ্যরক্ষা হয়, তুমি না থাক্‌লে আশ্রম-রক্ষা হবে না?

জ্যোৎস্না রঞ্জনের হাতখানি নিজের হাতে নিয়ে বল্‌ল, "আচ্ছা, পুরীতে তো তুমি অনেক দিন ছিলে আমায় নিয়ে, মনে নেই সে কথা? তেমন সুখ জীবনে আর পাব না? তেমনি করে' কিছুদিন থাক না—তোমার পায়ে পড়ি, বাড়ী যেতে আমার বড় ভয় কর্‌ছে।"

"মিথ্যা নয়! তুমি কাউকে কিছু না বলে' চলে' এসেছ, হয় তো বাড়ী ফির্‌তে তোমার খুব লজ্জা হবে। কে কি বল্‌বে, এই ভয়ও কিছু অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু মা যে তোমার জন্য কি আকুল বুক পেতে' আছেন, তা' তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না, জ্যোৎস্না। চল, কালই কলিকাতায় যাই।"

জ্যোৎস্না কুঁতিয়ে বল্‌ল, "আচ্ছা, চল। কিন্তু তুমি এই আশ্রমের প্রতি যে আমার একটা কর্ত্তব্য আছে, সেদিকে আদৌ নজর দিচ্ছ না।"

"ঠিক কথা নয়, জ্যোৎস্না—তোমার চেয়ে অধিক চিন্তা আমি কর্‌ছি। তোমার এই সৃষ্টিটুকু ক্ষুদ্র, কিন্তু কত বৃহদাকার ইহা হ'তে পারে, তা'ও ভাব্‌ছি এই কয় দিন ধরে'। যেন আমার মনে হচ্ছে, আশ্রমটায় সত্য প্রাণ যদি তোমায় ঢাল্‌তে হয়, সে প্রাণ ফিরিয়ে আন্‌তে হবে, বাড়ী ফিরে' গিয়ে। যে লক্ষ্মীর আসন শূন্য করে' এসেছ, সেখানে তোমায় গিয়ে বস্‌তেই হবে, কায়েমী হয়ে। আর মায়ের আশীর্ব্বাদ নিতে হবে মাথা পেতে। তা' না হ'লে এই আশ্রমের মর্য্যাদা আজিকার চেয়ে এক তিলও বাড়্‌বে না।"

জ্যোৎস্নার হৃদয় পূর্ব্বস্মৃতির আলিপনায় বিচিত্র হয়ে' উঠ্‌ল; মায়ের অগাধ স্নেহের অনুস্মৃতি হৃদয় অভিষিক্ত করে' দিল। বেশী করে' মনে পড়্‌ল শয্যাগৃহের সুখস্বপ্ন। আবার তেমনই করে' সুখ-

পালঙ্কে রঞ্জনের পদযুগল বক্ষে নিয়ে রাত্রিবাসের সাধে হৃদয় পূর্ণ হ'ল। বল্‌ল, "ভাল চল; আমি একটা সাময়িক ব্যবস্থা করে' দিয়ে যাব। কিন্তু মাকে নিয়ে শীঘ্র ফির্‌তে হবে দু'তিন দিন বাদেই—তখন যেন অমত করে' বস' না!"

রঞ্জন প্রহৃষ্ট চিত্তে সে রাত্রি জ্যোৎস্নাকে নিয়ে পরম সুখে কাটিয়ে দিল।

পরদিন প্রভাতে আশ্রমবাসীরা শুন্‌ল, জ্যোৎস্না চলে' যাবে। সকলে জটলা পাকিয়ে করুণ আলোচনা জুড়ে' দিল।

ধন্যা জ্যোৎস্নার গলা ধরে' বল্‌ল, "দিদি, আমি তোমার সঙ্গে যাব। আমায় রেখে' যেও না, তা' হ'লে আমি আর বাঁচ্‌ব না।"

ধূর্জ্জটী পা জড়িয়ে চীৎকার করে' কেঁদে' বল্‌ল, "মাথা খুঁড়ে' মর্‌ব, যদি আশ্রম ছেড়ে' পা ওঠাও।" ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি কান্না জুড়ে' দিল—সে করুণ দৃশ্য দেখে' জ্যোৎস্নার চোখে জল আর ধরে না। রঞ্জনেরও হৃদয় দ্রব হ'ল অবস্থা দেখে'। তার মনে হ'ল, এই অনাবিল সুন্দর হৃদয়খানিকে আশ্রয় করে' যে সৃষ্টি গড়ে' উঠেছে এইখানে, তা' যদি ভেঙ্গে' যায় জ্যোৎস্নার অভাবে, তার জন্য সে-ই দায়ী হবে। পুরুষের অধিকার নারীর হিয়াকে যদি ক্ষুণ্ণ করে, সে অধিকার ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ নয়, পুরুষের স্বার্থপরতা। কিন্তু জ্যোৎস্নাকে তো সে ছেড়ে' দিয়েও যেতে পারে না, তাকে নিয়ে ফির্‌তেই হবে কলিকাতায়। তার পর এই সব চিন্তা।

সারা দিন জ্যোৎস্নার চক্ষে অশ্রুই ঝর্‌ল। স্বামীকে কাছে পেয়ে' তৃপ্তিতে বুক তার ভরে' উঠেছিল—আজ কলিকাতা-যাত্রার পথে এক-দিকে আশ্রমের আসক্তি, অন্যদিকে অজ্ঞাত আশঙ্কায় সে অস্থির হয়ে'

উঠ্‌ল। তার বিষণ্ণ মুখখানি দেখে' রঞ্জনেরও হৃদয় মুচড়ে' উঠ্‌ল ব্যথায়। অপরাহ্নে জ্যোৎস্না ধন্যাকে নিয়ে দীঘির দিকে যাচ্ছিল সান্ধ্যস্নানের জন্য, বিষণ্ণ মনে রঞ্জন বল্‌ল, "ধন্যা, রোজই তুমি প্রহরী থাক দত্তাদেবীর, আজ তোমার ভার আমায় দাও, দেবীর সঙ্গী আমি।"

ধন্যার ভারী মুখ। সারা দিন কেঁদে' কেঁদে' চোখের পাতা তার ফুলেছে; বিনা বাক্যে মুখ ফিরিয়ে সে চলে' গেল। জ্যোৎস্না বল্‌ল, 'ছেলে-মানুষকে দুঃখ দেওয়া কেন, তুমি কোথায় যাবে আমার সঙ্গে?"

"চল, দু'জনে আজ সাঁতার কেটে' আসি। এমন মুক্ত নিরালা স্থান কলিকাতায় নেই।"

"তুমি সাঁতার জান?"

"তোমায় ধরে' ধরে' পা ছুঁড়্‌ব।"

জ্যোৎস্না হেসে' বল্‌ল, "উল্টো কথা—আমায় ধরে' ধরে' পা ছোঁড়া আর হ'ল কৈ? তোমারই নেজুড় ধরে' ছুট্‌তে হ'ল শেষে! নারী অবলা ছাড়া আর কিছু না।"

পথে গাছের অজস্র শুক্‌না পাতা দু'জনের পদশব্দে মর্ম্মরিত। পাশে কাঠ-মল্লিকা ফুটে' আছে অসংখ্য, সুবাসে সর্ব্বদিক্‌ মাতোয়ারা। রঞ্জন বল্‌ল, "তুমি আশ্চর্য্য হবে কথা শুন্‌লে, এখানে এসে' একটা গভীর অনুভূতি-লাভ হ'ল।"

"কি বলত?"

"তুমি আমার, আমি তোমার, এর চেয়ে আর কোন সত্য আমাদের দু'-জনের নেই, কিছু রাখাও অন্যায়।"

জ্যোৎস্না রঞ্জনের মুখের পানে চেয়ে' দেখ্‌ল, সত্যই তার চঞ্চল চক্ষু দু'টী স্থির; মুখখানি গম্ভীর, কিন্তু বেশ প্রসন্ন। বল্‌ল, "প্রকাণ্ড সত্য

আবিষ্কার করেছ! এ কথা তুমি আজ জান্‌লে, তবুও সুখী হলুম। এই কথাটা যদি সর্ব্বদা স্মরণে রাখ, স্বর্গের চেয়ে সুখ আমার; কিন্তু সত্যি বল্‌ছি—বড় ভয় কর্‌ছে আমার। আবার তোমায় হারাব না তো?"

সম্মুখে দীঘির কাল জল থৈ-থৈ কর্‌ছে—ঘাটের উপর দু'-জন এসে' দাঁড়িয়েছে। রঞ্জন বল্‌ল, "দেখ জ্যোৎস্না, আজ আর একটা কথা ভাব্‌ছি—ভাব্‌ছি কি জান? আজ মনে হচ্ছে, এই আশ্রমটা তোমার বুকের ব্যথারই রাগিণী। এটা তোমার সত্যরূপ নয়।"

জ্যোৎস্না একটু অবাক্ হয়ে' বল্‌ল, "কেন, বল দেখি?"

"এখানে আর প্রশ্ন নেই, জ্যোৎস্না। আশ্রমের প্রতি ধূলিকণায় চরণদাস বাবাজীর ভাব ও স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তার বুকের রক্তে এঁকে' উঠেছে আশ্রমের শ্রী। আশ্রমের বিগ্রহও যেন তারই করুণমূর্ত্তি। এই সকলের সঙ্গে তোমার পরিচয় ঘটেছে, পথিকের পরিচয় হয় যেমন পান্থশালার সঙ্গে। যেন মনে হয়, তুমি এই কঠোর আশ্রম-জীবন অভিষিক্ত করে' দিয়েছ তোমার অশ্রু দিয়ে। একে গড়ে' তোল নি তোমার হৃদয়ের অর্ঘ্যে।"

"বেশ নূতন কথা বল্‌ছ—"

"আমিও আশ্চর্য্য হয়ে' যাচ্ছি! অবস্থায় পড়্‌লে আকাট মূর্খের মুখেও ভাষা ফোটে। আমি তবু কিছু লেখাপড়া শিখেছি, জ্যোৎস্না। আমি যতই ভাব্‌ছি আশ্রমের কথা, তোমাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা যতই মনে পাক দিয়ে' উঠ্‌ছে—এই সত্যই আবিষ্কার কর্‌ছি, এ সৃষ্টি তোমার নয়। এ তোমার একটা আশ্রয়। তোমার সবখানি মমতা কোথায় তা' যতই বুঝি, আনন্দে আমার হৃদয় নেচে' উঠে। আমার কথা বুঝছ!"

রঞ্জনের চক্ষু আরক্ত, ভাব-বিভোর। জ্যোৎস্না কাতর হয়ে' তার পায়ের কাছে বসে' পড়্‌ল—বল্‌ল, "সত্যই আমি তোমার দাসী, প্রভুর মুখ দিয়েই আজ অন্তরের বাণী শুন্‌ছি। যেদিন তোমায় চোখের আড় করেছি, মিথ্যার পর মিথ্যাই হয়তো আশ্রয় করেছি, লক্ষ্য হারিয়ে অন্ধের মত। বল তো স্বামীকে সম্মুখে রেখে' যে সেবার ফুল ফুটে' ওঠে মর্ত্ত্যে, নারীর সার্থকতা তা' ছাড়া আর কি হ'তে পারে?"

"দত্তা! দত্তা!"

ঘাটের উপর জ্যোৎস্নার পাশে বিগলিত হৃদয়ে রঞ্জন বসে'—জ্যোৎস্নার চক্ষে জল; রঞ্জনের চক্ষু জ্যোতির্ম্ময়। ধন্যা এসে' দাঁড়িয়েছে তাদের পেছনে কখন, কেউ জানে না। তার চিত্ত ক'দিন ধরে'ই চঞ্চল; এমন দৃশ্য স্বপ্নলোকে ছিল, হঠাৎ ভেসে' উঠেছে তার সাম্‌নে—অজানা যৌবন আজ বিদ্রোহী। সে বিহ্বল।

জ্যোৎস্না আর কথা কইল না—ঘাটে নেমে' গেল; যাওয়ার সময়ে বলে' গেল, "ধন্যা, সন্ধ্যা হয়, পাগলের মত ঘুরে' বেড়াস্ নে। ঘরে যা, সন্ধ্যার শাঁক বাজা।"

ধন্যা ক্ষুণ্নমনে ফিরে' গেল, চক্ষে তার অশ্রু। সিক্ত বসনে উঠে' এল জ্যোৎস্না রঞ্জনের কাছে—হেসে' বল্‌ল, "আমায় যে দত্তা বল্‌লে—"

"আজ থেকে আমি তোমায় দত্তাই বল্‌ব।"

"কেন?"

"দিয়েছ বলে।"

"কি দিয়েছি?"

"তোমার সবখানি। দত্তা, এস, তোমার ব্যথার রাগিণী নীরব হ'তে দেব না; দত্তাশ্রম আমিই রক্ষা কর্‌ব।"

"আঃ, বাঁচলুম! আমার এই ব্যথার সৃষ্টিকেও যদি হাতে পেতে নাও, আমি সার্থক হব চিরদিনের জন্য।"

ঘরে এসে' কাপড় ছাড়্‌ছিল দত্তাদেবী সংশয়ে, সঙ্কোচে। কি জানি, এ ঘর ছেড়ে' যেতে তার বুকে কেন শত সহস্র সর্প দংশন কর্‌ছিল। কিন্তু স্বামীর হাত ধরে' মৃত্যুও বরণ কর্‌তে হবে। নারীর ধর্ম্ম ইহার বেশী কিছু নয়।

বট-গাছের পাশে দাঁড়িয়ে ধানবাদ থেকে ভাড়া-করা মটরখানা হর্ণ দিচ্ছিল ঘন ঘন। মোট-ঘাট বেঁধে' বাহকেরা চলেছে এগিয়ে, পেছিয়ে আছে আশ্রমবাসী আর অনাথ ছেলেমেয়েগুলি। পদে পদে হোঁচট খেতে খেতে জ্যোৎস্না মটরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ধুলোটা টিপ্ করে' একটা প্রণাম কর্‌ল। কিন্তু ধন্যা নেই; সে সন্ধ্যা থেকেই কোথায় গেছে, কেউ সন্ধান রাখে নি।

রঞ্জনেরও মন এই করুণ দৃশ্যে ভেঙ্গে' পড়েছিল টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে'। কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে জ্যোৎস্না গিয়ে গাড়ীতে উঠে' বস্‌ল। এমন সময়ে ডাক-পিয়ন এসে' একখানি টেলিগ্রামের খাম রঞ্জনের হাতে তুলে' দিল। জরুরী 'তার', "Come at once mother dangeriously ill"

'Tunu'—

ত্রস্ত হয়ে রঞ্জন খামখানা জ্যোৎস্নার হাতে দিল। জ্যোৎস্না কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে গাড়ী থেকে নেমে' দাঁড়াল; বল্‌ল, "শীগ্‌গীর যাও, দেরী করো না, গিয়ে খবর দিও।"

"তুমি?"

"আমি যাব না—"

কঠিন দৃঢ় স্বর।

"সে কি কথা?"

"এই কথা বিধাতারও সাধ্য নেই, টলায়। আমি যাব না।"

জ্যোৎস্না পেছন ফিরে' আশ্রমের দিকে গজেন্দ্রগমনে চলে' গেল। রঞ্জন থর্-থর্ করে' কাঁপ্‌ছিল, বল্‌ল, "আর মুখ দেখ্‌ব না, তা' জান?"

"জানি, এ মুখ আর দেখ্‌তে হবে না।"

দূর থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে' এল, জ্যোৎস্না দৃষ্টির বাহিরে!

টুনু পাটি পেড়ে' সব কথা শুনে' নিল, কয়েক মিনিটে। শেষে বল্‌ল, "আচ্ছা, টেলিগ্রামখানা তোমার সঙ্গে আছে, দেখি—"

রঞ্জন পকেট থেকে পোষ্ট অফিসের মার্কা-মারা খামখানা টুনুর হাতে দিল। টুনু সেটা ভাল করে' বিচক্ষণতার সহিত দেখে' বল্‌ল, "বৌদিদিকে নিয়ে এস, এই কথাটা উল্লেখ করা হয় নি বলে' তিনি কি খুব বিরক্ত হয়েছেন বলে' মনে হয়?" রঞ্জনের উত্তরের আগেই আবার সে বল্‌ল, "আমার কথা তোমায় কিছু জিজ্ঞাসা করেন নি?"

রঞ্জন খুব বিরক্ত হয়েই বলে' উঠ্‌ল, "জেরা করে' কোন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার কর্‌তে পার্‌বে না। একটা পাড়াগেঁয়ে ভূত, তার উপর একটা খেয়াল মাথায় ঢুকেছে, সে একেবারেই কাজের বা'র। এ রকম লোককে নিয়ে ঘর করা চলে না, টুনু। আমি তাকেও বলে' এসেছি, তোমাকেও বল্‌ছি—তার মুখ আর দেখ্‌ব না। মা ভাল হোন, একটা ভাল জায়গা দেখে' কিছুদিন বেড়িয়ে আস্‌ব, তারপর—"

"আচ্ছা, সে সব মৎলব পরে হবে। এখন মাকে কি বলা যায়, বল দেখি?"

"আমি এসেছি, তা' তিনি জানেন না। যখন একটু ভাল আছেন, সোজা কথা বল্‌ব, সে আস্‌বে না—ধরে'-বেঁধে বিয়ে দিলেই বন্ধন চিরস্থায়ী হয় না—আমি তাকে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছি।"

টুনু একটু চিন্তিত হয়ে' বল্‌ল, "কিন্তু রঞ্জনবাবু, মা এ কথা শুনে সুখী হবেন না,—জ্বর হয় তো বেড়ে'ই যাবে। উপায়ও আর কিছু নেই। আপনি আমার সঙ্গে আসুন, যা' তা' বলে' ফেল্‌বেন না;

মায়ের মনে ব্যথা না লাগে, ধীরে ধীরে কেবল বল্‌বেন, আশ্রমের দায়িত্ব ছেড়ে' বৌদিদি আস্‌তে পার্‌লেন না।"

"তারপর! একটা মিথ্যা বল্‌লে, তার জের আর মেটে না, তা' জান? সে আস্‌বে না, কোন মতে আস্‌বে না; আর এলেও আমি তার মুখ দেখ্‌ছি না, এ কথাটাও মনে রেখো।"

দু'জনেই মায়ের ঘরে এসে' উপস্থিত হ'ল।

ক'দিন ভীষণ জ্বরের পর, আজ একটু ভাল আছেন; রঞ্জনকে দেখে'ই, মা বল্‌লেন, "বৌমা আসে নি?"

রঞ্জন মায়ের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বল্‌ল, "না মা, সে আর আস্‌বে না।" টুনু সতর্ক দৃষ্টিতে রঞ্জনের দিকে চাইল—রঞ্জন বল্‌ল, "মায়ের পায়ে হাত দিয়ে আমি মিথ্যা কথা বল্‌তে পার্‌ব না, টুনু।"

লজ্জায় টুনুর সর্ব্ব শরীর কণ্টকিত হয়ে' উঠ্‌ল। কিন্তু রঞ্জন একটা ঢোঁক গিলে' বল্‌ল, "সে এক বিরাট্‌ আশ্রম গড়ে' তুলেছে মা, সে দায়িত্ব ছেড়ে' তার আসা আর সম্ভব নয়।"

টুনু রঞ্জনের কথা কওয়ার ভঙ্গী দেখে' একটু হেসে' ফেল্‌ল—কিন্তু মায়ের দিকে চেয়ে' তার মুখও গম্ভীর হয়ে' গেল। মার মুখ বিশীর্ণ ও মলিন, খানিক ক্ষণ তিনি চুপ করে' শুয়ে রইলেন; তারপর ধীরে ধীরে বল্‌লেন, "তুই একটা কাণ্ড বাধিয়েছিস্‌, রঞ্জন। আমার অসুখের টেলিগ্রাম বৌমাকে দেখিয়েছিলি?"

"হাঁ, হাঁ, তুমি বিরক্ত হয়ো না, মা। আমি গোড়া থেকেই বল্‌ছি—তুমি একটা জংলীকে ধরে' এনে' আমার ঘাড়ে চাপিয়েছিলে। সে একটা বনের পাখী, এখানে তার পোষাবে না।"

টুনু কাঠ হয়ে' দাঁড়িয়ে রইল মায়ের পাশে। তার মনে হ'ল, দ্রুত

হৃৎস্পন্দন বুঝি বেড়ে' ওঠে জ্বরের মাত্রা বাড়িয়ে। কিন্তু মা বল্‌লেন, "দেখ রঞ্জন, আমার বিশ্বাস হয় না, মা হয়ে' তোর ঘাড়ে আমি একটা বোঝা চাপিয়ে দিয়েছি। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, আমার অসুখের টেলিগ্রাম দেখে'ও, সে তার কাজের দায়িত্বের জন্যে আসে নি। এমন কিছু ঘটনা আছে, যা' আমি এখনও ধরতে পারছি না, ঘরের লক্ষ্মী যে কারণে বাহির হয়ে' গেছে। কিন্তু আমার শরীরে আর শক্তি নেই, বুকে বল নেই, যে উঠে' যাই, ঘরের লক্ষ্মীকে বুকে তুলে' নিয়ে আসি!"

মায়ের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হ'ল। রঞ্জনও আর কান্না থামাতে পারল না। বল্‌ল, "দেখ মা, তুমি অনর্থক তার মায়ায় পড়েছ। সে আমাদের নয়, এবার তাকে আমি জন্মের মত বিদায় দিয়ে এসেছি।"

কথা শুনে' মা ধড়ফড় করে' বিছানায় উঠে' বস্‌লেন—টুনু তাড়াতাড়ি তাঁকে ধরে' বল্‌ল, "ব্যস্ত হবেন না, মা; রঞ্জনবাবুর মাথার ঠিক নেই, যা' তা' বল্‌ছে। আমি সরকার মহাশয়ের সঙ্গে কাদুকে পাঠাচ্ছি। একখানা চিঠি লিখে' দি, আপনি সই করে' দিন্—বৌদিদি ছুটে' আস্‌বেন। রঞ্জনবাবু নিশ্চয়ই একটা ঝগড়া বাধিয়ে এসেছে।"

"তোমাদের যা' ইচ্ছে তাই কর, সে আর ফিরবে না। আর যদিও ফেরে, আমি আর তার মুখ দেখ্‌ব না।" এই বলে' রঞ্জন রাগে, দুঃখে, অশ্রুসিক্ত চক্ষে বাহির হয়ে' গেল।

মা বল্‌লেন, "দেখ টুনু, রঞ্জনের গোড়ায় অবিশ্বাস, মায়ের হাতে সন্তানের অকল্যাণ হয়—মা চোখে দেখে' যে বধূ বরণ করে' ঘরে তুলে' এনেছে, সে পর হয়, এ বিশ্বাস আমি মনের কোণেও ঠাঁই দিতে পারি না। তুমি চিঠি লিখে' নিয়ে এস, সরকার মশায়কে আজ রাত্রেই পাঠিয়ে দাও। আমার আদেশ কোনমতে বৌমা লঙ্ঘন করবে না।"

টুনু মায়ের কথা মাথা পেতে' নিয়ে নিজের ঘরে এসে' ঢুক্‌ল।

চিঠির কাগজ-পত্র বা'র কর্‌তে গিয়ে বাক্স খুলে' বেরিয়ে পড়্‌ল অমর রায়ের চিঠিখানা। চিঠির শেষ কয়েক ছত্র যেন তারই বুক-চেরা রক্ত দিয়ে ফুটে' উঠেছে! "টুনু উচ্ছিষ্ট, আমার প্রসাদ মাত্র—"আর সে পড়্‌তে পার্‌ল না। কিন্তু চিঠির অবশিষ্টাংশ তার মনে এঁকে' উঠ্‌ল—অমর বাবু তার হাতের জলটুকু ছুঁতেও বন্ধু রঞ্জনকে নিষেধ করেছে। একথা অমরবাবু বৌদির কাণেও তুলেছে। এই তার টেলিগ্রামখানা হয় তো সতীলক্ষ্মীর হাতে বিষের মতই অনুভূত হয়েছে—তিনি নিশ্চয়ই মনে করেছেন, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, তাহারই হাতে তার স্বামী অন্নগ্রহণ করেছেন, সেবা নিয়েছেন, সান্ত্বনা পেয়েছেন, এ স্মৃতি তিনি হয়তো সহ্য কর্‌তে পারেন নি। অকস্মাৎ খুবই ক্ষুন্ন হয়ে' পড়ায় তিনি গাড়ী থেকে নেমে' পড়েছিলেন—তার উপর রঞ্জনবাবুর তিরস্কার তাঁর ব্যথার মাত্রা নিশ্চয়ই বাড়িয়ে তুলেছে। এ ছাড়া হঠাৎ মায়ের এত বড় ব্যারাম শুনে'ও স্বামীর সঙ্গে আগমনমুখী বৌদিদি ফিরে' যাবেন কেন?'

টুনুর মনে এই চিন্তা যতই ঘনিয়ে' উঠে, ততই বিশ্বাস দৃঢ় হয়। ভাব্‌তে ভাব্‌তে তার কণ্ঠে গুন্‌গুনিয়ে গান উঠ্‌ল—ঘরের কোণ থেকে এস্রাজটা টেনে' নিয়ে ছড়ির টানে সুর তুলে' গান ধর্‌ল—

নারীর মনে পশি' যায়
যত্নে নাহি বাহিরায়
তনু নহে, সিঁয়া কুলের কাঁটা॥

কিন্তু গান তার ভাল লাগ্‌ল না আদৌ। চিঠির কাগজ নিয়ে সে লিখ্‌তে বস্‌ল। কলমের আঁচড়ে এক ছত্র শেষ করে'ই তার মনে হ'ল, কোন কারণে মায়ের চিঠি পেয়ে'ও যদি তিনি না ফেরেন, মাকে আর

বাঁচান যাবে না। তা' ছাড়া তার টেলিগ্রাম হাতে পেয়ে' ঘৃণায়, অবজ্ঞায় যদি তাঁকে ফির্‌তে হয়ে থাকে, তার হাতের লেখায় তাঁর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে' যাবে।

টুনুর মুখখানি রক্তবর্ণ ধারণ কর্‌ল। সমস্ত বিশ্বটাই যেন মনে হ'ল, বিষিয়ে উঠেছে মৃত্যুর মূর্ত্তি নিয়ে। মনে হ'ল, এ প্রাণের মূল্য বুঝি একটা কাণা কড়িও নয়। কিন্তু পৃথিবীর কলঙ্ক মুছে' ফেলার যে উপায় সে সবখানি বুকের বিশ্বাস দিয়ে আশ্রয় করেছে, তার প্রতি অশ্রদ্ধাই বা সে করে কেমন করে'! চিঠি লেখা বন্ধ করে', এস্রাজটাকে আবার টেনে' নিয়ে, কোলের উপর ছড়ির টান দিয়ে সুরের সঙ্গে গলা ভিড়িয়ে সে উদাত্তকণ্ঠে বাড়ী মুখরিত করে' তুল্‌ল—

চক্ষু-দান দিল যেই
জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেম-ভক্তি যাহা হইতে,
অবিদ্যা-বিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাহার চরিত।

গান শুনে' কাদু এসে' দাঁড়াল সাম্‌নে, রঞ্জন এসে' বল্‌ল, "ভাল লোক ত' তুমি, মর্‌ছি জ্বলে' পুড়ে' ছট্‌ফটিয়ে, আর তুমি আনন্দে আটখানা হয়ে' ভজন সুরু করে' দিলে—ব্যাপার কি বল ত?" কাদু বল্‌ল, "দিদিমণি, মা পাঠালেন, চিঠি লেখা হয়েছে কিনা জান্‌তে। কিন্তু গান শুনে থ' হয়ে' গেছি; থাম্‌লে কেন, দিদিমণি?"

টুনু এস্রাজ্ নামিয়ে রেখে' বল্‌ল, "কাদু মাকে গিয়ে বল, আমি এখুনি আস্‌ছি।"

কানু চলে' গেলে, এক মুখ হেসে' টুনু বল্‌ল, "রঞ্জনবাবু, আলো পেয়েছি। একটা কাজ করুন দেখি, আমার এই বেডিংটা বেঁধে ফেলুন ত শীগ্‌গীর।" কথার উত্তরের প্রতীক্ষা না করে'ই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জিনিষপত্রগুলি সুটকেশে সে ভর্‌তে লাগ্‌ল। দু'-চারখানা কাপড় পাট করে', তোরঙ্গ বোঝাই কর্‌তে সুরু কর্‌ল। টুনুর অকস্মাৎ এইভাবে তৎপরতা দেখে', রঞ্জন বল্‌ল, "তোমাদের জাতটাই এক অদ্ভূত চীজ্, তোমারও মাথা বেগ্‌ড়াল দেখ্‌ছি!"

টুনু হেসে' বল্‌ল, "আকাশের পাখী ঝড়ে, বাদলে, রাত্রির আঁধারে, যেখানে আশ্রয় পায়, গিয়ে বসে। তার কোন ঠিকানা নেই প্রভাতের আলোয় উড়ে' যায় দিগন্তের কোলে। আজ বিদায় নিচ্ছি, রঞ্জনবাবু।"

অকস্মাৎ বজ্রপাত হ'লেও, মানুষ এমন চম্‌কায় না! কাপড় গোছাতে গোছাতে, টুনু বলে' চল্‌ল, "কথাটা আপনাকে বোঝাতে পার্‌ব না। মানুষ পৃথিবীতে জন্মায় বুকে যে সৌরভ নিয়ে, যৌবনেই শতদল-পদ্ম হয়ে' তা' ফুটে' ওঠে অশেষ সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে, মানুষের হিয়ায়। সে মকরন্দ দেবতারই নির্ম্মাল্য—মানুষের স্পর্শে তা' মলিন হয়, মানুষের জীবনও ব্যর্থ হয়ে' যায়। মহাপুরুষ-সংস্পর্শ না পেলে, এ কথা আমিও হয় তো বুঝ্‌তুম না—"

ক্ষিপ্র হাতে সে সব কিছু গুছিয়ে ফেলে' রঞ্জনের দিকে কটাক্ষপাতে বল্‌ল, "বেশ তো তুমি, বেডিংটা বেঁধে' দেওয়ার মত শক্তিও ঘটে নেই, বুঝি?"

"তা' কেন? তোমার ব্যাপার যে কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।"

"ব্যাথার রাগিণী—জীবনের সঙ্গীত। আমি আর কিছু নই, একটি বেদনার সুর। আজ সত্যই চলেছি রঞ্জনবাবু, যেখানে আমার গান আকাশে বাতাসে মিশাবে। আমারই বুকে হানা দেবে, ধুয়ে

মুছে দেবে মনের ময়লা। যদি ফিরি প্রেমের ঝারি হাতে, আবার আস্‌ব রঞ্জনবাবু, তোমাদের মন্দিরে। কথা হেঁয়ালীর মত মনে হচ্ছে, এইবার সোজা কথা বলি—আমি যাচ্ছি বৌদিদিকে ফিরিয়ে আন্‌তে; এই সংসার তিনি না থাক্‌লে কেউ পূর্ণ কর্‌বে না, মায়ের প্রাণ জুড়াবে না, আর তুমিও তৃপ্তি পাবে না জীবনে।”

“আর তুমি?”

“আমি অদৃশ্য পথের যাত্রী, অরূপের কোলে রূপের মাধুরী আমার প্রাণের তৃপ্তি। নীলকান্তি অসীমের বুকে লহরী তুলে’ হৃদয় চলে কোথায়, কে জানে! এখন চল, মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে আসি।”

সত্যই একমুখ হাসি নিয়ে টুনু উঠে’ দাঁড়াল রঞ্জনের সম্মুখে। অপূর্ব্ব মূর্ত্তি, প্রসন্নবদনে এক টুকরা মেঘের ছায়াপাত—সেই টুনু যেন একটা সুমধুর সঙ্গীতের দীর্ঘ প্রবাহ।

রঞ্জনের মূর্ত্তি টুনুর বাণীর মূর্চ্ছনায় ডুবে’ গিয়েছিল তলিয়ে, সে টুনুর সঙ্গে সঙ্গে মায়ের ঘরে গিয়ে হাজির হ’ল।

টুনু মাকে প্রণাম করে’ বল্‌ল, “মা, কপালে স্নেহ-চুম্বন দাও, তোমার স্বাক্ষর নিয়ে জীবন্ত চিঠি আমিই চলেছি বৌদিকে ফিরিয়ে আন্‌তে—আপত্তি করো না মা।”

মা অবাক্ হয়ে’ বল্‌লেন, “তুমি চলেছ? সঙ্গে কে যাবে?”

মায়ের মনে ঘটনা যেন অস্বাভাবিক বলে’ মনে হ’ল না,—বরং টুনুই যেন ফিরিয়ে আন্‌বে তার ঘরের লক্ষ্মীকে, এমনই বিশ্বাস তাঁর বুক ভরিয়ে দিল। টুনুকে জড়িয়ে ধরে’ তিনি বল্‌লেন, “এমন মেয়ে যেন ঘরে ঘরে জন্মায়। রঞ্জন,—চাকর, দারোয়ান, দাসী, সরকার মহাশয়কেও সঙ্গে যেতে বল। বৌমাকে বলো টুনু, তার জন্যই প্রাণ ধরে’ পড়ে’ রইলুম—”

মাকে প্রণাম করে’ টুনু বাহিরের বারান্দায় এসে’ দাঁড়াল।

রঞ্জন বল্‌ল, "সত্যিই চল্‌লে যে—? একটু দাঁড়াও, দেউকিকে সঙ্গে দি ; কানু, সরকার মশায়, সবাইকে প্রস্তুত হ'তে বলি। কিন্তু একটা কথা—সে আসে আসুক, আমি তার মুখ আর দেখ্‌ছি না, এ কথা তাকে জানিও।"

"মার্জ্জনা করো, আমি তোমার চিঠি নই, মায়ের। তোমার কথা তুমিই জানিও, আমায় জ্বালিও না।"

টুনু তাড়াতাড়ি সটান গিয়ে যে ঘরে রুগ্ন জীর্ণ দেহখানি নিয়ে দিনরাত নিধুবাবু পড়ে' থাকে জীবনের দায়ে, সেই ঘরে ঢুকে'ই দেখ্‌ল—তণ্ডুলকণা ছড়িয়ে শুয়ে-শুয়েই নিধুবাবু চড়ুই পাখীদের ভোজ দিচ্ছে।

টুনুকে দেখে', এক মুখ হেসে' সে বল্‌ল, "এস, দিদি এস, আজ সারা সকাল থেকে তোমায় দেখিনি। গান শুনেছি কাণ পেতে ;" তারপর মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করে' বল্‌ল, "মুখখানি যে শুক্‌নো শুক্‌নো দেখ্‌ছি, হাস্‌ছ না কেন দিদি ?"

"তাই নাকি ? ওটা ঠোঁটে এসে' বোধ হয় এখনও পৌছয় নি। কিন্তু একটা কথা বল্‌তে এসেছি, দাদা—আমি এখন চলেছি, নয়াগড়ে দত্তাশ্রমে, বৌদিকে আন্‌তে। সাবধানে থেকো, দিদিটীকে মনে রেখো।"

নিধুবাবু হাঁ করে' চেয়ে' রইল, বল্‌ল, "জ্যোৎস্না এল না রঞ্জনের সঙ্গে, তুমি যাচ্ছ আন্‌তে ; সে না ফেরে, তুমি ফির্‌বে তো ?"

"যদি না ফেরা হয় দাদা, একটু দেখে' শুনে' খেয়ো-দেয়ো, বোনটির উপর অভিমান করে' যেমন রাগ কর, এরকমটী করো না। তোমায় সবল, সুস্থ দেখে' গেলে মনে আর কোন বালাই থাকৃত না।" নিধুবাবু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে' বল্‌ল, "খাওয়া-দাওয়ার চিন্তাই কি বড় চিন্তা, দিদি ! দানা-পানি থাকে, বাঁচ্‌তে হবে ; কিন্তু তোমার দেখা যদি না পাই, মনে আর জোর পাব না, দিদি !"

নিধুবাবু কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

"কেঁদ না দাদা, ফির্‌ব বৈকি ; যাওয়ার আগে নমস্কার করে' যাই," এই বলে' টুনু যোড়-কর কপালে ঠেকিয়ে ঘর ছেড়ে' বারান্দায় গিয়ে পড়্‌ল।

রঞ্জন দাঁড়িয়েছিল, বল্‌ল "ঝড়ের মত তোমার কাণ্ডখানা কি ? তুমি আর যাই হও, একটী মেয়ে-মানুষের বড় কিছু নও—তোমার যা' খুসী তা' করা হ'বে না, বল্‌ছি।"

টুনু রঞ্জনের হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বল্‌ল, "তিরস্কার শাসন চিরদিনই করে' আস্‌ছ। আমাদের তা' গা-সওয়া হয়ে গেছে। এখন চল, গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে আস্‌বে, বারটা চব্বিশে গোমো পেসেঞ্জারে যাব।"

রঞ্জনের সাধ্য নেই টুনুকে ফেরায় ; হাওড়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত সে টুনুর সঙ্গে গেল। অবাক্ হয়ে সে চেয়ে' রইল টুনুর মুখের দিকে—প্রায় দুই বৎসর যে মমতার বাঁধন দিয়ে এই সংসারে সে জড়িয়ে ছিল, এক নিমিষে তা' ছিঁড়ে' ফেল্‌তে তার বাধ্‌ল না ! গাড়ী ছাড়্‌ল বাঁশী দিয়ে; যত দূর দেখা গেল, টুনুর দৃষ্টি ফির্‌ল না রঞ্জনকে ছেড়ে'। রঞ্জন দেখ্‌ল, সে চক্ষের দৃষ্টি প্রফুল্ল, ব্যথার চিহ্ন নেই একবিন্দু, মুক্তির আনন্দে উদ্ভাসিত।

—চৌদ্দ—

জ্যোৎস্না আছ্‌ড়ে' এসে' পড়্‌ল ঘরের মেঝেয় কাটা ছাগলের মত। তার কাতরানি দেখে' আশ্রমের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা ভীড় করে' দাঁড়াল তার ঘরের সাম্‌নে। কেউ গায়ে বাতাস করে, কেউ মাথায় জল দেয়, আকুঞ্চিত হস্তপদ কেহ বা ঋজু করে' রাখে হস্ত-সঞ্চালনে, কিন্তু ব্যথার উপশম কোনমতেই হয় না। জ্ঞান নেই, মুখে কথা নেই; কখনও বা ভূমিতে গড়াগড়ি দেয়, অসহ্য যন্ত্রণায় কণ্ঠে গোঙানির শব্দ। সে করুণ দৃশ্য দেখে' ধূর্জ্জটী চীৎকার করে' কেঁদে' উঠ্‌ল। এক প্রহর রাত্রে ত্রস্ত চরণে ধন্যা উপস্থিত হ'ল আশ্রমে। সকলের মুখে দত্তাদেবীর অসুখের কথা শুনে' সবিস্ময়ে সে ঘরে এসে' দাঁড়াল। ধূর্জ্জটী কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌ল, "হতভাগী, গেছ্‌লি কোথায়, দিদির মুখে একটু জল দে।"

ধন্যা হাঁটু গেড়ে' বসে' বল্‌ল, "দিদি, তুমি যাও নি? এমন কর্‌ছ কেন, দিদি!"

জ্যোৎস্না স্থির চক্ষে তার দিকে চেয়েই যেন হঠাৎ সচেতন হয়ে' উঠ্‌ল—অস্পষ্ট স্বরে বল্‌ল, "ধন্যা, দেখ্‌ তো, চলে' যায় না যেন, আমি গা ধুয়ে' এখুনি যাচ্ছি।"

ধূর্জ্জটী চেঁচিয়ে বল্‌ল, "কার কথা বল্‌ছ, দিদি! স্বামীর কথা? তুমি যে নেমে' এলে গাড়ী থেকে রাগ করে', সেই থেকে কাতরাচ্ছ —আমরা কি কর্‌ব, দিদি?"

জ্যোৎস্না একটু স্থির হয়ে বল্‌ল, "চলে' গেছে সে? কত দূরে গেছে? তুই দৌড়ে' যা ধূর্জ্জটী, আমি এখুনি যাচ্ছি।"

ধন্যা চক্ষে জলের ঝাপ্‌টা দিয়ে বল্‌ল, "দিদি, স্থির হও তুমি, আজ রাত্রি কাটুক, কাল সকালে গরুর গাড়ী ভাড়া করে' ধানবাদ গিয়ে তোমায় গাড়ী ধরিয়ে দেব।"

জ্যোৎস্না নীরব হ'ল।

সারারাত্রি কখনও সচেতন, কখনও অচেতন, কখনও ঘুমের ঘোরে মুখে প্রলাপ-বাণী, কখনও বা নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখে' চমকে' ওঠা—এমনি করে' সমস্ত ক্ষণ কেটে' গেল।

ভোরে ভাঙা গলায় ধুর্জ্জটীর কীর্ত্তন জম্‌ল না। ফর্‌সা হ'তেই আশ্রমবাসীরা এসে' দাঁড়াল দোরের গোড়ায় জ্যোৎস্নাকে দেখ্‌তে। ধন্যা হুকুম দিল, "যে যার কাজ করগে। দিদিমণিকে বিরক্ত করো না।"

জ্যোৎস্নার চৈতন্য ফিরে' এল—ধন্যার গলা ধরে' সে বল্‌ল, 'কি হ'বে ধন্যা, আমার কি হ'বে? আমি যে তারে ফিরিয়ে দিলাম এমন অপমান করে', মনের দোষে—কি হ'বে আমার?"

"কি হ'বে আর! তুমি একটু গায়ে জোর পাও, চল, তোমায় দিয়ে আসি তোমার স্বামীর কাছে। আমি বেশ বুঝেছি, দিদি, তোমার এখানে আর থাকা হ'বে না। অমন দেবতাকে ছেড়ে' তুমি কি আর এখানে থাকৃতে পার?"

ধন্যাকে বুকে আঁকড়ে', চোখের জলে জ্যোৎস্নার বুক ভেসে' গেল; ধন্যা কাঁদতে লাগ্‌ল আকুল হয়ে।

মধ্যাহ্নে সাধ্য-সাধনায় জ্যোৎস্নার মুখে এক ফোঁটা জলও কেউ দিতে পার্‌ল না। সমস্ত আশ্রমবাসী রইল সেদিন উপবাসী। সন্ধ্যার সময়ে জ্যোৎস্না টল্‌তে টল্‌তে বিগ্রহের মন্দিরে আরতি দেখ্‌তে দাঁড়াল। তার মনে হ'ল, ছায়ার ন্যায় রঞ্জন তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে; অ

ধন্যা দেখ্‌ছে বক্র দৃষ্টিতে তার পানে ফিরে' চেয়ে'। বুকে যেন মুষলের আঘাত ; সে নেই—মনের ছলনা! ঘুঁষিয়ে ঘুঁষিয়ে বুকের পাঁজরাগুলো ভেঙ্গে' দিতে ইচ্ছে হ'ল—সে ঘরে এসে' দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ করে' বুকে অজস্র কিলোতে লাগ্‌ল। ধন্যা এসে' বল্‌ল, "করছ কি, দিদি? এমন করে' আত্মঘাতী হ'লে আর কি তাকে দেখ্‌তে পাবে? বেঁচে' থাক্‌লে আবার সব ফির্‌বে। ম'লে কোন চুলোয় যেতে হয়, কে জানে!"

কিন্তু প্রবোধ আর কথায় নেই—জ্যোৎস্নার মনে হ'ল, ছুটে' বেরিয়ে যায় বাড়ী থেকে, চুলোয় যাক্ আশ্রম, মান, অভিমান—কিন্তু মনে যা' হয়, তা'ই তো করা যায় না, বন্দিনীর মত সে শয্যায় পড়ে' ছট্‌ফট্ কর্‌তে লাগ্‌ল।

ধূর্জ্জটী এসে' বল্‌ল, "দিদিমণি, দাদাবাবু বোধ হয় গিয়েই লোক পাঠিয়েছে তোমার জন্য ; সে বল্‌ছে, তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌বে।"

জ্যোৎস্না শুয়েছিল—ধড়মড়িয়ে উঠে' দাঁড়াল, বল্‌ল, "কে, কে? পুরুষ না মেয়ে-মানুষ?"

উত্তরের প্রতীক্ষা রইল না—টুনু এসে' দাঁড়াল জ্যোৎস্নার সম্মুখে। জ্যোৎস্না আর মুখ ফেরাতে পারল না—সে শুনেছিল টুনু হাল-ফ্যাসান ছেড়ে' বৈষ্ণবীর ভেক' নিয়েছে ; কিন্তু এ মূর্ত্তি ছদ্মবেশ নয়, যেন সত্যের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! এমন রূপ বুঝি সে কখনও দেখে নি ; অবাক্ হয়ে' চেয়ে' রইল। টুনু বল্‌ল, "নমস্কার, বৌদিদি। অতিথি আমি, আজ রাত্রে বিশ্রাম করব। কাল আমার নালিশ আছে, বিচার-প্রার্থনায় এসেছি!"

কথায় বিদ্রূপের সুর নেই। রহস্যের রঙ নেই। যেমন স্পষ্ট, তেমনই তীক্ষ্ণ, তেমনই মর্ম্মস্পর্শী। জ্যোৎস্না যেন আচ্ছন্ন হয়ে' পড়ল ওর মহিমায়। সে বল্‌ল, "ধন্যা, ব্যবস্থা করে' দে।" তারপর টুনুর

মুখের দিকে চেয়ে' কৃত্রিম অনুনয় প্রকাশ করে' বল্‌ল, "এ দেবতার আশ্রম, আপনি অনায়াসেই বিশ্রাম করতে পারেন।"

টুনু জ্যোৎস্নার প্রথম দর্শনে প্রহৃষ্ট-চিত্ত হ'ল, ধন্যার সঙ্গে সে ঘরের বাহির হয়ে' গেল।

ভোরে ধূর্জ্জটীর আর গলা শোনা গেল না; এস্রাজের সুরে বামা-কণ্ঠধ্বনি আশ্রমের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা মুগ্ধ হয়ে শুন্‌ল—

অভিমান লালসা—
হরি হরি হেন দশা।
হইবে আমারও,
দোঁহা মুখ নিরখিব,
দোঁহা অঙ্গ পরশিব,
সেবন করিব দোঁহাকার।

একি মানুষের কণ্ঠ-নিঃসৃত বাণী, না, কোন দেববালা স্বর্গের দুয়ারে দাঁড়িয়ে মূর্চ্ছনা তুল্‌ছে? জ্যোৎস্না গিয়ে' মন্দির-চত্বারে বস্‌ল।

টুনু হেসে,' জ্যোৎস্নার দিকে কটাক্ষপাত করে' মীড়ে মীড়ে গানের ঝঙ্কার তুল্‌ল—

হরি হরি কবে হব বৃন্দাবনবাসী!
নিরখিব নয়নে যুগল রূপরাশী।

এস্রাজখানা নামিয়ে রেখে' বল্‌ল, "বৌদি, দাসী এসেছে, সেবার ভার মাথা পেতে নিতে। আজ তোমার মুক্তি। ঘরের লক্ষ্মী—মা কাতরা—বাড়ী ফিরে' যেতে হ'বে।"

এ কথার উত্তর নেই।

আজ আশ্রম যেন উৎসব-পুরী। টুনুকে ঘিরে' সকলেই উন্মাদ। গানের তাগিদে, তার কণ্ঠ ছিঁড়ে' রক্তাক্ত হয়। জ্যোৎস্না বিমনা। তার মনে হ'ল, এই নারীই তো তার সর্ব্বনাশের গোড়া—বাঘিনী কি সম্মোহন জানে, বুকে এসে' চেপে' বস্‌ল—তাকে যেন বিমূঢ় করে' ফেল্‌ল! কাল সারাদিন উপবাসের কথা টুনুর কাণে গেল। সে এসে' জ্যোৎস্নাকে বল্‌ল, "দেখ ঠাকুরুণ, একটা কাণ্ড বাধিয়েছ দু'জনের মধ্যে একজন নিশ্চয়ই। আশ্রমের ভার আজ থেকে আমার। কেন, যদি বলি—তুমিও আর অমত কর্‌তে পার্‌বে না—"

জ্যোৎস্না আশ্চর্য্য হয়ে' তার মুখের পানে চাইতেই, সে বল্‌ল, "সেই একদিন আর আজ। সেদিন ব্যাঞ্জো হাতে তোমার বাড়ী নেচে' গেয়ে' এসেছি, বিমূঢ়ার মত ক্ষত-বিক্ষত হৃদয় নিয়ে; আর আজ এসেছি রিক্ত শূন্য, প্রভুর ডাক মাথায় নিয়ে, চিরদিনের জন্য নিজেকে পূর্ণ করে' নিতে। মনে পড়ে বৌদিদি, আমার কথা?"

জ্যোৎস্না কোন জবাব দিল না। টুনু হেসে' বল্‌ল, "সেদিন তবু ভালবেসেছিলে পাপকে, ব্যথিতাকে; আজ কেন, বৌদিদি, মুখ ভারী করে' আছ, যখন এসেছি হৃদয়ের অর্ঘ্য নিয়ে সার্থক হ'তে!"

জ্যোৎস্না টুনুর কথার ভাবে এক রত্তি কপটতার চিহ্ন খুঁজে' পেল না। তার সংশয়-দৃষ্টি তাকেই যেন পুড়িয়ে মার্‌তে লাগ্‌ল। অভদ্রতার মর্ম্মপীড়ায় তার অন্তর ধিক্কার দিয়ে' উঠ্‌ল। সে কাতর কণ্ঠেই বল্‌ল, "আপনাকে তো আমি কোন অযত্ন করি নি!"

"মনের বিকার, বৌদিদি, বাইরের কিছু না। সেদিন তোমার বিবাহোৎসবে তোমায় কাছে [illegible] াদর করেছিলাম; আর আজ [illegible]ঘর মহিমার দিনে দূতী [illegible] ছ, দূর থেকে তোমার মিলনের

যুক্তবেণী



শ্রী মতিলাল রায়